# বিশ্ব নবীর সাহাবী

২

তালিবুল হাশেমী

# বিশ্বনবীর সাহাবী

## ২য় খণ্ড

তালিবুল হাশেমী

অনুবাদ ঃ আবদুল কাদের

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.amarboi.org

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ১৩৭

১ম প্রকাশ ঃ এপ্রিল ১৯৮৯

৬ষ্ঠ প্রকাশ

| | |
|---|---|
| জমাদিউল আউয়াল | ১৪৩০ |
| জ্যৈষ্ঠ | ১৪১৬ |
| মে | ২০০৯ |

বিনিময় ঃ ১২০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

---

سرور کائنات کے پچاسی صحابی -এর বাংলা অনুবাদ

BISHA NABIR SAHABI 2nd Volume by Talibul Hashemy. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 120.00 Only

www.amarboi.org

# দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'পঞ্চাশজন সাহাবী'র দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়ে গেছে। এ জন্য দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলো। এ মুহূর্তে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। আধুনিক প্রকাশনী কর্তৃপক্ষ সাহাবী চরিত গ্রন্থসমূহকে কয়েক খণ্ডে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে 'পঞ্চাশজন সাহাবী'র প্রথম খণ্ড 'বিশ্ব নবীর সাহাবী' প্রথম খণ্ড নামে প্রকাশিত হয়েছে। 'পঞ্চাশজন সাহাবী'র দ্বিতীয় খণ্ডও 'বিশ্ব নবীর সাহাবী' দ্বিতীয় খণ্ড হিসেবে প্রকাশিত হলো। পরবর্তীতে আরো কয়েক খণ্ডে 'বিশ্ব নবীর সাহাবী' প্রকাশের প্রস্তুতি চলছে। সময়-সুযোগে ইনশাআল্লাহ্ তা প্রকাশিত হবে।

'বিশ্ব নবীর সাহাবী'র দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ মুহূর্তে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে সবিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। গ্রন্থটি বাংলাভাষী পাঠককে আকৃষ্ট করতে পেরেছে বলেই আমাদের বিশ্বাস। প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে যাওয়াই তার প্রমাণ। দ্বিতীয় সংস্করণও পাঠকের কাছে সমাদৃত হবে বলে আমরা আশা করি।

'বিশ্ব নবীর সাহাবী' গ্রন্থের অনুবাদের ভুলত্রুটি আমাকেই কাঁদে নিতে হবে। এ ব্যাপারে কারো কোন বক্তব্য থাকলে তা জানানোর অনুরোধ রইলো। ভুল-ত্রুটি শুধরে নেয়ার আন্তরিক প্রয়াস চালানো হবে। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে যারা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতি বিশেষ করে আধুনিক প্রকাশনী কর্তৃপক্ষের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। 'বিশ্ব নবীর সাহাবী' গ্রন্থের অনুবাদ কাজের জন্য আল্লাহর নিকট আখিরাতের মুক্তি কামনা করি। যাঁরা এ কাজে সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ পাক তাঁদেরকেও আখিরাতে মুক্তি দিন—এ মুনাজাত করি। আমীন।

ঢাকা, ১৭ই ফাল্গুন ১৪০০ সাল
[illegible]ই রমযান, ১৪১৪ হিজরী।
১লা মার্চ, ১৯৯৪ সাল।

বিনয়াবনত
আবদুল কাদের

www.amarboi.org

# সূচীপত্র


| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| ০ কুরআনে হাকিম ও সাহাবীদের মর্যাদা | ১ |
| ২১. হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ) | ২৫ |
| ২২. হযরত মুগিরাহ (রাঃ) বিন হারিছ হাশেমী | ৫৫ |
| ২৩. হযরত আবুল আছ (রাঃ) বিন রবি | ৬১ |
| ২৪. হযরত ইয়াযিদ (রাঃ) বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ) | ৬৯ |
| ২৫. হযরত ওবায়দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) | ৭৮ |
| ২৬. হযরত যবরকান (রাঃ) বিন বদর তামিমী সাদী | ৮২ |
| ২৭. হযরত জারুদ (রাঃ) বিন আমর আবদী | ৮৭ |
| ২৮. হযরত মোহাম্মদ (রাঃ) বিন তালহা (রাঃ) | ৯৩ |
| ২৯. হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন বুদাইল (রাঃ) খুজায়ী | ৯৭ |
| ৩০. হযরত হুয়াইতিব (রাঃ) বিন আবদুল উজ্জা | ১০২ |
| ৩১. হযরত আব্বাস (রাঃ) বিন মিরদাস | ১০৭ |
| ৩২. হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমের | ১১২ |
| ৩৩. হযরত আমর (রাঃ) বিন সাঈদ উমুব্বী | ১২৬ |
| ৩৪. হযরত সাঈদ (রাঃ) বিন আছ | ১২৯ |
| ৩৫. হযরত আব্বাস (রাঃ) বিন উবাদাহ আনসারী | ১৩৫ |
| ৩৬. হযরত হারাম (রাঃ) বিন মিলহান আনসারী | ১৪১ |
| ৩৭. হযরত হাসিজুলুল ইয়ামান (রাঃ) | ১৪৫ |
| ৩৮. হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন যায়েদ আনসারী | ১৪৮ |
| ৩৯. হযরত ছুরকাহ (রাঃ) বিন আমর আনসারী | ১৫৫ |
| ৪০. হযরত যিয়াদ (রাঃ) বিন লবিদ আনসারী | ১৫৭ |
| ৪১. হযরত হাস্সান (রাঃ) বিন সাবিত আনসারী | ১৬১ |
| ৪২. হযরত আবু মাসউদ বদরী আনসারী (রাঃ) | ১৮১ |
| ৪৩. হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন উনাইস জুহান্নি | ১৮৬ |
| ৪৪. রাফায়াহ (রাঃ) বিন রাফে (রাঃ) আনসারী | ১৯২ |
| ৪৫. হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) বিন জাবার আনসারী | ১৯৫ |
| ৪৬. হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন ছাবিত আনসারী | ১৯৯ |
| ৪৭. হযরত ছারমাহ (রাঃ) বিন আবি আনাছ আনসারী | ২১৩ |
| ৪৮. হযরত সাহাল (রাঃ) বিন হুনাইফ আনসারী | ২১৭ |
| ৪৯. হযরত নু'মান (রাঃ) বিন বশির (রাঃ) আনসারী | ২২১ |
| ৫০. হযরত ইয়ামিন (রাঃ) বিন উমায়ের | ২৩১ |


www.amarboi.org

بسم الله الرحمن الرحيم

# কুরআনে হাকিমও সাহাবীদের মর্যাদা

সারওয়ারে কায়েনাত, ফখরে মওজুদাত, রহমতে আলম মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন মানবকূলের শ্রেষ্ঠতম মানব। তিনি ছিলেন কামিল ইনসান। সার্বিক গুণাবলীর সমাহার ঘটেছিল তাঁর মধ্যে। এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ'র (সাঃ) সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) মর্যাদা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে সমাসীন। নবীদের (আঃ) পর তাঁদের মত উন্নত মানব আজও বিশ্বে আবির্ভূত হয়নি। এ সব মহান মানব যাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ মানব রাসূলে আকরামের (সাঃ) দর্শনে নিজেদের চক্ষুকে আলোকিত করেছিলেন। তাঁরা সর্বোত্তম চরিত্রবানের উপর নিষ্ঠার সাথে ঈমান এনেছিলেন। সরাসরি সুহবতের ফায়েজও তাঁরা হাসিল করেছিলেন এবং তাঁর উত্তম আদর্শকে জীবনের অনির্বাণ শিখা বানিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁরা নভোমন্ডলীয় হেদায়াতের প্রোজ্জল তারকা সদৃশ। তাঁদের সত্যবাদিতা ও ইখলাস, দিয়ানত এবং আমানত, শুভকামনা ও ত্যাগ এবং খোদাভীতি অতুলনীয়। তাঁদের পূত পবিত্র আত্মা থেকে আজ পর্যন্তও সৌভাগ্য এবং সফলতার দীপ্তি বিচ্ছুরিত হয়। তাহজিব তামাদ্দুনের গুচ্ছ তাঁরা সজ্জিত করেছিলেন। তাঁরাই রাজনীতি এবং অর্থনীতির ঔজ্জ্বল্য প্রদান করেছিলেন। জাহেলিয়াতের তমসা এবং কুফর ও শিরকের অন্ধকার গহ্বরে তাঁরাই হেদায়াতের প্রদীপ জ্বেলেছিলেন। আল্লাহর নাম বুলন্দ করার জন্যে তাঁরা জান মাল, সন্তান-সন্ততি তথা প্রয়োজনের মুহূর্তে সব কিছুই হাজির করেছিলেন।

রাসূলে আকরাম (সাঃ) একবার লোকদের সম্বোধন করে বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউই মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত পিতামাতা, সন্তান-সন্ততি এবং অন্যান্য লোকদের চেয়ে আমার সাথে তাঁর ভালোবাসা বেশী না হয়।

প্রিয় নবীর (সাঃ) এ ইরশাদের সত্যতা সাহাবীরা (রাঃ)নিজেদের আমল দিয়ে এমনভাবে প্রমাণ করেছেন,যা বিশ্বের ইতিহাসে নজিরবিহীন। রিসালাত প্রদীপের এ সব পতঙ্গ ন্যায় বা সত্য পথে যে ধরনের দুঃখ-মুসিবত ও নির্যাতন সহ্য করেছেন তা পাঠ করলে শরীরের প্রতিটি লোমকূপ খাড়া হয়ে যায়। গা শিউরে উঠে। সত্য দ্বীনের প্রসার ও প্রচার এবং হক ঝাণ্ডার শির উন্নত করার লক্ষ্যে তাঁরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যে কুরবানী দিয়েছিলেন তা ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে কিয়ামত পর্যন্ত তাওহীদ পন্থীদের জন্যে মশাল স্বরূপ হয়ে থাকবে। এ সব পবিত্র নফসের মানুষ আল্লাহর



www.amarboi.org

সন্তুষ্টির জন্যে মাতা-পিতাকে পরিত্যাগ করেছেন। পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্নতা আবলম্বন করেছেন। স্বদেশ ভূমি ও গোত্রের লোকজনকে বিদায় জানিয়েছেন। ঘর-বাড়ী পরিত্যাগ করেছেন। ক্ষুধা সয়েছেন। সব ধরনের শারীরিক নির্যাতন সহ্য করেছেন। এমনকি প্রয়োজনে হক পথে নিজের জীবনকেও নজরানা হিসেবে পেশ করতেও কুন্ঠিত হননি। শুধুমাত্র প্রিয় নবীর (সাঃ) জীবদ্দশাতেই নয় বরং তাঁর ওফাতের পর সাহাবীরা (রাঃ) আল্লাহর দ্বীনের প্রতি যে ধরনের দরদ দেখিয়েছেন ও নিষ্ঠার সাথে খেদমত, হিফাজত ও প্রসারের কাজ করেছেন তার স্বীকৃতি প্রদান আমাদের ঈমানেরই দাবী। এ সকল পবিত্র আত্মা ইসলামী উম্মাহর কল্যাণকামী। এই উম্মাহ তাঁদের ইহসানের বোঝা থেকে কখনো অব্যাহতি পেতে পারে না। কোন নবী এবং রাসুল শেষ নবীর (সাঃ) সাহাবীর (রাঃ) মত জীবন উৎসর্গকারী সাথী পাননি। বাস্তব কথা হলো, প্রত্যেক সাহাবীই ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহর নিদর্শন ছিলেন। আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলের (সাঃ) সুন্নাত এ সব মহান ব্যক্তির মাধ্যমেই আমাদের কাছে পৌঁছেছে। তাঁদের চারিত্রিক দৃঢ়তার মাধ্যমে এ উম্মাত সাফল্য এবং কল্যাণের পথে ধাবিত হতে পারে। তাঁরা হলেন সুউচ্চ সত্যবাদিতার আলোকোজ্জল তারকা। তাঁদেরকে প্রত্যক্ষ করে মুসলিম উম্মাহ জীবন তরীর মনযিলে মাকসূদ নির্ধারণ করতে পারে। আল্লাহ পাকের এসব পবিত্র এবং নির্বাচিত ব্যক্তির ত্যাগের আবেগ মহান স্রষ্টার এত পছন্দীয় ছিল যে কুরআনে পাকের স্থানে স্থানে তাঁদের গুণের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের প্রশংসা করা হয়েছে এবং সরাসরি তাদেরকে বেহেশতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। যখন আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং রাসূলের (সাঃ) সাহাবীদের শান বর্ণনা করেন তখন সেইসব পবিত্র নফসের মর্যাদা প্রমাণে আর কোন দলিলের প্রয়োজন হয় না। কুরআনে হাকিম সাহাবা কিরামের (রাঃ) গুণাবলী, তাদের স্থান, মান ও মর্যাদা সম্পর্কে কি ধরনের বর্ণনা দিয়েছে তা দেখা যাক। সূরায়ে ফাতাহতে ইরশাদ হচ্ছে ঃ "মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহ রাসূল। আর যাঁরা তাঁর সাথে রয়েছেন তাঁরা কাফেরদের উপর কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পর রহমশীল। তোমরা যখনই দেখবে তখনই তাদেরকে রুকু, সিজদা, আল্লাহর ফজিলত এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের প্রচেষ্টায় মশগুল পাবে। সিজদাহর চিহ্ন তাঁদের চেহারায় মওজুদ রয়েছে। যা থেকে তাঁদেরকে পৃথকভাবে চেনা যায়। ইঞ্জিল এবং তাওরাতেও তাঁদের গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের উদাহরণ এভাবে দেয়া হয়েছে যে, যেমন একটি ক্ষেত। ক্ষেতে বীজ অংকুরিত হলো। পরবর্তীতে তা শক্তিশালী হলো।এরপর আরো খানিকটা বর্দ্ধিত হলো। অতঃপর নিজের কাণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে গেল। এ ক্ষেত কৃষককে খুশী করে। অন্যদিকে কাফেররা ফুলে ফলে সুশোভিত ক্ষেত দেখে জ্বলে যায়। তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে আল্লাহ তাদের মাগফিরাত এবং বড় ছওয়াবের ওয়াদা করেছেন।" -সূরা ফাতাহ ঃ ২৯

www.amarboi.org

এ আয়াতসমূহে সাহাবায়ে কিরামের তিনটি গুণের কথা বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। গুণ তিনটি হলোঃ কাফেরদের উপর কঠোর, পরস্পর রহমশীল এবং এ ধরনের ইবাদাত গুজার যে তাদের চেহারায় সিজদার নিদর্শন সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠতো। কাফেরদের উপর কঠোর অর্থ এ নয় যে, তাঁরা কাফেরদের সাথে তিক্ত ব্যবহার করতেন। বরং তার অর্থ হলো, কাফেরদের মোকাবিলায় তাঁরা ছিলেন পাথরের মত কঠিন। কোন ধমক, কঠোরতা, চাপ অথবা লোভ-লালসা তাদেরকে হক পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারতো না। তাঁরা ছিলেন প্রিয় নবীর (সাঃ) পক্ষে কাফেরদের বিরুদ্ধে মাথায় কাফন বাঁধা জীবন উৎসর্গকারী মানুষ।

পরস্পর রহমশীলের অর্থ হলো মুমিনরা একে অপরের ভাইয়ের মূর্তিমান প্রতিচ্ছবি। একে অপরের প্রতি দরদ পোষণ এবং দুঃখে দুঃখীত হয়। একজন আরেকজনকে সালাম, সদালাপ এবং হাসি-খুশী ব্যবহার প্রদর্শন করে। একে অন্যের সাথে পরামর্শ করে' পরস্পর সাহায্য করে এবং অপরের ব্যথায় ব্যথিত হয়। একে অন্যের খুন নিজের উপর হারাম মনে করে। আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা, জুলুম, প্রতিশোধ গ্রহণ, অন্যায় প্রতিশ্রুতি, খারাপ ধারণা, অপবাদ দেয়া বিদ্রূপ এবং ফিতনা-ফাসাদ থেকে তারা দূরে থাকে। তাদের পরস্পর রহমশীল হওয়া অথবা ভ্রাতৃত্বের ব্যবহার চূড়ান্ত অবস্থা এই ছিল যে, হজরত আবদুর রহমান (রাঃ) বিন আওফ মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা এলেন। মদীনা এসে তিনি হজরত সায়াদ (রাঃ) বিন রবি আনসারীর বাড়ী উঠলেন। হজরত সায়াদের (রাঃ) দু'জন স্ত্রী ছিল। তিনি হজরত আবদুর রহমানকে (রাঃ) বললেন, আমার সকল ধন সম্পদ আপনি অর্ধেক ভাগ করে নিন। এমনকি আমি নিজের স্ত্রীর একজনকে তালাক দিচ্ছি। ইদ্দতের পর আপনি তাকে শাদী করবেন।

হজরত আবদুর রহমানের (রাঃ) অন্তরেও হজরত সায়াদের (রাঃ) মতই ভ্রাতৃত্বের আবেগ ছিল। তিনি নিজের ভাইকে এ ধরনের পরীক্ষায় ফেলা পছন্দ করলেন না। তাঁর ভ্রাতৃত্ববোধের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে বললেন, আল্লাহ পাক তোমার সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে বরকত দিন এবং তোমার উপর রহমত নাযিল করুন। আমার আর কিছু প্রয়োজন নেই। বাজারের রাস্তা কোন দিকে শুধু এতটুকু বলে দাও। ব্যবসা করে আমি আমার রুজী কামাই করবো।

সিজদার নিদর্শন অর্থ কপালের সেই দাগ নয় যা সিজদা করার কারণে নামাজীদের কপালে পড়ে থাকে। বরং তার অর্থ খোদাভীতি, বিনয়, সত্যবাদিতা, শারাফত এবং সচ্চরিত্রের সেই সব চিহ্ন যা আল্লাহর সামনে অবনত হওয়ার কারণে মানুষের চেহারায় দীপ্যমান হয়ে উঠে। একজন অহংকারী, দুঃস্বভাব এবং বেশরম মানুষের চেহারা একজন শরীফ পবিত্র এবং বিনয়ী মানুষের চেহারা থেকে অবশ্যই পৃথক ধরনের হয়। কুরআনে কারিমে সাহাবাদের গুণ-বর্ণনায় বলা হয়েছে যে,

www.amarboi.org

তাদের চেহারা আলোয় প্রদীপ্ত থাকে। ইমাম মালেক (রঃ) এই গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, সাহাবায়ে কিরামের বাহিনী সিরিয়া প্রবেশ করলো। এ সময় সেখানকার খৃষ্টানরা বলতে লাগলো, ইসার (আঃ) অনুগামীদের যে গুণ আমরা কিতাবে পড়েছি অথবা নিজেদের আলেমদের কাছে শুনেছি, আরব থেকে আগত লোকদেরও একই গুণে গুণান্বিত মনে হয়।

সুরায়ে আল-আনফালে সাহাবায়ে কিরামের (রাঃ) এ গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছেঃ "ঈমানদার তারাই যাদের অন্তর আল্লাহর নাম নেওয়ার সাথে সাথে কেঁপে ওঠে এবং যখন তাদের সামনে আল্লাহর কালাম পাঠ করা হয় তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় ও তারা নিজের রবের উপর ভরসা রাখে। সেই মানুষ যারা নামাজ কায়েম রাখে এবং আমরা তাদেরকে যে রুজী দিয়েছি তা থেকে খরচ করে। তারাই সত্যিকারের ঈমানদার। তাদের জন্যে নিজের রবের কাছে মর্যাদা রয়েছে। অধিকন্তু মাগফিরাত এবং ইজ্জতের রুজীও রয়েছে।"

সুরায়ে "আত তাওবাহতে" ইরশাদ হয়েছে ঃ এবং ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার মহিলা একে অপরের সাহায্যকারী। নেক কথা শিক্ষা দেয় এবং খারাব কথা থেকে বিরত রাখে। নামাজ কায়েম রাখে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের নির্দেশ মুতাবেক চলে। আল্লাহ এ সব লোকের উপর রহম করবেন। অবশ্যই আল্লাহ সবচেয়ে বড় বিজ্ঞ।

সাহাবায়ে কিয়ামের (রাঃ) গুণই হলো তাঁদের অন্তর আল্লাহভীতিতে পরিপূর্ণ। তাঁদের সামনে কুরআনে হাকিমের আয়াত পঠিত হলে তাঁদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে কাফেরদের সামনে আল্লাহর কালাম পঠিত হলে তারা তাতে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে। তাঁরা নিজের প্রকৃত স্রষ্টার উপর ভরসা রাখে। নামাজের পাবন্দী করে এবং নিজের হালাল আয় থেকে আল্লাহর পথে অকাতরে ব্যয় করে। একে অপরকে সাহায্য করে। ভালো কাজের নির্দেশ দেয় এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে, নামাজ পড়ে, রোযা রাখে, যাকাত প্রদান করে, আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুলের নির্দেশ মুতাবিক চলে।

সুরায়ে "আত-তাওবা" হর' অন্য এক স্থানে আল্লাহ পাক মুহাজির এবং আনসার সাহাবাদের (রা) প্রতি নিজের সন্তুষ্টির সুসংবাদ এই ভাষায় দিয়েছেনঃ

"যারা ঈমান এনেছে এবং হিজরত করেছে ও নিজেদের জান এবং মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে, আল্লাহর নিকট তাঁরা সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে সমাসীন এবং তাঁরা সফলতা লাভকারী। তাদের রব তাদেরকে তাঁর রহমত, সন্তুষ্টি এবং এমন জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। যাতে তাঁদের জন্যে স্থায়ী নিয়ামত সমূহ থাকবে।

www.amarboi.org

চিরকালের জন্যে তাঁরা সেখানে অবস্থান করবে। অবশ্যই আল্লাহর নিকট তাদের জন্য বড় প্রতিদান রয়েছে।"

সূরায়ে আল–আনফালেও একই ধরনের কথা বলা হয়েছে ঃ "যারা ঈমান এনেছে ও যারা আল্লাহর রাস্তায় ঘরবাড়ী পরিত্যাগ করেছে এবং জিহাদ করেছে, যারা আশ্রয় দিয়েছে এবং সাহায্য করেছে তারাই সত্যিকারের মুমিন। তাদের জন্যে গুণাহ খাতার ক্ষমা এবং সুন্দর রিযক রয়েছে। এবং যারা পরে ঈমান এনেছে এবং হিজরত করেছে ও তোমাদের সাথে একত্রিত হয়ে জিহাদ করেছে তারাও তোমাদেরই অন্তর্ভূক্ত।" — আয়াতঃ৭৪–৭৫

এ পবিত্র আয়াত সমূহে আল্লাহ পাক বিশেষ করে সে সব মুহাজির এবং আনসারের কথা উল্লেখ করেছেন যাঁরা ইসলাম গ্রহণ প্রশ্নে অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করেছেন। আর এভাবেই তারা "আস–সাবিকূনাল আওয়ালূন"-এর মহান উপাধির যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছেন। "আস–সাবিকূনাল আওয়ালূন" অর্থাৎ ইসলামের প্রথম যুগের সাহাবীদেরকে এ মর্যাদা ও স্থান দেয়া হয়েছে। এতে তাদের সাথেই শুধু জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়নি, বরং তাদের পদাংক অনুসরণ করে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবাদেরও (রাঃ) বেহেশতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। অগ্রগামীদের দলে সে সব মুহাজির সাহাবী (রাঃ) রয়েছেন, যাঁরা নবুয়ত প্রাপ্তির প্রথম যুগে কঠিন অবস্থায় ঈমান আনার সৌভাগ্য লাভ এবং হক পথে চলার জন্যে অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট বরদাশত করেছিলেন। এমনকি তাঁরা নিজের ঘর বাড়ীও পরিত্যাগ করেন। তাদের এই সব কুরবাণী আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় হয় এবং তাঁরা তাঁর কাছে সাচ্চা মুমিন এবং জান্নাতী হিসেবে অভিহিত হন। হক পথে তাঁরা যে নজীরবিহীন কুরবাণী স্বীকার করেন তার কতিপয় দৃষ্টান্ত পরখ করুন ঃ

নবুয়ত প্রাপ্তির প্রথম তিন বছরে প্রিয় নবী (সাঃ) অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে তাবলীগের দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে থাকেন। নবুয়ত প্রাপ্তির চতুর্থ বছরের শুরুতে "ফাসদা' বিমা তুমারু ওয়া আ'রিজ আনিল মুশরিকিনা" (অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশাবলী প্রকাশ্য শুনান এবং মুশরিকদের কোন পরওয়া করবেন না) এ হুকুম নাযিল হলো। এ নির্দেশানুসারে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) প্রকাশ্যে হকের তাবলীগ শুরু করেন। ফলে মক্কার মুশরিকদের ক্রোধ ও গোস্বার আগুন পূর্ণ শক্তির সাথে ফেটে পড়লো। তাওহীদের দাওয়াত গ্রহণকারীদের উপর তারা এমন এমন লোমহর্ষক নির্যাতন চালালো যে তাতে মানবতা মুখ থুবড়ে পড়ে রলো।

হজরত বিলাল হাবশী (রাঃ) মক্কার এক মুশরিক সরদার উমাইয়াহ বিন খালফের গোলাম ছিলেন। ইসলামের আহ্বান শুনতেই তিনি সাচ্চা অন্তরে ঈমান আনেন। তাঁর মুসলমান হওয়ার কথা শুনেই উমাইয়াহ অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলো। সত্য গ্রহণের অপরাধে

www.amarboi.org

হজরত বিলালের (রাঃ) জন্যে সে বিভিন্ন ধরনের শাস্তি আবিষ্কার করলো। তাঁর গলায় রশি বেঁধে মাস্তান যুবকদের হাতে তা দিয়ে দিত। আর তারা সে রশি ধরে তাঁকে মক্কার পাহাড়ী এলাকায় টেনে নিয়ে বেড়াত। অতঃপর উত্তপ্ত বালিতে এনে উপুর করে শুইয়ে দিত এবং পাথর এনে শরীরের ওপর চাপা দিত। রাসূলের (সাঃ) কবি হজরত হাসসান (রাঃ) বিন ছাবিত বলেন, আমি জাহেলী যুগে হজ্ব অথবা উমারাহর জন্য মদীনা থেকে মক্কা গিয়ে ছিলাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম যে, ছেলেরা বিলালকে (রাঃ) রশি দিয়ে বেঁধে এদিক–ওদিক টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এ সত্ত্বেও সে লাত, উজ্জা, হাবল, আসাফ, নায়েলাহ এবং বাওয়ানাহকে (মূর্তি ও দেব–দেবীর নাম) সরাসরি অস্বীকার করছে।

কখনো কখনো উমাইয়াহ স্বয়ং হজরত বিলালকে (রাঃ) ঘর থেকে বের করে নিয়ে যেত এবং হিরার উত্তপ্ত বালুর উপর শুইয়ে দিয়ে ভারী পাথর তার বুকের উপর রেখে দিত। যাতে নড়াচড়া করতে না পারে। অতঃপর বলতো, মুহাম্মাদের (সাঃ) আনুগত্য প্রত্যাহার কর এবং লাত ও উজ্জাই প্রকৃত স্রষ্টা তার প্রতিশ্রুতি দাও। নচেৎ এভাবেই পড়ে থাকবে। এর জবাবে হক পূরস্ত হজরত বিলালের (রাঃ) মুখ দিয়ে আহাদ আহাদ শব্দ বেরুতো। প্রখ্যাত সাহাবী হজরত আমর(রা) বিনুল আস থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি হজরত বিলালকে (রাঃ) এ অবস্থায় দেখলেন যে উমাইয়াহ তাঁকে উত্তপ্ত শক্ত মাটিতে শুইয়ে রেখেছে। মাটিও এমন উত্তপ্ত যে, তার উপর যদি গোশত রাখা হতো তাহলে তা গলে যেত। কিন্তু তিনি সে অবস্থাতেও লাত এবং উজ্জাকে অস্বীকার করে চলেছেন।

কোন কোন দিন বনু জুমাহর ছোকড়ারা হজরত বিলালকে (রাঃ) মারাত্মকভাবে প্রহার করতো। দিনের বেলায় কাপড় খুলে লোহার জিরাহ পরাতো এবং রোদে রেখে দিত। সন্ধ্যায় হাত–পা বেঁধে এক প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ এবং রাতে চাবুক দিয়ে কষাঘাত করতো। এ সত্ত্বেও তাঁর কদম হক পথ থেকে বিচ্যুত হয়নি। মুখ দিয়ে আহাদ আহাদ শব্দ ছাড়া আর কিছুই বের হতো না।

আবু ফাকিহাহ ইয়াসার ইযদী (রাঃ) ও উমাইয়াহ বিন খালফের গোলাম ছিলেন। তিনিও ইসলাম গ্রহণ করলেন। এতে উমাইয়াহ তাঁকেও জুলুম–নির্যাতনের নিশানা বানালো। উত্তপ্ত বালুর উপর মুখ উবু করে তাঁকে শুইয়ে দিত এবং পিঠের উপর রেখে দিত ভারী পাথর। ভয়াবহ গরম ও বোঝার কারণে তিনি বেহুঁশ হয়ে যেতেন। একদিন পাষাণ হৃদয় উমাইয়াহ হজরত আবু ফাকিহার (রাঃ) দু'পায়েই রশি বাঁধলো এবং তাঁকে নির্দয়ভাব টেনে বাইরে নিয়ে গেল। সেখানে উত্তপ্ত বালুর উপর শুইয়ে দিল এবং এত জোরে তার গলার উপর চাপ দিল যে জিহ্বা বেরিয়ে এলো। তিনি নিঃসার হয়ে পড়ে রইলেন। উমাইয়াহ ভাবলো কারবার খতম। কিন্তু তখনো তিনি জীবিত ছিলেন। ঘটনাক্রমে হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) সেই পথ দিয় যাচ্ছিলেন। তিনি হজরত আবু ফাকিহার (রাঃ) ওপর এ নির্যাতনের মর্মন্তুদ চিত্র দেখলেন। তাঁর অন্তর কেঁদে

www.amarboi.org

উঠলো এবং সে সময়ই আবু ফাকিহাকে (রাঃ) উমাইয়াহ'র কাছ থেকে ক্রয় করে আযাদ করে দিলেন। কিন্তু সে যুগে কাফেরদের জুলুম-নির্যাতন থেকে কোন স্বাধীন মুসলমান অথবা গোলাম কেউই মুক্ত ছিল না। হজরত আবু ফাকিহাহ (রাঃ) মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও কাফেরদের নির্যাতনের শিকার হয়ে রইলেন। ফলে নবুওতের ৬ষ্ঠ বছরে তিনি হিজরত করে হাবশা চলে গেলেন। হক পথে নির্যাতন সইতে সইতে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছিল। বদরের যুদ্ধের কিছু দিন পূর্বে তিনি ইনতিকাল করেন।

কোরেশ সরদার সুহাইল বিন আমরের নেক প্রকৃতির সন্তান হজরত আবু জান্দাল (রাঃ) এবং হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) নবুয়তের প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাতে পিতা এত ক্রোধান্বিত হলেন যে, দই পুত্রের পায়ে বেড়ি লাগিয়ে কারাগারে নিক্ষেপ করলো। তাঁরা সেখানে বছরের পর বছর ধরে বন্দীত্বের নির্যাতন সইতে থাকেন।

হজরত ইয়াসির (রাঃ) বিন আমের, তাঁর পত্নী হজরত সুমাইয়াহ (রাঃ) বিনতে খাবাত এবং দুই পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ) এবং আম্মার (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন। আবু জেহেল তাঁদের উপর প্রচণ্ড নির্যাতন চালায়। তাদের অবস্থা পড়ে শরীরের লোমকূপ খাড়া হয়ে যায় । সে তাদেরকে পানিতে ডুবিয়ে রাখতো। উত্তপ্ত বালু এবং প্রজ্জলিত আগুনের উপর শুইয়ে দিত। মক্কার প্রখর রোদে দুপুরে দাঁড় করিয়ে রাখতো। বেত দিয়ে পিটাতো। মোট কথা সে নির্যাতন চরম সীমায় গিয়ে পৌছলো। একদিন প্রিয় নবী (সাঃ) তাঁদেরকে কঠিন নির্যাতন সহ্য এবং মার খেতে দেখলেন। তিনি বললেন, "হে ইয়াসিরের খান্দান! ধৈর্য ধর। নিঃসন্দেহে তোমাদের স্থান জান্নাত।"

জালেম আবু জেহেল একদিন হজরত সুমাইয়াহ'র (রাঃ) গোপন নাজুক স্থানে এত জোরে নিযাহ মারলো যে তিনি মৃত্যু মুখে প[illegible] হলেন। অতঃপর আর একদিন সে হতভাগা হজরত আবদুল্লাহকে (রাঃ) তাঁর মেরে শহীদ করে ফেললো। হজরত ইয়াসিরও (রাঃ) বৃদ্ধ অবস্থায় নির্যাতন সইতে সইতে ওফাত পেলেন। হজরত আম্মারের (রাঃ) হায়াত ছিল, এজন্যে তিনি বেঁচে গেলেন। নচেৎ আবু জেহেল তাঁকেও মেরে ফেলতে দ্বিধা করতো না।

হজরত যুবাইর (রাঃ) ইবনুল আওয়াম ঈমান আনলেন। এতে তাঁর অভিভাবক চাচা নওফিল বিন খুয়ায়েলদ ক্রোধে ফেটে পড়লো। হাফিজ ইবনে কাছির (রাঃ) "আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া" গ্রন্থে লিখেছেন, নওফিল হজরত যুবাইরকে (রাঃ) চাটাইতে শুইয়ে দিত। এর পর আগুন জ্বালিয়ে তাতে ধুনি দিত এবং যুবাইরকে (রাঃ) বলতো, নিজের বাপ দাদার ধর্মে ফিরে আয়। কিন্তু যুবাইর (রাঃ) বার বারই বলতেন, "কখনই নয় কখনই নয়। এখন আর আমি কুফুরী গ্রহণ করবো না।"

www.amarboi.org

হজরত মাছয়াব (রাঃ) বিন উমাইর বনু আবদিদ্দার গোত্রের এক সচ্ছল পরিবারের সন্তান ছিলেন। মক্কায় তাঁর মত সুদর্শন যুবক দ্বিতীয় আর কেউ ছিল না। সে সর্বোত্তম মানের পোশাক পরতো এবং উন্নত ধরনের সুগন্ধি ব্যবহার করতো। যে রাস্তা দিয়ে হাঁটতো তা সুবাসিত হয়ে যেত। পায়ে জরিদার হাজরামী জুতা পরিধান করতো। পিতা-মাতার এ আদুরে সন্তান বেশীর ভাগ সময় সাজ-গোজ, আরাম-আয়েশ এবং সুন্দর চুলের যত্ন করেই কাটাতো। এ সত্ত্বেও আল্লাহ পাক তাঁকে সুন্দর স্বভাব দান করেছিলেন। রাসূলের (সাঃ) নবুয়ত প্রাপ্তির প্রথম যুগে যেই তাওহীদের অমীয় বাণী তাঁর কর্ণ কুহরে প্রবেশ করলো তখনই নির্দ্বিধায় তাকে স্বাগত জানালো। বাড়ীর লোকেরা এ খবর পেয়ে ইসলামগ্রহণের অভিযোগে হাত-পা বেঁধে তাঁকে নির্জন স্থানে আটক করে রাখলো। কিন্তু তিনি কোন অবস্থাতেই হক পথ থেকে বিচ্যুত হলেন না। অবশেষে তাঁকে বাড়ী থেকে বহিষ্কার করা হলো। নবুয়ত প্রাপ্তির পাঁচ বছর পর তিনি রাসূলের (সাঃ) ইঙ্গিতে হিজরত করে হাবশা চলে গেলেন। সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর জুলুম নির্যাতন সইতে সইতে তাঁর সুশ্রী নিঃশেষ হয়ে গেল। রেশমের পোশাকের পরিবর্তে একটি কম্বলের অর্ধেক পরিধান করতেন এবং বাকী অংশ গায়ে জড়াতেন। পরিধেয় অংশটুকু বাবলার কাঁটা দিয়ে আটকে রাখতেন। নবুয়ত প্রাপ্তির ১২ বছর পর প্রিয় নবী (সাঃ) তাঁকে ইসলামের প্রথম শিক্ষক বানিয়ে মদীনা প্রেরণ করেন। সেখানে তিনি অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে ইসলামের তাবলীগ করতে থাকেন। তৃতীয় হিজরীতে ওহোদের যুদ্ধে বীরত্বের সাথে লড়াই করতে করতে শাহাদাত প্রাপ্ত হন। এতে নবী করিম (সাঃ) খুবই দুঃখিত হলেন। তিনি তাঁর লাশের নিকটে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ

"মুমিনদের মধ্যে বহু এমন লোক রয়েছে যে, তারা আল্লাহর সাথে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা সত্যভাবে পালন করে দেখিয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকে নিজের সময় পুরো করেছে এবং অনেকে ইন্তেজার বা অপেক্ষা করছে এবং নিজের ইচ্ছার কোন পরিবর্তন সাধন করেনি।" (সূরায়ে আহযাব ঃ ২৩)

এরপর প্রিয় নবী (সাঃ) বিহ্বল চিত্তে বললেনঃ "মক্কায় আমি তোমার মত সুদর্শন এবং সুন্দর পোশাক পরিধানকারী আর কাউকে দেখিনি। কিন্তু আজ দেখছি যে, তোমার চুল অবিন্যস্ত ও মাটিতে লেপ্টে রয়েছে এবং তোমার শরীরের উপর একটি চাদর। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, কিয়ামতের দিন তোমরা আল্লাহর সান্নিধ্যে উপস্থিত হবে।"

হজরত খাবাব (রাঃ) ইবনুল ইরত ইসলাম গ্রহণ করলেন। কাফিররা তাঁর উপর মারাত্মক নির্যাতন শুরু করলো। তাঁরা তাঁর কাপড় খুলে আগুনের উপর শুইয়ে দিত এবং বুকের ওপর রাখতো ভারী পাথর। কখনো দগদগে আগুনের ওপর শুইয়ে ভারী দেহের মানুষ তাঁর বুকের উপর বসতো। যাতে তিনি পাশ ফিরতে না পারেন। খাবাব (রাঃ) অটল

www.amarboi.org

ধৈর্যের সাথে সে আগুনে কাবাব হতেন। এমন কি জখমের রক্ত এবং পুঁজ গলে গলে সেই আগুন নিভে যেত। ইবনে সায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, খাব্বাব (রাঃ) পাকও এক মহিলা উম্মে আনমারের গোলাম ছিলেন। মহিলাটি ইসলাম গ্রহণের অভিযোগে তাঁকে কখনো লোহার যিরাহ পরিয়ে রোদে শুইয়ে দিত এবং কখনো গরম লোহা দিয়ে তাঁর মাথায় দাগ দিত। এ ধরনের ভয়ংকর নির্যাতন সহ্য করতে করতে হজরত খাব্বাব কিছুদিন অতিবাহিত করলেন। এরপর একদিন ফরিয়াদ নিয়ে প্রিয় নবীর (সাঃ) খিদমতে হাজির হলেন।

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে, সে সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কাবার দেয়ালের ছায়ায় শুয়ে ছিলেন। হজরত খাব্বাব রাসূলুল্লাহ'র (সাঃ) কাছে আরজ করলেনঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ। আপনি আল্লাহ্ পাকের কাছে আমাদের জন্য কেন দোয়া করেন না ?" একথা শুনে হুজর (সাঃ) উঠে বসলেন। তাঁর পবিত্র চেহারা লাল হয়ে গেল এবং বললেনঃ

"তোমাদের আগে অতীতকালে এমন লোকও ছিল, লোহার চিরুণী দিয়ে যাদের গোশত চেঁছে ফেলা হয়েছিল। হাড্ডি ছাড়া তাদের শরীরের আর কিছুই ছিলনা। এ কঠোর অবস্থায়ও তাঁরা নিজের দ্বীনের উপর থেকে আস্থা হারাননি। তাদের মাথার উপর করাত চালান হয়েছে। করাত দিয়ে চিরে তাদেরকে দু'ভাগ করা হয়েছে। এ সত্ত্বেও তাঁরা দ্বীন পরিত্যাগ করেননি। আল্লাহ এ দ্বীনকে অবশ্যই বিজয়ী করবেন এবং তোমরা দেখতে পাবে যে, সওয়ার একাকী ইয়েমেন থেকে হাজারে মাওত পর্যন্ত যাবে ও আল্লাহ্ ছাড়া কাউকেই ভয় করবে না।"

হুজুরের (সাঃ) ইরশাদ শুনে হজরত খাব্বাব (রাঃ) আল্লাহ'র অভিপ্রায় বুঝে ফেললেন এবং নীরবে ফিরে গেলেন। আল্লামা ইবনে আসির (রঃ) বলেছেন, হজরত ওমর ফারুক (রাঃ) নিজের খিলাফতকালে একবার হজরত খাব্বাবকে (রাঃ) তাঁর নির্যাতনের কাহিনী শুনানোর নির্দেশ দিলেন। তিনি কাপড় উঠিয়ে আমীরুল মুমিনিনকে নিজের পিঠ দেখালেন। পিঠ দেখে তিনি থ' মেরে গেলেন। কোন শ্বেত রোগীর চামড়া যেমন সাদা হয়ে যায় তেমনি তাঁর সারা পিঠ সাদা হয়ে গেছিল। হজরত খাব্বাব (রাঃ) বললেনঃ

"আমীরুল মুমিনিন, আগুন জ্বালিয়ে তার উপর আমাকে শুইয়ে দেয়া হত। এমনকি আমার পিঠের চর্বি সে আগুন নিভিয়ে দিত।"

হজরত আবু যর গিফারী (রাঃ) নিজের দেশ থেকে মক্কা এসে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিলেন। এ সময় মুশরিকরা চার দিক থেকে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং মার মার ধর ধর করে রক্তাক্ত করে ফেললো। হজরত আব্বাস (রাঃ) এসে যদি তাদের হাত থেকে ছাড়িয়ে না নিতেন তাহলে সেদিনই তাঁর ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যেত।

www.amarboi.org

হজরত ওসমান (রাঃ) বিন মাজউন ইসলাম গ্রহণ করলেন। মুশরিকরা তাঁকে বিভিন্ন ধরনের জুলুম-নির্যাতন, হাসি-ঠাট্টা, বিদ্রূপ এবং অর্থনৈতিক চাপে নিক্ষেপ করলো। অবশেষে বাধ্য হয়ে তিনি ঘর-বাড়ী ত্যাগ করে হাবশায় হিজরত করলেন।

হজরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন মাসউদ ইসলাম গ্রহণের পর মুশরিকদের সামনে কুরআন তিলাওয়াত করলেন। এতে সেই জালেমরা এমন নিষ্ঠুরভাবে মারলো যে, তাঁর চেহারা ফুলে গেল এবং শরীরের কয়েক স্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগলো। কিন্তু তাতে তিনি ভ্রূক্ষেপও করলেন না। একদিকে জালেমরা তাঁকে প্রহার করছিল অন্যদিকে তিনি কুরআন তিলাওয়াত অব্যাহত রেখেছিলেন। যখন তাঁর উপর কাফিরদের জুলুম-নির্যাতন সীমাহীন অবস্থায় গিয়ে পৌঁছলো তখন প্রিয় নবীর (সাঃ) ইশারায় তিনি হাবশায় হিজরত করলেন।

হজরত ওসমান গনি (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করলেন। এ অপরাধে তাঁর চাচা তাঁকে বেঁধে মারলো। তাঁর ওপর এত নির্যাতন চালানো হলো যে, অবশেষে তিনি স্ত্রী হজরত রোকাইয়া (রাঃ) বিনতে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) সহ স্বদেশ ভূমি ত্যাগ করে হাবশা গিয়ে উপস্থিতহলেন।

হজরত তালহা (রাঃ) ঈমান আনলেন। এ কারণে মক্কার কাফিররা তাঁর উপর সীমাহীন অত্যাচার চালালো। সে সময় তাঁর মাতা ইসলাম গ্রহণ করেন নি। তিনিও পুত্রের ইসলাম গ্রহণে অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। ইমাম বুখারী (রঃ) "তারিখুস সগীর" গ্রন্থে মাসউদ বিন খারাশের একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। এ বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, তাঁরা সাফা এবং মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে চক্কর মারছিলেন। তাঁরা দেখলেন অনেক মানুষ একজন যুবককে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কি ঘটনা? মানুষেরা বললো, তালহা বিন উবায়দুল্লাহ বেদ্বীন হয়ে গেছে। একজন মহিলা সে যুবকের পেছনে পেছনে গড় গড় করতে করতে এবং গালি দিতে দিতে যাচ্ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, মহিলাটি কে? লোকজন জবাবে বললো সে তার মা সায়বাহ বিনতে হাজরামী। হাফেজ ইবনে কাছির (রঃ) "আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া" গ্রন্থে লিখেছেন, নওফিল বিন খুয়াইলদ আদবিয়া কোরেশের বাঘ খিতাবে মশহুর ছিলো। হজরত তালহার (রাঃ) ইসলাম গ্রহণে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলো। সে হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এবং হজরত তালহাকে (উভয়ই বনু তামিম গোত্রের এবং পরস্পর আত্মীয় ছিলেন) এক রশিতে বাঁধলো এবং নির্যাতন চালালো।

ইবনে আছির (রঃ) এবং ইমাম হাকিম (রঃ) বলেছেন, হজরত তালহার (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের খবর যখন তাঁর চাচা এবং বড় ভাই ওসমান বিন ওবায়দুল্লাহ পেলেন তখন তারা হজরত তালহা (রাঃ) ও হজরত আবু বকর সিদ্দিককে (রাঃ) দড়ি দিয়ে বেঁধে

www.amarboi.org

খুব পিটালো। এর উদ্দেশ্য ছিল যাতে তাঁরা ইসলাম পরিত্যাগ করেন। কিন্তু নির্যাতন যতই করা হোক না কেন ইসলাম থেকে তাঁদের সমান্যতম বিচ্যুতিও ঘটলো না।

হজরত আমের (রাঃ) বিন ফাহিরাহ হজরত আয়েশাহ সিদ্দিকার (রাঃ) এক ধরনের ভাই তোফায়েল বিন আবদুল্লাহর গোলাম ছিলেন। তিনি ঈমান আনলেন। এতে মক্কার মুশরিকদের রাগ ও ক্রোধের তুফান তাঁর উপরে গিয়ে আপতিত হলো। এ হতভাগারা যাবতীয় নির্যাতনই তাঁর উপর চালালো। কখনো তাঁকে নৃশংসভাবে মারা হতো। কখনো উত্তপ্ত বালিতে এবং কাঁটার উপর টেনে হিঁচরে নিয়ে বেড়ানো হতো। একদিন হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) দেখলেন যে, কাফিররা তাঁর শরীরে কাঁটা বিঁধিয়ে দিচ্ছে এবং দাড়ি ধরে থাপ্পর মারছে। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁকে ক্রয় করে আযাদ করে দিলেন। এ সত্ত্বেও হুজুরের (সাঃ) সাথে হিজরত করে মদীনা না যাওয়া পর্যন্ত কাফিররা তাঁর উপর নির্যাতন চালাতে কসুর করেনি।

হজরত আয়াশ (রাঃ) বিন আবু রবিয়াহ, হজরত সালমাহ (রাঃ) বিন হিশাম এবং হজরত ওয়ালিদ (রাঃ) বিন ওয়ালিদ ইসলাম গ্রহণ করলেন। কাফিররা তাঁদেরকে কারাগারে নিক্ষেপ করলো। সেখানে তাঁরা বছরের পর বছর ধরে নিঃসঙ্গ জীবন অতিবাহিতকরেন।

হজরত যিন্নিরাহ (রাঃ) কোরেশের মখজুম বংশের দাসী ছিলেন। দাওয়াতে হকের প্রথম যুগে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। সত্য গ্রহণের অপরাধে আবু জেহেল তাঁর ওপর নিত্য-নতুন নির্যাতন চালাতো। তিনি জীবন দিতে রাজী ছিলেন, কিন্তু আল্লাহর একত্ববাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে কোন ক্রমেই প্রস্তুত ছিলেন না। আল্লামা বালাজুরী (রঃ) বর্ণনা করেছেন, হক পথে চরম নির্যাতন সইতে সইতে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসছিল। এতে আবু জেহেল ভর্ৎসনা করে বললো লাত এবং উজ্জা তোমাকে অন্ধ করে দিয়েছে। তিনি নির্দ্বিধায় জবাব দিলেন, লাত এবং উজ্জা পাথরের মূর্তি। তাদের কে পূজা করছে সেকথা তারা কি করে জানবে। আমার দৃষ্টিশক্তি চলে গিয়ে থাকলে তা আমার আল্লাহর তরফ থেকে মুসিবত হিসেবে এসেছে তিনি চাইলে আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়েও দিতে পারেন। আল্লাহ তাঁর এ দৃঢ়তাকে অত্যন্ত পছন্দ করলেন। পরের দিন তিনি যখন ঘুম থেকে জাগলেন তখন তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছেন। ইবনে হিশাম লিখেছেন, হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) তাঁকেও ক্রয় করে মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

হজরত লুবাইনাহ (রাঃ) কোরেশের বনু আদি গোত্রের একটি শাখা বনি মুয়াকালের দাসী ছিলেন। নবীর (সাঃ) নবুয়ত প্রাপ্তির প্রথম বছরগুলোতেই ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেন। এতে হজরত ওমর (রাঃ) বিন খাত্তাব (নিজের জাহেলী যুগে) এত উত্তেজিত হয়ে পড়েন যে, তাঁর উপর প্রতিদিন নির্যাতন চালাতেন। মারতে মারতে যখন ক্লান্ত হয়ে

www.amarboi.org

পড়তেন তখন বলতেন আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এজন্যে তোমাকে ছেড়ে দিয়েছি। এখনো সময় আছে, নতুন ধর্ম ত্যাগ কর। তিনি জবাবে বলতেন, "অবশ্যই নয়। তুমি যত ইচ্ছা জুলুম করে নাও।" অবশেষে তাঁকেও হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) খরিদ করে স্বাধীন করে দেন।

হজরত নাহদিয়াহ (রাঃ) এবং তার কন্যা বনু আবদিদ দার গোত্রের এক মহিলার ক্রীতদাসী ছিলেন। নবুয়ত প্রাপ্তির প্রথম যুগেই ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর প্রভু তাঁর ওপর কঠিন নির্যাতন চালান। কিন্তু তিনি এ নির্যাতন উপেক্ষা করে হক পথে অটল ছিলেন।

হজরত উম্মে উবাইস (রাঃ) বনু যোহরাহ গোত্রের বাঁদী ছিলেন। হক দাওয়াতের প্রতি সাড়া দানকারী প্রথম মুসলমানদের অন্যতম ছিলেন। হক পথে চলার অপরাধে মক্কার মশহুর মুশরিক সর্দার আসওয়াদ বিন আবদে ইয়াগুছ তার উপর চরম নির্যাতন চালাতো। কিন্তু তিনি কোন অবস্থাতেই ইসলাম থেকে মুখ ফিরাননি। শেষে হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) তাঁকে এ নির্যাতনের পাঞ্জা থেকে মুক্তি দেন।

হজরত হুমামাহ (রাঃ) হজরত বিলাল হাবশীর (রাঃ) মা ছিলেন। হাফিজ ইবনে আবদুল বার (রঃ) "আল ইসতিয়াব" গ্রন্থে লিখেছেন, তিনিও পুত্রের মত দাওয়াতে হকের প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। মুশরিকরা তাঁর পুত্রের উপর যেমন নির্যাতন চালাতো তেমনি তাঁকেও শাস্তি দিত। কিন্তু তিনি ইসলামের ওপর অটল ছিলেন।

এ হ'লো মক্কায় ইসলাম গ্রহণকারী সাবিকুনাল আওয়ালুনদের উপর জুলুম-নির্যাতনের মাত্র কতিপয় উদাহরণ। রাসূলের (সাঃ) নবুয়ত প্রাপ্তির প্রথমযুগে তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহীদের কোন শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণকারীই কাফেরদের জুলুম-নির্যাতন ও অত্যাচারের হাত থেকে নিস্তার পাননি। যখন তাদের নির্যাতন সীমা ছাড়িয়ে গেল তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মজলুম মুসলমানদেরকে হাবশার দিকে হিজরত করার পরামর্শ দিলেন। বস্তুতঃ নবুয়ত প্রাপ্তির ৫ এবং ৬ বছর পর অনেক মুসলমান পুরুষ এবং মহিলা মক্কা থেকে হিজরত করে হাবশা চলে গেলেন। প্রতিটি মানুষ প্রকৃতিগত ভাবেই স্বদেশ এবং নিজের ঘর-বাড়ীকে ভালোবেসে থাকে। এসব পরিত্যাগ করে যাওয়া তাদের জন্যে এক বিরাট পরীক্ষা। কিন্তু আল্লাহর এ পবিত্র বান্দাহরা সে পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হন। তাদের মধ্যে একদল নবীর (সাঃ) হিজরতের পূর্বেই মক্কা ফিরে আসেন এবং অন্য দলটি খায়বারের যুদ্ধ ৭ হিজরী পর্যন্ত হাবশার মুহাজিরের জীবনের মুসিবত সহ্য করতে থাকেন। নবুয়ত প্রাপ্তির ১৩ বছর পর প্রিয় নবী (সাঃ) সাহাবায়ে কিরামকে (রাঃ) মদীনায় হিজরতের নির্দেশ দেন। নির্দেশ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে হক পন্থীরা তাতে সাড়া দিলেন এবং প্রিয়

www.amarboi.org

স্বদেশভূমি, ধন-সম্পদ এবং ঘর-বাড়ীকে বিদায় জানিয়ে মদীনা গিয়ে পৌঁছলেন। আল্লাহ্ পাক তাঁদের এই কুরবাণী অত্যন্ত পছন্দ করলেন। শুধু এ কুরবাণীই নয় বরং পরবর্তীতে তাদের পদাংক অনুসরণ করে যাঁরা এসেছেন তাঁদেরকেও আল্লাহ তা'য়ালা নিজের সন্তুষ্টির সুসংবাদ দিয়েছেন। যদিও পরবর্তীতে আগমনকারীরা অগ্রগামীদের মত জুলুম-নির্যাতন সহ্য করেননি, তবুও তাঁরাও নিজের ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও জীবন হক পথে বিলিয়ে দিয়েছেন এবং হকের ঝাণ্ডা উড্ডীন রাখার জন্যে যে কোন ধরনের কোরবাণী দিতে পিছপা হননি। আল্লাহ্ পাক নিজের বিশেষ ফজিলতে তাদেরকেও সাবিকুনাল আওয়ালুনের পবিত্র দলের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। হ্যাঁ, কিছু পার্থক্যও সূচীত করেছেন। মক্কা বিজয়ের পূর্বে ঈমান আনয়নকারীদেরকে মক্কা বিজয়ের পরে ঈমান গ্রহণকারীদের চেয়ে আফজাল বা উত্তম বলা হয়েছে। যেমন সূরায়ে আল-হাদিদে ইরশাদ হয়েছে ঃ

"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিজয়ের (মক্কা) পূর্বে ব্যয় করেছে এবং লড়াই করেছে (আর যে এই কাজ পরে করেছে) তা বরাবর হতে পারে না। যারা পরে ব্যয় (ধন-সম্পদ) এবং জিহাদ ও কিতাল (কাফেরদের) করেছে তাদের মর্যাদা পূর্বে ব্যয়কারীদের চেয়ে কম। আল্লাহ পাক সবার সাথেই নেক ওয়াদা করেছেন এবং যে কাজ তোমরা সম্পাদন করো সে সম্পর্কে আল্লাহ ওয়াকিবহাল।" (আয়াত ঃ১০)

কুরআনে করিমে মুহাজিরদের সাথে সাথে আনসারদের উঁচু মর্যাদার কথাও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁরাও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং আখিরাতে সমান সমান সওয়াবের অংশীদার হবেন। সাহাবায়ে কিরামের (রাঃ) পবিত্র কাতারে আনসারদের এক বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। এ সকল পবিত্র আত্মার লোক মক্কা থেকে তিনশ' মাইল দূরে এক পুরোনো শহর ইয়াসরাবে বসবাস করতেন। তাঁরা সেখানে অত্যন্ত নির্ঝনঝাট এবং শান্তিপূর্ণভাবে জীবন অতিবাহিত করছিলেন। এ সব মানুষের ইসলাম গ্রহণেরও প্রয়োজন ছিল না এবং মক্কার হক পন্থীদের আশ্রয় প্রদানেও বাধ্য ছিলেন না। শুধুমাত্র সৎ প্রকৃতির কারণে তাঁরা হক দাওয়াতের প্রতি সাড়া দিয়েছিলেন।

নবীর (সাঃ) নবুয়ত প্রাপ্তির ১১ বছর পর হজ্ব মওসুমে ৬ জন ভদ্র স্বভাবের খাজরাজী মক্কা এলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁদের সামনে ইসলাম পেশ করলেন। তাঁরা নির্দ্বিধায় তা কবুল করলেন। ইয়াছরাব ফিরে গিয়ে অন্যান্যদের কাছেও তাঁরা তাওহীদের দাওয়াত দিলেন। নবুয়ত প্রাপ্তির ১২ বছর পর দ্বিতীয়বার তাঁরা মক্কা এলেন। এ সময় তাঁদের সাথে আরো ৬ জন হক পন্থী এসেছিলেন। তাঁরা হুজুরের (সাঃ) হাতে বাইয়াত হলেন। তাঁদের আবেদন অনুযায়ী প্রিয় নবী (সাঃ) হজরত মুসয়াব (রাঃ) বিন উমায়েরকে ইসলামের প্রথম দায়ী বানিয়ে ইয়াছরাব প্রেরণ করলেন। তাঁদের তাবলিগী প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে ইয়াছরাবের ঘরে ঘরে ইসলামের চর্চা হতে লাগলো। নবুয়ত প্রাপ্তির ১৩ বছর পর ইয়াছরাবের ৭৫ জন হকপন্থী (৭৩ জন পুরুষ এবং ২ জন মহিলা)

www.amarboi.org

মক্কা এলেন এবং কাফিরদের অগোচরে রাতের বেলা আকাবার ঘাটিতে বিশ্ব নেতার (সাঃ) সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তাঁর হাতে বাইয়াত হলেন। রাসূলুল্লাহকে (সাঃ) ইয়াছরাব তাশরীফ নেয়ার দাওয়াত দিলেন। এ সময় এ ওয়াদাও করলেন যে, তাঁরা নিজের জীবন, সন্তান এবং সম্পদ দিয়ে তাঁকে (সাঃ) হেফাজত ও সাহায্য করবেন। এই বাইয়াত ইতিহাসে বাইয়াতে উকবায়ে ছানিয়াহ, বাইয়াতে লাইলাতুল উকবাহ অথবা বাইয়াতে উকবায়ে কাবিরাহ নামে স্মরণ করা হয়। এ বাইয়াত ইসলামের ইতিহাসে মাইল ফলকের মর্যাদা রাখে। প্রকৃতপক্ষে এ বাইয়াত আরব ও আজম এবং জিন ও ইনসানের কাছ থেকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করার বাইয়াত ছিল। সে সময় আরবের প্রতিটি অণু পরমাণু হকের নিশানবাহীদের খুন পিপাসু ছিল। ইয়াছরাব ভূখণ্ডের এ সকল পূত পবিত্র মানুষ উঠে দাঁড়ালেন এবং নিজের জীবন, সম্পদ এবং সন্তানদেরকে মক্কায় নবীর (সাঃ) পদতলে এনে রাখলেন। এ সব পবিত্র ব্যক্তিত্ব নিজেদের সব কিছু হক পথে নিয়োজিত করলেন এবং ভয়-ভীতি ও গালমন্দের পরওয়া করলেন না। এ বাইয়াতের কারণে আনসাররা এমন এক মর্যদায় অধিষ্ঠিত হলেন, যার উপর তাঁরা চিরকাল ফখর করতেন। হুজুর (সাঃ) মক্কায় ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীদেরকে (রাঃ) মদীনায় হিজরতের অনুমতি দিলেন। অনুমতি পেয়ে প্রায় সকল পুরুষ ও মহিলা সাহাবীই (রাঃ) মক্কাকে বিদায় জানিয়ে মদীনা গিয়ে পৌঁছলেন। আনসাররা তাঁদেরকে আহলান সাহলান ওয়া মারহাবা বলে স্বাগত জানালেন এবং অত্যন্ত হৃষ্ট চিত্তে তাঁদের মেহমানদারী করলেন। কিছু দিন পর স্বয়ং হজরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হজরত আবু বকর (রাঃ) এবং হজরত আমের (রাঃ) বিন ফাহিরাহসহ ইয়াছরাবে তাশরীফ আনলেন। এ সময় আনসাররা রাসুলুল্লাহকে (সাঃ) এমন উষ্ণ সমর্ধনা জানালো যার নজীর বিশ্বের ইতিহাসে পাওয়া ভার। সে দিন "ইয়াছরাব" "মদীনাতুন নবীতে" রূপান্তরিত এবং তার ভূমি নভোমণ্ডলীর ঈর্ষায় পরিণত হলো।

মুহাজিরীনে কিরাম (রাঃ) বছরের পর বছর ধরে বিষবৎ অকথ্য জুলুম-নির্যাতন সহ্যের পর নিজের পরিবার পরিজন, ঘর-বাড়ী এবং ধন-সম্পদ ত্যাগ করে যখন মদীনা পৌঁছলেন তখন তাঁদের কাছে আল্লাহর নাম ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কিন্তু মদীনার আনসাররা যে ভালোবাসা এবং নিষ্ঠা ও সততার সাথে সে দেশত্যাগীদের মেহমানদারী করলেন তা এক ঈমান প্রজ্জ্বলিত কাহিনী। ইসলামের ইতিহাসে এ কাহিনী চিরকালের জন্যে আলোর বিচ্ছুরণ ঘটাবে।

প্রকৃতিগত ভাবে আনসাররা ছিলেন অত্যন্ত শরীফ, সাদাসিধে এবং রুচিশীল ও দরাজদিলসম্পন্ন মানুষ। কিন্তু শত-শত বছরের পুরোনো পারস্পরিক মুনাফিকী ও শত্রুতা তাদের শরীফ চরিত্রকে প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছিল। ইসলাম আনসারদের পারস্পরিক মুনাফিকীকে খতম এবং যারা একে অপরের রক্ত পিপাসু ছিল তাদেরকে দ্বীনের মজবুত ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে। আল্লাহ পাক এভাবে আনসারদেরকে ভয়াবহ

www.amarboi.org

ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন। সুরায়ে আল-ইমরানে ইরশাদ হয়েছে ঃ "আল্লাহর রজ্জু ঐক্যবদ্ধভাবে দৃঢ়তার সাথে ধারণ কর এবং বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করোনা। আর আল্লাহর সে নিয়ামত স্মরণ করো যখন তোমরা পরস্পর শত্রু রূপে পরিগণিত ছিলে। অতঃপর তিনি তোমাদের অন্তরে (পারস্পরিক) ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিলেন। ফলে পরস্পর তোমরা ভাই হয়ে গেলে। প্রকৃতপক্ষে তোমরা অগ্নি গহ্বরের কিনারায় দণ্ডায়মান ছিলে। আল্লাহ পাক তোমাদেরকে তা থেকে বাঁচিয়ে নিলেন। এই ভাবেই আল্লাহ তোমাদের নিকট নিজের নিদর্শনাবলী প্রকাশ্যভাবে বর্ণনা করেন। যাতে করে তোমরা পথ পাও।"—আয়াতঃ১০৩

আনসাররা আল্লাহ তা'লার এ মহান ইহসানের পুরোপুরি শুকর আদায় করলেন। তাঁরা নিজের জীবন, সম্পদ এবং সন্তানদেরকে হক পথে ওয়াকফ করে দিলেন এবং নিজেদের ত্যাগ, তিতিক্ষা এবং নিষ্ঠার এক উজ্জল নিদর্শন ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ করে দিলেন। হিজরতের কয়েকমাস পর প্রিয় নবী (সাঃ) মুহাজির এবং আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন কায়েম করলেন। এ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা শুধুমাত্র এক জরুরী পরিস্থিতির ফলশ্রুতি ছিল না বরং এর মধ্যে বিশেষ হিকমত এবং মুসলিহাত ছিল। এর ফলে একদিকে মুহাজিরদের অন্তর থেকে স্বদেশ ত্যাগের অনুভূতি বিদূরিত হচ্ছিল। দ্বিতীয়তঃ মুহাজিররা পরীক্ষা-নীরিক্ষা এবং জুলুম-নির্যাতনের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়ে খাঁটি সোনায় রূপান্তরিত হয়েছিলেন। তাঁদের প্রশিক্ষণ এবং সংশোধন স্বয়ং বিশ্ব নবী মুস্তাফা (সাঃ) করেছিলেন। এ খাঁটি সোনা সদৃশ মুহাজিররা যাতে নও-মুসলিম আনসার ভাইদের প্রশিক্ষণ দিতে পারেন সে ব্যবস্থাই এ ভ্রাতৃত্ব বন্ধন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছিল। ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সৃষ্টির পূর্বেই আনসাররা মুহাজিরদের প্রতি ছিলেন দয়ার্দ্র বা সেবাগত প্রাণ। কিন্তু এ সম্পর্ক সৃষ্টির পর তাঁরা পাতানো ভাইদের সাথে আপন ভাইয়ের চেয়েও সুন্দর ব্যবহার করলেন। তাঁরা তাঁদেরকে নিজেদের ঘরে নিয়ে গেলেন এবং সকল ধন-সম্পদ ও আসবাব পত্রসহ ঘরের প্রতিটি জিনিস গুণে গুণে তার অর্ধেক দিয়ে দিলেন। আনসারদের মালিকানা দানের আবেগ ছিল চূড়ান্ত পর্যায়ের। হজরত সা'আদ (রাঃ) বিন রাবি' আনসারী নিজের দু' স্ত্রীর একজনকে নিজের মুহাজির ভাইয়ের জন্যে পৃথক করার প্রস্তুতি নিয়েই ফেলেছিলেন। এর বিশদ বিবরণ পূর্বেই দেওয়া হয়েছে।

আনসাররা নিজের খেজুর বাগান এবং জমি মুহাজির ভাইদেরকে পেশ করলেন। বাগান পরিচর্যা এবং কৃষি বিষয়ে ওয়াকিবহাল না থাকার কারণে তাঁরা তা গ্রহণ করতে আপত্তি জানালেন। তখন আনসারদের ঈমানী জোশ উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। তাঁরা বললেন, এ খেজুরের বাগান ও জমি আমরা অবশ্যই আপনাদেরকে দিব। তাতে কৃষি ও সেচ কাজ আমরাই করবো এবং উৎপাদিত শস্যের অর্ধেক আপনাদেরকে নিতে হবে। মুহাজিররা আন্তরিকতার সাথে নিজের আনসার ভাইদের এ প্রস্তাব কবুল করলেন। খায়বার যুদ্ধ পর্যন্ত মুহাজিররা এ সকল খেজুর বাগান থেকে উপকৃত হতে থাকলেন।

www.amarboi.org

খায়বার যুদ্ধের পর তাঁরা এ সব বাগান কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আনসারদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে, বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ভ্রাতৃত্ব সহোদরের মতই আত্মীয় হয়ে গিয়েছিল। এমনকি কোন আনসার ইন্তিকাল করলে মুহাজির ভাই তার সম্পদের উত্তরাধিকার হতেন এবং মরহুমের নিকটাত্মীয় তা থেকে বঞ্চিত হতেন। বদরের যুদ্ধের পর মুহাজিরদের আর্থিক অবস্থা ভালো হয়ে গেলে সূরায়ে আনফালের এই আয়াত নাযিল হলোঃ "নিকটাত্মীয় পরস্পরের বেশী হকদার" ( আয়াত ৭৫)

বস্তুতঃ আল্লাহর এ ফরমান বাস্তবায়নে আনসার এবং মুহাজিরদের পারস্পরিক উত্তরাধিকারের বিধান বাতিল করা হয় এবং শুধুমাত্র নিকটাত্মীয়ের মধ্যেই উত্তরাধিকারের নীতি চালু হয়।

আনসারদের ত্যাগ ও সততা নিজেদের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ভাইদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং যখনই প্রয়োজন হয়েছে তখনই তাঁরা হক পথে নিজের সাধ্যের বাইরেও কোরবাণী পেশ করেছেন। হজরত হারিছাহ (রাঃ) বিন নু'মান আনসারী নিজের কয়েকটি বাড়ী প্রিয় নবীর (সাঃ) হাওয়ালা করে দিয়েছিলেন। এমনিভাবে আসহাবে সুফফার ভরণ পোষণের বিষয়টিও নিজেদের দায়িত্বে নিয়েছিলেন। জিহাদের ডাক এলেই তাঁরা নিজেদের জান এবং মাল সমেত ইসলামের জন্যে দণ্ডায়মান হয়ে যেতেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বদরের যুদ্ধের পূর্বে আনসারদের ইচ্ছা বিশেষ করে অবহিত হলেন। কেননা তাঁরা মদীনার বাইরে গিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল না। মুহাজিরদের সাথে পরামর্শের পর যখন হুজুর (সাঃ) বললেন, এখন অন্যরাও পরামর্শ দিন। আওস গোত্রের সরদার হজরত সায়াদ (রাঃ) বিন মায়াজ তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন এবং আবেগময় ভাষায় আরজ করলেনঃ

"ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা আপনার উপর ঈমান এনেছি। আপনার রিসালাতের সত্যতা স্বীকার করেছি। আপনার আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। সুতরাং যা মর্জি হয় তাই করুন। সেই মহান আল্লাহর শপথ, যিনি আপনাকে রাসূল (সাঃ) বানিয়ে প্রেরণ করেছেন। আপনি সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দিলে আমরা তাই করবো। আমাদের একজন শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণকারীও পেছনে থাকবে না। ইনশা'আল্লাহ আপনি আমাদেরকে যুদ্ধের ময়দানে অটল এবং বাহাদুর হিসেবেই পাবেন। আল্লাহ আমাদের তরফ থেকে আপনার চক্ষু শীতল করবেন।"

অন্য এক রাওয়ায়েতে আছে, সেই সময় খাজরাজ গোত্রের সরদার হজরত সায়াদ (রাঃ) বিন উবাদাহ এই বক্তৃতা করেছিলেনঃ

www.amarboi.org

"হে আল্লাহর রাসূল, সম্ভবতঃ আপনি আনসারদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আপনি যদি সমুদ্রের নির্দেশ দেন তাহলে আমরা তা পদদলিত করবো। আর যদি শুকনো স্থানের নির্দেশ দেন তাহলে বারকে গামমাদ পর্যন্ত (হাবশাহ অথবা ইয়েমেনের একটি স্থানের নাম) উঁটের কলিজা গলিয়ে ফেলবো।"

আনসারদের জিহাদের আবেগ এবং ত্যাগের জযবাহ্ দেখে হুজুরের (সাঃ) চেহারা মুবারক আনন্দে ঝলমল করে উঠলো।

শুধু বদরের যুদ্ধেই নয় বরং আনসাররা প্রত্যেক যুদ্ধেই এবং সব সময়ই মুহাজিরদের পাশে থেকে হক পথে জীবন কুরবানীর চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। সত্য পথে তাদের জীবন দান এবং রাসূল (সাঃ) প্রেমের কতিপয় উদাহরণ এখানে পেশ করা হলোঃ

হজরত হিন্দ (রাঃ) বিনতে আমর বিন হারাম আনসারীয়াহর স্বামী হজরত আমর (রাঃ) বিন জামুহর সন্তান হজরত খাল্লাদ (রাঃ) বিন আমর (রাঃ) এবং ভাই হজরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমর বিন হারাম ওহোদের যুদ্ধে বাহাদুরীর সাথে লড়াই করতে করতে শাহাদাত প্রাপ্ত হন। হজরত হিন্দ (রাঃ) স্বামী, সন্তান এবং ভাইয়ের শাহাদাতের খবর শুনে কোন দুঃখ প্রকাশ না করে লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "রাসূলের (সাঃ) কি অবস্থা আমাকে তা বলো। তাঁর তো কোন ক্ষতি হয়নি ?"

লোকরা যখন বললো, খোদার ফজলে হুজুর (সাঃ) ভালো আছেন; তখন তাঁর চেহারা আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠলো। ধীরে ধীরে তিনি যুদ্ধের ময়দানের দিকে রওয়ানা হলেন। যখন রাসূলুল্লাহকে (সাঃ) দেখলেন তখন অযাচিতভাবে মুখ দিয়ে একথা বেরিয়ে গেলঃ "আপনি ভালো থাকলে সব মুসিবতই তুচ্ছ ব্যাপার।"

হজরত আনাস (রাঃ) বিন নজর আনসারী ওহোদের যুদ্ধে কতিপয় বাহাদুর মুসলমানকে অস্ত্র ফেলে দিয়ে বিষণ্ন অবস্থায় বসে থাকতে দেখলেন। জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা যুদ্ধ ছেড়ে এখানে বসে আছ কেন? তাঁরা বললেন, আফসোস ! রাসূলুল্লাহ (সাঃ) শহীদ হয়ে গেছেন। হজরত আনাস বললেন, তাহ'লে তোমরা জীবিত থেকে কি করবে। ওঠো এবং হক বা সত্যের জন্যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যেমন জীবন দান করেছেন তেমনি তোমরাও কাফেরদের সাথে লড়াই করে জীবন বিলিয়ে দাও। একথা বলেই অত্যন্ত জোশের সাথে তরবারী চালাতে চালাতে কাফেরদের মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং ৭০টি আঘাত খেয়ে শহীদ হয়ে গেলেন। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হজরত আনাস (রাঃ) বিন মালেক খাদেমে রাসূল (সাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, সূরায়ে আহযাবের এ আয়াত হজরত আনাস (রাঃ) বিন নজরের প্রসঙ্গেই অবতীর্ণ হয় ঃ "ঈমানদারদের মধ্যে এমনও



www.amarboi.org

আছেন যাঁরা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত ওয়াদা সত্য করে দেখিয়েছেন। তাদের মধ্যে কেউ নিজের সময় পূর্ণ করেছে এবং কেউ সময় আসার অপেক্ষায় আছেন।"—আয়াতঃ২৩

হজরত খুবাইব (রাঃ) বিন আদি আনসারী এবং হজরত যায়েদ (রাঃ) বিন দাছনা আনসারীকে যাদল ওকারাহর লোকেরা বিশ্বাসঘাতকতা করে রাজি নামক স্থানে গ্রেফতার করলো। অতঃপর মক্কার কোরেশদের হাওয়ালা করে দিল। এ জালেমরা তাঁদের দু'জনকেই শূলে চড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল। উরওয়াহ (রাঃ) এবং মুসা (রঃ) বিন উকবাহ থেকে বর্ণিত আছে যে, মুশরিকরা যখন হজরত খুবাইবকে (রাঃ) শূলে চড়াচ্ছিল তখন তাঁকে উচ্চস্বরে ডেকে এবং কসম খেয়ে জিজ্ঞেস করলো, তোমার পরিবর্তে যদি মুহাম্মাদ (সাঃ) শূলে চড়ে এ সময় তুমি নিজের গৃহে আরামে অবস্থান কি পছন্দ করবে? হজরত খুবাইব (রাঃ) বললেনঃ "আল্লাহর কমস। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সাঃ) পবিত্র পায়ে যদি কাঁটাও ফোঁটে। আর আমি নিজের গৃহে আরামে বসে থাকবো—এটা আমার সহ্যের বাইরে।"

এমনিভাবে হজরত যায়েদ (রাঃ) বিন দাছনাকে শুলে চড়ানোর আগে আবু সুফিয়ান (তখনও ঈমান আনেননি) জিজ্ঞেস করলো, ''হে যায়েদ। খোদার কসম তুমি সত্যি সত্যি বল, যদি তোমার পরিবর্তে মুহাম্মদের গর্দান উড়িয়ে দেয়া হয় তাহলে কি তুমি নিজের পরিবার-পরিজনসহ খুশীতে থাকবে ?"

এ হক পন্থী বীর পুরুষ আবু সুফিয়ানকে ঠিক একই জবাব দিয়েছিলেন যা খুবাইব রাঃ) মুশরিকদের দিয়েছিলেন। অর্থাৎ আমিতো মুহাম্মাদের (সাঃ) পায়ে কাঁটা ফোঁটাও সহ্য করতে পারি না। তাঁর জবাব শুনে আবু সুফিয়ানের (রাঃ) মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলঃ ''মুহাম্মাদের সাথী তাঁকে যেভাবে ভালোবাসে, দুনিয়ার আর কোন ব্যক্তিরই এমন প্রেমিক নেই।"

ওহোদের যুদ্ধে হজরত সায়াদ (রাঃ) বিন রবি' আনসারী মুশরিকদের বিরুদ্ধে বাহাদুরী প্রদর্শন করে মারাত্মকভাবে আহত হলেন। এক রাওয়ায়েত মতে তিনি ১২টি আঘাত পেয়েছিলেন এবং অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহকে (সাঃ) গভীরভাবে ভালোবাসতেন এবং রাসূলেরও (সাঃ) তাঁর সাথে গভীর সম্পর্ক ছিল। যুদ্ধে পর তিনি সায়াদকে (রাঃ) দেখলেন না। সাহাবাদেরকে (রাঃ) সম্বোধন করে বললেন, ''এমন কি কেউ আছে যে সায়াদ বিন রবি'র খবর আনবে ?"

হজরত উবাই (রাঃ) বিন কায়াব আনসারী আরজ করলেনঃ ''ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি যাচ্ছি।" একথা বলে তিনি যুদ্ধের ময়দানে গেলেন এবং লাশের মধ্যে ঘুরে ঘুরে হজরত সায়াদ (রাঃ) বিন রবি'কে খোঁজ করতে লাগলেন। বার বার তাঁর নাম ধরে

www.amarboi.org

ডাকছিলেন, কিন্তু কোন জবাব পাচ্ছিলেন না। অবশেষে তিনি উচ্চস্বরে একথা বললেন, "সায়াদ যদি জীবিত থাকো তাহলে জবাব দাও — রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন।"

সে সময় হজরত সায়াদ (রাঃ) বিন রবি'র মুমূর্ষ অবস্থা। হুজুরের (সাঃ) নাম শুনে শরীর ও রূহের সকল শক্তি একত্র করে তিনি ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব দিলেনঃ

"রাসূলুল্লাহর (সাঃ) পবিত্র খিদমতে আমার সালাম পেশ করবে এবং আমার আনসার ভাইদেরকে বলবে, খোদা নাখাস্তা আজ যদি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) শহীদ হয়ে থাকেন, আর তোমাদের মধ্যে যদি কেউ জীবিত থাকে তাহলে আল্লাহর নিকট অবশ্যই মুখ দেখাতে পারবে না এবং তাঁর নিকট তোমাদের কোন ওজরই গ্রহণীয় হবে না। আমরা লাইলাতুল উকবাতে রাসূলুল্লাহ'র (সাঃ) উপর আত্মোৎসর্গের ওয়াদা করেছিলাম।" একথা বলেই আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন।

আনসারদের এ কুরবানীর কারণেই আল্লাহর নিকট মুহাজিরদের মত তারাও মর্যদার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছিলেন। তাদেরকে সাচ্চা মুমিন উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন এবং জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন।

কুরআনে কারিমে সাহবায়ে কিরামের (রাঃ) মর্যাদা বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। কোথাও সকল সাহাবীর (রাঃ) উচ্চ মর্যাদার কথা সামষ্টিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং কাউকে বাদ না দিয়ে সবার জন্যে মাগফিরাত এবং বেহেশতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। কোথায়ও কোন বিশেষ ঘটনা অথবা স্থান ও কাল হিসেবে সাহাবায়ে কিরামের (রাঃ) কোন বিশেষ দলকে আল্লাহর সন্তুষ্টির সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। কোন কোন স্থানে এমন আয়াতও আছে যা কোন বিশেষ সাহাবীর (রাঃ) শানে নাযিল হয়েছে। এমন অনেক আয়াতও আছে যা পুর্বে নাযিল হয়েছিল। এ সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন কোন সাহাবীর (রাঃ) কোন বিশেষ নেক কাজ দেখেছেন তখন এ সব আয়াত তিলাওয়াত করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি এটাই বলতে চেয়েছেন যে, রাসূলের (সাঃ) অমুক সাহাবীর (রাঃ) এ কাজ আল্লাহর নিকট এত পছন্দনীয় যে, তাঁর উপর এ আয়াত প্রযোজ্য।

যে সব আয়াতে সকল সাহাবীকে (রাঃ) জান্নাতী বলা হয়েছে তার মধ্যে কতিপয় উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। এখন অন্য ধরনের কিছু উদাহরণ এখানে পেশ করা হলোঃ

৬ষ্ঠ হিজরীর ১লা জিলকদ সারওয়ারে আলম (সাঃ) ওমরাহ'র ইরাদা করলেন এবং ১৪শ' সাহাবী (রাঃ) সহ মদীনা মুনাওয়ারাহ থেকে মক্কা যাত্রা করলেন। তিনি সাহাবীদেরকে (রাঃ) তরবারী ছাড়া অন্য কোন অস্ত্র সাথে নিতে নিষেধ করলেন এবং তরবারীও খাপে ভরে নিতে বললেন। জুল হালিফা পৌঁছে হুজুর (সাঃ) এবং সাহাবীরা

www.amarboi.org

(রাঃ) ইহরাম বাঁধলেন। এদিকে মক্কায় কোরেশরা মুসলমানদের আগমনের খবর পেয়ে মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন খবর পেলেন যে, কোরেশরা বাধা দিতে প্রস্তুত তখন তিনি হুদাইবিয়া পৌঁছে তাঁবু খাটালেন এবং সেখান থেকে কোরেশদের নিকট এক পয়গাম প্রেরণ করলেন। পয়গামে তিনি জানালেন যে, আমরা শুধু ওমরাহ করতে এসেছি। লড়াই করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কোরেশরা দু'দিন পর উরওয়াহ (রাঃ) বিন মাসউদ ছাকাফীকে (তিনি তখনো ঈমান আনেননি) হুজুরের (সাঃ) সাথে আলোচনার জন্যে পাঠালো। তিনি আলাপ আলোচনার পর ফিরে গিয়ে কোরেশদেরকে আলোচনার বিস্তারিত জানালেন এবং সাথে সাথে আরো বললেনঃ

"হে কোরেশ ভাইয়েরা ! দুনিয়ার বড় বড় রাজা বাদশাহ্দের দরবারে যাওয়ার সুযোগ আমার হয়েছে। আমি কাইসার ও কিসরা এবং নাজ্জাশীর দরবারের শান শওকত দেখেছি। কিন্তু খোদার কসম, মুহাম্মাদের (সাঃ) সাথীরা তাঁকে যে ইজ্জত এবং সম্মান করে তা কোন ক্রয়কৃত গোলামও সেই সব রাজা বাদশাহদের সাথে করে না। মুহাম্মদ (সাঃ) থুথু ফেললেও এ সব মানুষ অগ্রসর হয়ে সে থুথু নিজের হাতে নেয় এবং উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে তা মুখে এবং হাতে লাগায়। মুহাম্মাদ (সাঃ) ওজু করলে এ সব মানুষ ব্যবহৃত পানির প্রতিটি ফোটার উপর এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে যেন তাঁরা পরস্পর এজন্যে লড়াই করে জীবন দেবে। মুহাম্মাদ (সাঃ) কোন নির্দেশ দিলে তা পালনের জন্যে সবাই এগিয়ে আসে। মুহাম্মাদ (সাঃ) কোন কথা বললে সকলেই চুপ মেরে যায়। মুহাম্মাদের (সাঃ) এমন মর্যদা যে, কোন সাথী তাঁর প্রতি তাকাতেও সাহস পায় না। আমার কথা যদি তোমরা শোনো, তাহলে তোমরা তাঁর সাথে সন্ধি করে নাও।"

কোরেশরা যদিও উরওয়াহ (রাঃ) বিন মাসউদকে বুজুর্গ ব্যক্তি হিসেবে মানতো কিন্তু তাঁর পরামর্শের প্রতি কর্ণপাত করলো না। ওদিকে হুজুর (সাঃ) উরওয়াহর (রাঃ) ফিরে যাওয়ার পর হজরত ওসমান জুন্নুরাইনকে (রাঃ) নিজের দূত হিসেবে কোরেশদের নিকট প্রেরণ করলেন। কোরেশরা হজরত ওসমানকে (রাঃ) মক্কায় আটকে ফেললো। যখন তিনি ফিরে এলেননা তখন মুসলমানদের মধ্যে প্রচারিত হলো যে, হজরত ওসমানকে (রাঃ) মুশিরিকরা শহীদ করে ফেলেছে। হুজুর (সাঃ) বললেন, "যদি এ খবর সঠিক হয়, তাহলে আমরা ওসমানের (রাঃ) বদলা নেয়া ছাড়া এখান থেকে ফিরে যাবো না।" সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) যদিও সরঞ্জামহীন ছিলেন তবুও সবাই হুজুরের (সাঃ) কথায় সাড়া দিলেন। প্রিয়নবী (সাঃ) একটি বাবলা বৃক্ষের নীচে বসে পড়লেন এবং মুসলমানদের নিকট থেকে দেহে জীবন থাকা অবস্থায় কাফিরদের সাথে লড়াই করার ও পেছনে না হটার বাইয়াত নিলেন।

সকল সাহাবীই (রাঃ) অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে জীবন কুরবানী করার বাইয়াত করলেন। ইসলামের ইতিহাসে এই বাইয়াত "বাইয়াতে রিদওয়ান" নামে

www.amarboi.org

প্রসিদ্ধ। এই সময় সুরায়ে ফাতাহর এ আয়াত নাযিল হয় ঃ "আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন। যখন তারা বৃক্ষের নীচে তোমার নিকট বাইয়াত করছিলেন। তাদের অন্তরের অবস্থা তিনি জানতেন।"—আয়াতঃ১৮

হিজরতের সময় হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) গারে ছুর এবং মদীনা সফরে রাসূলুল্লাহর (সাঃ) সাথে থাকার মহান মর্যাদা লাভ করেছিলেন। এ কাজটি ছিল জীবন বাজী রাখার কাজ। কেননা সে সময় মক্কার কাফিররা রাসূলের (সাঃ) এবং তাঁর সাথীদের জীবন হননের অপচেষ্টায় লিপ্ত ছিল। আল্লাহ পাক হজরত আবু বকর সিদ্দিকের (রাঃ) জীবন কুরবানী করার আবেগ এত পছন্দ করলেন যে, এই আয়াতনাযিল করলেন ঃ "তোমরা যদি রাসূলকে সাহায্য না কর তাহলে আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করেছে। যে সময় কাফিররা তাঁকে বহিস্কার করেছিল তখন সে দু'জনের দ্বিতীয় ছিল। যখন তাঁরা গার এ ছিলেন তখন তিনি নিজের সাথীকে বলছিলেন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ো না। অবশ্যই আল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন।"—সুরায়ে তওবাহঃ৪০ আয়াত

যেন স্বয়ং আল্লাহ পাক হজরত আবু বকর সিদ্দিককে (রাঃ) দুইজনের একজনের মর্যাদাপূর্ণ খিতাবে ভূষিত করলেন।

যখন সুরায়ে "আল-হাদিদের" এ আয়াত নাযিল হলো ঃ 'কে আছ যে আল্লাহকে কর্জ দেবে? ভালো কর্জ। যাতে আল্লাহ তাকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে ফেরত দেবে এবং তার জন্যে উত্তম বদলা রয়েছে।"—আয়াতরঃ১১

এ আয়াত শুনে হজরত আবুদ্ দাহদাহ আনসারী (রাঃ) হুজুরকে (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন,"হে আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ কি আমাদের নিকট কর্জ চান?" রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, "হে আবদ্ দাহদাহ। হ্যাঁ। তিনি আরজ করলেন, "আপনার হাতটা আমাকে একটু দেখান।" হুজুর (সাঃ) নিজের পবিত্র হাত তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিলেন। তিনি তা নিজের হাতে নিয়ে বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আল্লাহকে আমার বাগান কর্জ দিয়ে দিয়েছি।" হজরত আবু দাহদাহ (রাঃ) যে বাগানটি আল্লার রাহে দিলেন তাতে ৬শ খেজুরের বৃক্ষ ছিল এবং সেখানে তাঁর বাড়ী ছিল। প্রিয় নবীর (সাঃ) সাথে কলা বলে তিনি সোজা বাড়ী গেলেন এব স্ত্রীকে ডেকে বললেন, "দাহদাহ'র মা! বেরিয়ে এসো। আমি এই বাগান আল্লাহকে কর্জ দিয়ে দিয়েছি।"

স্ত্রীও নেকবখত ছিলেন। বললেন, "হে আবুদ্ দাহদাহ, তুমি লাভের বাণিজ্য করেছ।" এবং তৎক্ষণাৎ সামান নিয়ে বাগান থেকে বের হয়ে এলেন।

একদিন সারওয়ারে আলম (সাঃ) সাহাবায়ে কিরামের (রাঃ) এক দলের মধ্যে মধ্যমণি হিসেবে বসেছিলেন। এ সময় এক ব্যক্তি পেরেশান অবস্থায় তাঁর খিদমতে

www.amarboi.org

হাজির হয়ে আরজ করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল। আমি একজন মুসাফির। মদীনায় আমার থাকা ও খাওয়ার কোন বন্দোবস্ত নেই। আপনার সাহায্যের মুখাপেক্ষী।"

প্রিয় নবী (সাঃ) তৎক্ষণ্যৎ আজওয়াজে মুতাহ্হিরাতের (স্ত্রীদের) নিকট ঘরে কিছু খাবার আছে কিনা তা জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন। সব দিক থেকেই উত্তর এলো যে আজ সবাই ভূখা। তখন তিনি সাহাবাদের (রাঃ) দিকে তাকালেন এবং বললেন ঃ "এমনকি কেউ আছে যে আল্লাহর বান্দাহকে মেহমান বানাবে?"

হুজুরের (সাঃ) ইরশাদ শুনে হজরত আবু তালহা আনসারী (রাঃ) উঠে দাঁড়ালেন এবং আরজ করলেন ঃ

"ইয়া রাসূলাল্লাহ। তাকে আমার সাথে নিয়ে যাবো।" একথা বলেই তিনি বাড়ী গেলেন এবং স্ত্রীকে মেহমান আগমনের খবর দিলেন। তিনি জানালেন ঃ "বাচ্চাদের জন্যে কিছু পাকানো হয়েছে। এছাড়া আল্লাহর কসম ঘরে কিছুই নেই।"

হজরত আবু তালহা (রাঃ) বললেন, "এতে ক্ষতির কিছু নেই। বাচ্চাদেরকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে শুইয়ে দাও। যখন তারা শুয়ে পড়বে তখন আমরা তাদের খাবার মেহমানের সামনে দেব। তুমি চেরাগ ঠিক করার বাহানায় উঠে তা নিভিয়ে দেবে। অন্ধকারে মেহমান খাবার খেয়ে নেবে এবং আমরাও এমনি এমনি মুখ চালাতে থাকবো।"

মোট কথা এভাবে মেহমানকে খাবার খাইয়ে স্বামী-স্ত্রী দু'জন এবং বাচ্চারা রাতে অভুক্ত অবস্থায় কাটালেন। সকালে যখন এ অপরিচিত মেহমান হুজরের (সাঃ) খিদমতে উপস্থিত হলেন তখন রাসূলের (সাঃ) মুখে সূরায়ে হাশরের এ আয়াত উচ্চারিত হচ্ছিলঃ"এবং সে ব্যক্তি নিজের উপর অন্যদের অগ্রাধিকার প্রদান করে। যদিও তারা ক্ষুধাতুরথাকে।"—আয়াতঃ৯)

আর হুজুর (সাঃ) বলছিলেন, "রাতে মেহমানের সাথে তোমাদের ব্যবহার আল্লাহ খুব পছন্দ করেছেন।"

এভাবে আরো একদিন এই হজরত তালহাই (রাঃ) রাসূলের নিকট উপস্থিত ছিলেন। ঠিক এমনি সময় সূরায়ে আলে ইমরানের এই আয়াত নাযিল হলোঃ "যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় খরচ না করবে ততক্ষণ তোমরা কখনই সওয়াব পাবে না।"—আয়াতঃ৯২)

মসজিদে নববীর সামনে এক প্রশস্ত ও সুন্দর বাগানের মালিক ছিলেন হজরত তালহা (রাঃ)। এ বাগানের কূপ "বিরহার" পানি অত্যন্ত পরিষ্কার, সুমিষ্ট ও খোশবুদার

www.amarboi.org

ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অত্যন্ত উৎসাহের সাথে এ কূপের পানি পান করতেন। মদীনায় এ ধরনের সম্পদ অত্যন্ত মূল্যবান বলে পরিগণিত হতো। কিন্তু হজরত আবু তালহা উঠে দাঁড়ালেন এবং আরজ করলেন ঃ "ইয়া রাসূলাল্লা! আমার সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ হলো 'বিরহা'। আমি তা আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করছি। আল্লার কসম, যদি একথা গোপন রাখা যেত তাহলে তা কখনো প্রকাশ করতামনা।"

আল্লাহর পথে তাঁর খরচের জযবাহ্ দেখে রাসূলুল্লাহর (সাঃ) চেহারা মুবারাক আলোকোজ্জল হয়ে উঠলো। তাঁর জন্যে দোয়া করলেন এবং বললেন, নিজের নিকটাত্মীয়দের মধ্যে এ বাগান বন্টন করে দাও। তিনি তৎক্ষণাৎ রাসূলের (সাঃ) নির্দেশ পালন করলেন এবং সমগ্র বাগান আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন।

কুরআনে হাকিমে সাহাবা কিরামের (রাঃ) ভালো কাজের আকাংখা, ত্যাগ ও আল্লাহর পথে ব্যয়ের প্রশংসা প্রায়ই করা হয়েছে; আল্লাহর পথে ব্যয়ের একটি চূড়ান্ত নজীর হলো ঃ তাবুকের যুদ্ধের সময় হুজুর (সাঃ) সাহাবায়ে কিরামকে (রাঃ) আল্লাহর পথে ব্যয়ের আহ্বান জানালেন। এ সময় অন্যান্য সাহাবী (রাঃ) নিজেদের সামর্থের চেয়ে বেশী সম্পদের কোরবানী দিলেন। কিন্তু হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এক ইতিহাস সৃষ্টি করলেন।

তিনি ঘরের সেলাইয়ের সুতা পর্যন্ত এনে রাসূলের (সাঃ) সামনে পেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, আবু বকর, ঘরে কিছু রেখে এসেছো তো? জবাবে হজরত আবু বকর (রাঃ) বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের (সাঃ) নাম ছাড়া আর কিছুই রেখে আসিনি। আর তাই আমার জন্যে যথেষ্ট।"

সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) এমনি ধরনের উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ পাক তাদের পথকে অনুকরণীয় পথ হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁদের বিরোধীতাকে রাসুলের বিরোধীতা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। সূরায়ে আন নিসাতে ইরশাদ হয়েছেঃ

"তাদের সামনে হিদায়াতের রাস্তা খুলে যাওয়ার পরও যারা রাসূলের (সাঃ) বিরোধিতা করে এবং মুমিনদের রাস্তা পরিত্যাগ করে চলে; আমরা তাদেরকে সে দিকেই ফিরিয়ে দেব যেদিকে তারা ফেরে এবং কিয়ামতের দিন জাহান্নামে প্রবেশ করাবো। আর জাহান্নাম অত্যন্ত খারাপ স্থান।

মুফাসসিরদের নিকট এখানে 'মুমিনদের রাস্তা'র অর্থ হলো সাহাবায়ে কিরামের (রাঃ) রাস্তা বা পথ, আর সাহাবায়ে কিরামের (রাঃ) সেই পবিত্র নফস সম্পর্কে কুরআনে হাকিমে বারংবার তারিফ এবং প্রশংসা করা হয়েছে। সাহাবাদের উন্নত চরিত্র ও সুন্দর

www.amarboi.org

সুষ্ঠু কাজের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরতে হলে ভারি ভারি কিতাব রচনা করতে হয়। এখানে তাঁদের কতিপয় গুণাবলীর কথা উল্লেখ করা হলো ঃ

সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) ছিলেন আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের অনুগত, সত্য ঈমানের অধিকারী, নেক নিয়তধারী, নেকীর প্রতি অগ্রগামী, প্রতিটি ভালো কাজে আগুয়ান, হকের জন্যে জীবন বাজী রাখা, হকের জন্যে আত্মীয় স্বজন, স্বদেশ, ঘর বাড়ী, ধন সম্পদ সবকিছুই কোরবাণী করা, হালাল কামাই এবং হালাল খাওয়া, হারাম থেকে বিরত থাকা, ন্যায়–পরায়ণ, আমানতদার, প্রতিশ্রুতি পূরণকারী হক পথে সব ধরনের মুসিবত ধৈর্য এবং স্থৈর্যের সাথে মুকাবিলাকারী, মুখলিস, হক পথে বেশী বেশী সম্পদের কোরবাণী করা, নিজের প্রয়োজনের উপর অন্যের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার প্রদান, নিজের জবানকে আয়ত্বে রাখা, পরস্পর রহমশীল, কাফেরদের উপর কঠিন, কবিরাহ গুণাহ এবং বেশরমী থেকে বেঁচে থাকা, নিজেদের গুপ্তস্থান হেফাজত করা, রাগের সময় ক্ষমা করা, নামাজ কায়েম করা, হজ্ব করা, রোযা রাখা, যাকাত প্রদান করা জ্ঞান আহরণকরা, নেক কাজের নির্দেশ দেয়া এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা, সত্য সাক্ষ্য প্রদান করা, আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করা, মুসিবতে ধৈর্য ধারণ, ফখর এবং আত্মম্ভরিতা থেকে দূরে থাকা, গরীব, মিসকিন ও সওয়ালকারীকে সাহায্য করা, প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার করা, পিতা–মাতার খিদমত করা রাতের নির্জনত্বে বেশী বেশী সিজদা করাসহ এ ধরণের বহু গুণের আধার ছিলেন তারা।

সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) এ গুণের বদৌলতেই আল্লাহর প্রিয় ও পছন্দীয় হতে পেরেছিলেন। তাঁদের মর্যাদার সবচেয়ে বড় প্রমাণ এর থেকে আর কি হতে পারে যে, কুরআনে পাকে তাঁদেরকে ইহ ও পরকালে সফলতায় অভিষিক্ত মানুষ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং প্রকাশ্য ভাষায় বলা হয়েছেঃ "আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে।"

একজন মুসলমানের জীবনের লক্ষ্যই হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং পরকালীন মুক্তি। কিন্তু যেসব মহান নফসকে স্বয়ং আল্লাহ নিজের সন্তুষ্টির সুসংবাদ দেন; তাঁদের মরতবা ও মর্যাদার আন্দাজ কে করতে পারে? নিঃসন্দেহে নবীদের (আঃ) পর তাঁরাই হলেন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। আর যে ব্যক্তি তাদের পদাংক অনুসরণ করে চলে তার ভাগ্যবান হওয়া সম্পর্কে কোন কথাই উঠতে পারে না। আল্লাহ্ পাক সকল মুসলমানকে সাহাবাদের (রাঃ) পদাংক অনুসরণ করার তাওফিক দিন আমীন।

www.amarboi.org

# হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ)

মক্কায় তখন চরম অবস্থা। সাহাবীরা (রাঃ) মুশরিকদের অত্যাচারে জর্জরিত। শুধু অত্যাচারই নয় তাদের জীবন বিপন্ন। এ অবস্থায় রাসূলে করীম (সাঃ) তাদেরকে হিজরতের অনুমতি দিলেন। হিজরতের অনুমতি পেয়ে তাঁরা নিজেদের ঘর বাড়ী এবং প্রিয় স্বদেশ ভূমি ছেড়ে ইয়াসরাব চলে এলেন। এর অব্যবহিত পরই রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-ও ইয়াসরাব তাশরীফ আনলেন। হেজায ভূমির এ প্রাচীন শহর "মদীনাতুন নবী" নামে খ্যাত হলো। এ সময় এক ঘটনা ঘটলো ঃ মুজাহিদদের মদীনা আগমনের পর বেশ কিছুদিন যাবত তাদের কোন সন্তান জন্ম গ্রহণ করেনি। মদীনার ইহুদীরা ছিল অত্যন্ত নীচ প্রকৃতির। তারা এক গুজব রটালো। যাদু করে তারা মুসলমানদের বংশধারা বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে—এ ছিল তাদের গুজবের বিষয়বস্তু। ইহুদীদের কথায় মুসলমানদের আস্থাতো ছিল না। কিন্তু তারা মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়লেন। ইহুদীদের এ মিথ্যা প্রচারণা যখন তুঙ্গে তখন তাদের মুখে ছাই দিয়ে এক মুহাজির পরিবারে একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হলো। এ খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে মুসলমানদের মধ্যে খুশীর বন্যা বয়ে গেল এবং তাদের না'রা ধ্বনিতে পাহাড় গুঞ্জরিত হয়ে উঠলো। শিশুটির মাতা-পিতা তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খিদমতে হাজির হলেন। তিনি শিশুটিকে কোলে উঠিয়ে নিলেন। অতঃপর একটি খেজুর আনালেন। পবিত্র মুখে তা চিবুলেন এবং মুখের লালা নবজাতকের মুখে দিলেন। শিশুটির জন্য দোয়া করলেন এবং তাকে তার মায়ের কোলে তুলে দিলেন।

নিঃসন্দেহে শিশুটি সৌভাগ্যবান। তার জন্ম গ্রহণে হক পন্থীদের মধ্যে খুশীর জোয়ার বয়ে গিয়েছিল। শিশুটির মুখে এবং পেটে সর্ব প্রথম যে বস্তু গিয়েছিল তাহলো রহমতে দো-আলম ফখরে মওজুদাত (সাঃ)-এর পবিত্র মুখের লালা। এ শিশুটি ছিলেন সাইয়েদেনা হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ)।

হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ) ইসলামের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। রাসূল (সাঃ)-এর ইন্তেকালের সময় যদিও তাঁর বয়স ১০ বছরের বেশী ছিল না তবুও নিজের বংশ, ইলম ও ফজল, জুহদ ও ইবাদাত

www.amarboi.org

বাহাদুরী এবং অন্যান্য গুণাবলীর ভিত্তিতে তিনি উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন অন্যতম সাহাবী ছিলেন। কোরেশের বনু আসাদ গোত্রের সাথে ছিলেন তিনি সম্পৃক্ত। তাঁর বংশনামা নিম্নরূপঃ

আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ) ইবনুল আওয়াম বিন খুয়ায়েলেদ বিন আসাদ বিন আবদুল উজ্জা বিন কুসাই।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) –এর পিতা হযরত যোবায়ের (রাঃ) ইবনুল আওয়াম আসহাবে আশারাহ মুবাশশিরা (রাঃ) –এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হাওয়ারীয়ে রাসূল (সাঃ) তাঁর উপাধি ছিল। তিনি উম্মুল মু'মিনিন হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রাঃ)–এর আপন ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। হুযুর (সাঃ)–এর ফুফু হযরত ছুফিয়া (রাঃ) বিনতে আবদুল মুত্তালিব তাঁর মাতা ছিলেন। এ দিক থেকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর মামাতো ভাই ছিলেন। এবং হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) ছিলেন হুযুর (সাঃ)–এর ভ্রাতুষ্পুত্র।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)–এর মাতা হযরত আসমা (রাঃ) সাইয়েদেনা সিদ্দিকে আকবর (রাঃ) –এর বড় কন্যা ছিলেন। তিনি জলিলুল কদর সাহাবিয়াদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর উপাধি ছিল জাতুন নাতাক অথবা জাতুন নাতাকাতাইন। কেননা নবী (সাঃ)–এর হিজরতের সময় তিনি নিজের কমরবন্দ (নাতাক) ছিঁড়ে খাদ্য ভাণ্ডের মুখ বেঁধেছিলেন। মাতার দিক থেকে মুহসিনায়ে উম্মতে উম্মুল মু'মিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ)–এর খালা ছিলেন। মোট কথা মাতা ও পিতা উভয় দিক থেকেই তাঁর বংশীয় মর্যাদা সবার নিকট গ্রহণযোগ্য ছিল।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন যোবায়ের(রাঃ)–এর জন্ম সাল প্রশ্নে দু'ধরনের রাওয়ায়েত আছে। এক রাওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি প্রথম হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং অন্য রাওয়ায়েত অনুসারে তাঁর জন্ম হিজরতের ২০ মাস পর দ্বিতীয় হিজরীতে হয়েছিল। যে পরিবেশে তিনি ভুমিষ্ট হয়েছিলেন তা ওপরে বর্ণনা করা হয়েছে।

কতিপয় রাওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, প্রিয় নবী (সাঃ) তাঁর জলিলুল কদর নানার কুনিয়ত বা পদবী অনুযায়ী তাঁর কুনিয়তও আবু বকরই দিয়েছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় কুনিয়ত ছিল আবু খুবায়েব। এ পদবীতেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

www.amarboi.org

ইমাম হাকিম (রঃ) "মুসতাদরাকে" লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর বয়স সাত-আট বছর হলে একদিন হযরত যোবায়ের (রাঃ) তাকে সাথে নিয়ে রাসূল (সাঃ)-এর নিকট হাজির হলেন এবং আরজ করলেন ঃ

"ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার এ বাচ্চার বাইয়াত নিন।"

হুযুর (সাঃ) শিশু আবদুল্লাহকে দেখে মুচকি হাসলেন। অতপর অত্যন্ত মুহাব্বাত ও স্নেহের সাথে বাইয়াত নিলেন।

চরিতকাররা বর্ণনা করেছেন বিশ্বনবী (সাঃ)-এর প্রতি হযরত যোবায়ের (রাঃ)-এর ছিল অগাধ ভক্তি শ্রদ্ধা। তিনি প্রায়ই নবী (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত থাকতেন এবং রিসালাতের ফয়েজে নিজেকে অবগাহিত করতেন। উম্মুল মু'মিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহ (রাঃ) ভাগিনাকে খুব ভালবাসতেন। এ জন্য তিনি কখনো মায়ের সাথে আবার কখনো একাকী তার খিদমতে হাজির হতেন। তার মুখস্থ শক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে যা করতে দেখতেন এবং বলতে শুনতেন তা স্মরণ রাখতেন। বস্তুতঃ অনেক হাদীস তিনি সরাসরি রাসূল (সাঃ)-এর নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন।

একবার বিশ্বনবী মুস্তফা (সাঃ) উলকী লাগালেন অথবা টিকা নিলেন। এ সময় হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। উলকী লাগানোর ফলে রক্ত বেরুলো। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তা হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-কে দিয়ে বললেন, কোথাও পুতে রেখে এসো। তিনি রাসূল (সাঃ) কে এত শ্রদ্ধা করতেন যে, এ পবিত্র রক্ত কোথাও পুতে রাখাকে পছন্দ করলেন না। হুযুর (সাঃ)-এর দৃষ্টির বাইরে গিয়ে তিনি তা পান করলেন। এরপর ফিরে এলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, রক্ত কোথায় নিক্ষেপ করে এলে? তিনি বললেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তা পান করেছি।" হুযুর (সাঃ) ফরমালেন, "যার শরীরে আমার খুন প্রবেশ করবে, তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করতে পারবে না। অবশ্য এক সময় তোমাদের হাতে মানুষ মারা যাবে।" (তারিখুল খুলাফা লিসসুয়ুতি)

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) শৈশব কাল থেকেই অত্যন্ত সাহসী এবং ভয়হীন ছিলেন। পরিখা বা খন্দকের যুদ্ধের সময়ে তাঁর বয়স ছিল প্রায় পাঁচ বছর। এত ছোট্ট বয়সেও তিনি এক উঁচু টিলায় চড়ে যুদ্ধের দৃশ্য দেখতেন এবং সামান্যতম ভীতও হতেন না।

একবার তিনি কতিপয় সমবয়স্ক বালকের সাথে খেলা করছিলেন। জনৈক ব্যক্তি তাদেরকে ভয় দেখানোর জন্য বিকট আওয়াজ দিল। অন্যান্য বালকরা এতে

www.amarboi.org

ভীত হয়ে দৌড় দিল। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন। অতপর সঙ্গীদেরকে পুনরায় ডেকে আনলেন এবং বললেন, আমি তোমাদের নেতা হচ্ছি,এসো সবাই মিলে সেই ব্যক্তির দুষ্টুমির মজা দেখাই। সুতরাং সবাই তাকে নেতা বানিয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। উপায়ান্তর না দেখে অবশেষে তাকে ভেগেইযেতেহলো।

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) ছিলেন ভীতিপ্রদ মানুষ। তাঁর দবদবাও ছিল প্রচুর। শিশুরা কোথাও খেলছে। আর সেখান দিয়ে যদি হযরত ওমর (রাঃ)-এর গমন হতো তাহলে আর রক্ষা নেই। সবাই ভোঁ দৌড় দিয়ে পালাতো। একদিন হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) সমবয়সীদের সাথে খেলছিলেন। ঠিক এমন সময় হযরত ওমর (রাঃ) সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। সব বালক খেলা ছেড়ে এদিক ওদিক লুকিয়ে পড়লো। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, 'বৎস! তুমি পালাওনি কেন?'

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) নির্ভয়ে বললেন, "আমি কেন পালাবো? আমি দুষ্টুমিও করিনি। আর রাস্তাও সংকীর্ণ নয় যে তা আপনার জন্য ছেড়ে দেব।"

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) তার সাহসিকতা এবং নির্ভীকতা দেখে খুব খুশী হলেন এবং মুচকী হেসে সামনের দিকে অগ্রসর হলেন।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) রাসূল (সাঃ) এবং সিদ্দিকে আকবর (রাঃ)-এর যুগে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছিলেন। এজন্য কোন যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর সময়ে তিনি যৌবন প্রাপ্ত হন। ইবনে হাজার (রঃ) "আল ইসাবাহ" গ্রন্থে লিখেছেন, এ সময় তিনি সর্বপ্রথম নিজের পিতার সাথে ইয়ারমুকের যুদ্ধে (১৫ হিজরী) অংশগ্রহণ করেন। তখন তার বয়স ছিল প্রায় ১৫ বছর। বস্তুতঃ তিনি তখনো অনভিজ্ঞ ছিলেন এবং যুদ্ধের হাঙ্গামায় তার ক্ষতি হওয়ার আশংকা ছিল। এ জন্য হযরত যোবায়ের (রাঃ) তাকে ঘোড়ায় চড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং একজন মুজাহিদকে তার হেফাজতের জন্য নিয়োগ করেছিলেন।

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) ১৯ হিজরীতে হযরত আমর (রাঃ) ইবনুল আছের সাহায্যার্থে একদল সৈন্য মিশর প্রেরণ করেন। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর পিতা হযরত যোবায়ের (রাঃ) এ বাহিনীর অন্যতম অফিসার ছিলেন। তিনি মদীনা থেকে রওয়ানা হওয়ার সময় হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-কেও সাথে নিয়ে চললেন। সুতরাং তিনি মিশরের কয়েকটি অভিযানে পিতার সাথে অংশ নিলেন। মিশর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি জ্ঞানার্জনে ব্যাপৃত হয়ে পড়লেন। এ অবস্থায় ২৪

www.amarboi.org

হিজরীতে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)–এর শাহাদাতের পর হযরত ওসমান গনি (রাঃ)–এর খিলাফতকাল শুরু হলো। আমীরুল মু'মিনিন হযরত ওসমান গনি (রাঃ) ২৬ হিজরীতে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন সায়াদ বিন আবি ছাবাহকে ত্রিপোলী (লিবিয়া) করতলগত করার জন্য আফ্রিকা প্রেরণ করলেন। সে যুগে লিবিয়া, আলজিরিয়া এবং মরক্কো প্রভৃতির সম্মিলিত নাম ছিল আফ্রিকা; আর ত্রিপোলী ছিল এ রাষ্ট্রের কেন্দ্র।

ত্রিপোলীর শাসক ছিল খৃষ্টান। তার নাম ছিল বাতরিক গ্রেগরী। সে একজন অভিজ্ঞ জেনারেলও ছিল। সে এক লাখ ২০ হাজার যুদ্ধবাজ সৈন্য মুসলমানদের মুকাবেলায় এনে দাঁড় করালো। তার একটি কন্যা ছিল। বিভিন্ন রাওয়ায়েতে তার নাম ফিলপানা বলা হয়েছে। রূপে গুণে, মেধা ও বাহাদুরীতে সে ছিল অদ্বিতীয়া। সে–ও পিতার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল এবং নিজের বাহিনীকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অনুপ্রাণিত করেছিল। কয়েকমাস ধরে উভয় বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ হলো। কিন্তু জয়–পরাজয় নির্ধারিত হলো না। কতিপয় ঐতিহাসিক গ্রেগরীর একটি ঘোষণার কথা উল্লেখ করেছেন। ঘোষণাটিতে বলা হয়েছিল, যে ব্যক্তি মুসলমানদের সেনাপতির মস্তক কর্তন করে আনতে সক্ষম হবে তাকে একলাখ দিনার নগদ পুরস্কার দেয়া হবে এবং নিজের কন্যাকেও তার সাথে বিয়ে দেবে। এ ঘোষণায় খৃষ্টান বাহিনীর হিম্মত কয়েক গুণ বেড়ে গেল এবং অনেক খৃষ্টান সৈন্য হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন সায়াদের সন্ধানে থাকতো। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন সায়াদ সতর্কতা স্বরূপ যুদ্ধের ময়দানে আগমন ছেড়ে দিয়েছিলেন। হযরত ওসমান (রাঃ) কয়েকমাস যাবৎ যুদ্ধের ফলাফলের কোন খবর পাচ্ছিলেন না। এ অবস্থায় তিনি হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ)–এর নেতৃত্বে একটি সাহায্যকারী দল ত্রিপোলী প্রেরণ করলেন। ইবনে যোবায়ের (রাঃ) জিহাদের ময়দানে আবির্ভূত হলেন। তাঁকে দেখে মুসলমানরা নারায়ে তকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করলেন। গ্রেগরী এর কারণ জিজ্ঞেস করলো। তাকে বলা হলো যে, মুসলমানদের সাহায্যার্থে তাজাদম সৈন্যের আগমন ঘটেছে। এ কথা শুনে সে হতবিহ্বল হয়ে পড়লো। কিন্তু যথারীতি নিজের বাহিনীর সাহস যুগিয়ে যেতে লাগলো। ইবনে যোবায়ের (রাঃ)–এর আগমনের পূর্বে যুদ্ধের কোন নির্দিষ্ট সময় ছিলো না। তিনি এসেই সকাল থেকে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত যুদ্ধের সময় নির্ধারণ করেছিলেন। সুতরাং এভাবেই যুদ্ধ চলতে লাগলো। ইবনে যোবায়ের (রাঃ)–এর পরামর্শে সেনাপতি আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন সায়াদও ঘোষণা করলেন যে, যে ব্যক্তি গ্রেগরীর মস্তক কেটে আনতে পারবে তাকে এক লাখ দিনার নগদ পুরস্কার এবং গ্রেগরীর কন্যার সাথে তার বিয়ে দেয়া হবে। এ ঘোষণা দানের পর তিনি নিজেও অত্যন্ত

www.amarboi.org

তৎপরতার সাথে যুদ্ধে অংশ নিলেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও যুদ্ধ কোন সিদ্ধান্তমূলক পর্যায়ে উপনীত হলো না। একদিন ইবনে যোবায়ের (রাঃ) নিজের সেনাপতিকে বললেন, এভাবে যুদ্ধে কোন সিদ্ধান্ত হবে না। কেননা আমরা কেন্দ্র থেকে অনেক দূরে রয়েছি। পক্ষান্তরে গ্রেগরী নিজের দেশের অভ্যন্তরে রয়েছে এবং সবধরনের সাহায্য পাচ্ছে। আমার পরামর্শ হলো, আগামীকাল আমরা নিজেদের বাহিনীর নির্বাচিত বাহাদুরদেরকে তাদের তাবুতে প্রেরণ করবো এবং অবশিষ্ট সৈন্য খৃষ্টানদের সাথে মুকাবেলা করবো। দ্বিপ্রহরের পর খৃষ্টান বাহিনী যখন ক্লান্ত হয়ে ফিরতে থাকবে তখন আমাদের তাজাদম বাহাদুর তাঁবু থেকে বের হয়ে তাদের ওপর হামলা করে বসবে। সেনাপতি এ পরামর্শ খুব পছন্দ করলেন এবং পরবর্তী দিন সে অনুযায়ী কাজ করা হলো। খৃষ্টান সৈন্যরা যখন ক্লান্ত হয়ে পিছে হটছিল তখন ইবনে যোবায়ের (রাঃ) নিজের বাহাদুর সৈন্যসহ তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। এ হামলা ছিল আকস্মিক এবং প্রচণ্ড। গ্রেগরী ও তার কন্যার শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও খৃষ্টানরা দৃঢ়ভাবে যুদ্ধ করতে পারেনি। প্রচণ্ড বিশৃংখলার মাঝে তারা পলায়ন করে। হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ)-এর হাতে গ্রেগরী নিহত হল এবং তার কন্যাকে মুসলমানরা গ্রেফতার করল। সেনাপতি নিজের ঘোষণা অনুযায়ী তাকে ইবনে যোবায়ের (রাঃ)-কে দিয়ে দিলেন। তিনি তাকে বিয়ে করেছিলেন না আযাদ করেছিলেন সর্বজন গ্রাহ্য ইতিহাস পুস্তকে এর কোন জবাব পাওয়া যায় না। ত্রিপোলী পদানত করার পর মুসলমানরা আফ্রিকার অন্যান্য সকল শহর ও অঞ্চল একের পর এক জয় করলেন। এ সব অভিযানে ইবনে যোবায়ের (রাঃ) বাহাদুরীর চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। 'দায়েরা মায়ারেফে ইসলামিয়া' গ্রন্থে আল ইগাফির উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ) বিজয়ের খবর নিয়ে মদিনা ফিরে এলেন এবং অত্যন্ত সুললিত ও শক্তিশালী ভাষায় অভিযানের বর্ণনা দিলেন। হযরত সাঈদ (রাঃ) ইবনুল আস ২৯-৩০ হিজরীতে তাবারিস্তানে (উত্তর ইরানে) সৈন্য প্রেরণ করলেন। এ সময় হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ)-ও এ বাহিনীতে যোগ দেন এবং বিভিন্ন অভিযানে বাহাদুরীর সাথে অংশ নেন। তাবারিস্তান বিজয়ের পর মদীনা ফিরে এলে হযরত ওসমান জুন্নুরাইন (রাঃ) তাঁকে মাসাহিফ লিখন (কুরআনে করীম নকল) মজলিসের সদস্য নিয়োগ করেন। এ মজলিসের অন্যান্য সদস্য ছিলেন। হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন সাবিত আনসারি, হযরত সাঈদ (রাঃ) বিন আস এবং হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) বিন হারিস বিন হিশাম। হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ)-এর বয়স তখন মাত্র ৩০ বছর ছিল। কিন্তু এ গুরুত্বপূর্ণ ও পবিত্র কাজে তার নির্বাচন এ কথারই প্রমাণ দেয় যে, সে সময় তিনি জ্ঞান ও মর্যাদার দিক থেকে অত্যন্ত উঁচু আসনে সমাসীন হয়েছিলেন।

www.amarboi.org

হযরত ওসমান জুন্নুরাইন (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে গোলযোগ শক্তিশালী হয়ে উঠলে, এবং ৩৫ হিজরীতে বিশৃংখলাকারীরা খিলাফত ভবন অবরোধ করলো। এ সময় অন্যান্যের মত হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-ও বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি নিজের সৈন্যসহ বিদ্রোহীদের মুকাবিলা করার জন্য হযরত ওসমান (রাঃ)-এর অনুমতি চেয়ে আবেদন জানালেন। কিন্তু শরীফ ব্যক্তিত্ব আমীরুল মু'মিনিন (রাঃ) আল্লার দোহাই দিয়ে তাদের কেউই যেন তার খাতিরে রক্ত প্রবাহিত না করে এ অনুরোধ জানালেন। ফলে হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ) চুপ মেরে গেলেন। এ সত্ত্বেও তিনি অন্যান্য কুরাইশ যুবকদের সাথে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে থাকলেন। অবরোধের চল্লিশতম দিনে বিদ্রোহীরা সদর দরজা ছেড়ে পিছনের দিক থেকে প্রাচীর টপকে ভিতরে প্রবেশ করলো এবং বয়সের ভারে দুর্বল আমীরুল মু'মিনিনকে কুরআন তিলাওয়াত অবস্থায় নৃশংসভাবে শহীদ করে বসলো। হযরত উসমান (রাঃ)-এর শাহাদাতের পর হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু খলিফা নির্বাচিত হলেন। এ সময়ে উম্মুল মু'মিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহ (রাঃ) কিসাসে উসমান (রাঃ) অথবা সংশোধনের ঝাণ্ডা তুলে ধরলেন। এ প্রসঙ্গে ৩৬ হিজরীতে দুঃখজনক উষ্ট্রের যুদ্ধ সংঘটিত হলো। হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ) উম্মুল মু'মিনিন (রাঃ)-এর পদাতিক বাহিনীর অফিসার ছিলেন। তিনি এত নির্ভিক চিত্তে যুদ্ধ করেছিলেন যে, তার সারা শরীর আঘাতে আঘাতে ঝাঝরা হয়ে গিয়েছিল। যুদ্ধ শেষে গণনা করে দেখা গেল যে,তার শরীরে বর্শা এবং তরবারীর চল্লিশেরও বেশী আঘাত রয়েছে। যুদ্ধ শুরুর পূর্বেই হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) পিতৃস্নেহ থেকেও বঞ্চিত হন। পিতা হযরত যোবায়ের (রাঃ) নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে যাচ্ছিলেন। ঠিক এমনি সময় আমর বিন জারমুজ নামক এক বদ বাতিন ব্যক্তি তাঁকে নামাযে সিজদাহরত অবস্থায় শহীদ করে ফেলে। যুদ্ধে হযরত আলী (রাঃ) জয়ী হলেন। এ সময় হযরত আবদুল্লাহ একাকিত্ব অবলম্বন করলেন এবং সিফফিনের গৃহযুদ্ধে কার্যতঃ অংশই নেননি। এ সত্ত্বেও দাওমাতুল জানদালের সালিশীতে উপস্থিত ছিলেন।

৪০ হিজরীর রামাদান মাসে হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু শাহাদাত বরণ করলেন। সাইয়েদেনা হযরত হাসান (রাঃ) খিলাফতের দায়িত্ব পেলেন। কিন্তু উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে কয়েক মাস পর তিনি আমীর মাবীয়ার পক্ষে খিলাফত ছেড়ে দিলেন। এভাবে ৪১ হিজরীতে কারোর অংশগ্রহণ ছাড়াই আমীর মাবিয়া (রাঃ) ইসলামী জাহানের শাসক বনে গেলেন। হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ) তাঁর শাসনামলের বেশীরভাগ সময়ই নির্জনত্বে কাটান এবং রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেননি। কোন বিসম্বাদে না জড়িয়ে তিনি আমীর মাবিয়ার (রাঃ) হাতে বাইয়াত করেন। বুজর্গ পিতার রেখে যাওয়া সম্পদের বিরাট অংশ তিনি পেয়েছিলেন। তাছাড়া নিজেও ব্যবসা করতেন। এ জন্য জীবিকার কোন চিন্তা

www.amarboi.org

ছিল না। আমীর মাবিয়া (রাঃ) ৪৯–৫০ হিজরীতে অথবা ৫১–৫২ হিজরীতে কাসতানতুনিয়া জয়ের জন্য একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। জিহাদ ফিসাবিলিল্লাহর খাতিরে তিনি এ বাহিনীতে যোগ দেন। কতিপয় রাওয়ায়েত মুতাবেক এ বাহিনী সম্পর্কেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছিলেন যে, "কাইসারের শহরে আমার উম্মাতের প্রথম যে বাহিনী জিহাদ করবে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।"

এ অভিযান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি পূর্বেকার মতই নির্জনত্ব গ্রহণ করেন। আর এ একাকীত্বের কাল চলে আমীর মাবিয়া (রাঃ)–এর শাসনকালের শেষ পর্যায়ে ইয়াযিদকে উত্তরাধিকার মনোয়ন পর্যন্ত। আমীর মাবিয়া (রাঃ) জনগণের প্রতি এ মনোনয়ন মেনে নেয়ার আহবান জানান। হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ), হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) ইবনে আবিবকর (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) এবং হযরত হোসাইন (রাঃ) বিন আলী (রাঃ) ইয়াযিদকে মনোনয়নের প্রচণ্ড বিরোধিতা করেন। আমীর মাবিয়া (রাঃ) তাঁদেরকে এ প্রশ্নে সম্মত করার জন্যে স্বয়ং দামেস্ক থেকে মক্কা মুয়াজ্জামা আগমন করেন। এ সব বুজর্গ ব্যক্তি মদীনা থেকে এসে এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছিলেন। অন্য এক রাওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, মদীনাতেই এ সব ব্যক্তির সাথে আমীর মাবিয়া (রাঃ)–এর আলোচনা হয়েছিল। আমীর মাবিয়া (রাঃ) এ চারজনকে ডেকে পাঠালেন। আলোচনার জন্য সবাই হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ)–কে প্রতিনিধি বানালেন। হযরত মাবিয়া (রাঃ) এবং ইবনে যুবায়ের (রাঃ)–এর মধ্যে এ আলোচনা হলোঃ

আমীর মাবিয়া (রাঃ) ঃ তোমরা সবাই আমার প্রিয়। তোমরা ভালোভাবেই জানো যে, আমি তোমাদের সাথে সব সময় ভালো ব্যবহার করেছি। ইয়াযিদ তোমাদের ভাই এবং চাচার পুত্র। মুসলমানদেরকে বিশৃংখলা ও খুনাখুনির হাত থেকে রক্ষার জন্য আমি চাই যে, তোমরা তাকে খিলাফতের জন্য মনোনয়ন দেবে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় সকল ক্ষমতা নিজেদের হাতে রাখবে। সে তোমাদের সাথে কোন বাদানুবাদ করবে না।

আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ)ঃ হে আমীর! আমরা তিনটি বিকল্প আপনার নিকট পেশ করছি। এর মধ্যে যে কোন একটি আপনি গ্রহণ করুন।

প্রথম বিকল্প হলোঃ রাসূল (সাঃ)–এর মত কাউকেই মনোনীত করবেন না। আপনার পর উম্মাত নিজেই খলিফা নির্বাচন করে নেবে। দ্বিতীয় পথ হলোঃ আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)–এর পথ। নিজের উত্তরাধিকার সেই ব্যক্তিকে মনোনয়ন করুন যিনি আপনার আত্মীয় এবং আপনার কবিলাভুক্ত নন। তৃতীয় হলো হযরত ওমর (রাঃ)–এর গৃহীত পথ। কতিপয় ব্যক্তিকে মনোনয়ন দিন। যাঁরা আপনার পরে নিজেদের মধ্য থেকে কাউকে খলিফা নির্বাচন করে নেবেন।

www.amarboi.org

আমীর মাবিয়া (রাঃ)ঃ রাসূল (সাঃ)–এর পর এমন মানুষ ছিলেন যাঁর ওপর উম্মাত ঐকমত্য পোষণ করতে পারতো। এভাবে তারা আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ)–এর ব্যাপারে একমত হয়েছিলেন। কিন্তু এখন সে অবস্থা কোথায়? এখনতো মতভেদ আরো বৃদ্ধি পাওয়ার আশংকো রয়েছে। হযরত আবুবকর (রাঃ)–এর দৃষ্টি হযরত ওমর (রাঃ)–এর ওপর পড়তে পারতো। কিন্তু আমার পর (বনু উমাইয়ার বাইরে) এমন কে আছে যাকে আমি পূর্ণ আস্থার সাথে মনোনয়ন দিতে পারি। বর্তমান অবস্থায় তৃতীয় বিকল্পের ওপর কাজ করা সম্ভব নয়। এছাড়া কি আর কোন পথ নেই?

আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ) ঃ না।

আলোচনার পর আমির মাবিয়া (রাঃ) এ সব বুজুর্গকে কি নিজেদের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন, না শক্তি প্রয়োগ করে তাদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারের বাইয়াত আদায় করেছিলেন? যা হোক, আমীর মাবিয়ার অন্তরে হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ) সম্পর্কে খটকা সৃষ্টি হয়েছিল। সুতরাং ৬০ হিজরীর রজব মাসে মৃত্যুর পূর্বে তিনি ইয়াযিদের জন্য যে ওসিয়তনামা রেখে যান তাতে অন্যান্য নসিহতের সাথে একটি নসিহত এও ছিলঃ "খিলাফত প্রশ্নে কূরাইশের তিনজনের ব্যাপারে তোমার বিপদের আশংকা থাকবে। হোসাইন (রাঃ) বিন আলী (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ)। ইরাকবাসী একদিন না একদিন হোসাইন (রাঃ)–কে অবশ্যই তোমার বিরুদ্ধে এনে দাঁড় করাবে। তিনি পরাভূত হলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে কাজ করবে। তিনি আমাদের আত্মীয়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)–এর নাতি। আমাদের ওপর তাদের হক আছে। আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) খিলাফতের জঞ্জালে পড়া পসন্দ করবেন না এবং ইবাদাতেই মশগুল থাকবেন। অন্যান্যরা যখন তোমার বাইয়াত করবেন তখন তিনিও এ ব্যাপারে তাদের অনুসরণ করবেন। যে ব্যক্তিটির ব্যাপারে তোমার প্রকৃত ভয় আছে সে হলো আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ)। এ ব্যক্তি খেঁকশিয়ালের চাল চেলে বাঘের মত তোমার ওপর হামলা করে বসবে। তাকে কাবু করতে পারলে কখনো জীবিত ছেড়ে দেবে না। হাঁ সে যদি সন্ধি করে তাহলে জাতিকে রক্তারক্তির হাত থেকে রক্ষার জন্য তুমিও সন্ধি করা থেকে বিরত থেক না।"

আমীর মাবিয়া (রাঃ)–এর মৃত্যুর পর ইয়াযিদ শাসন পরিচালনার সিংহাসনে আরোহণ করলো। সিরিয়াবাসী তৎক্ষণাৎ তার হাতে বাইয়াত হলো। আমীর মাবিয়া (রাঃ) জীবদ্দশাতেই হেজাজের অধিকাংশ লোকের বাইয়াত নিয়ে রেখেছিলেন। যাঁরা বাইয়াত হননি তাদের মধ্যে সাইয়েদেনা হযরত হোসাইন (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ) এমন দু' ব্যক্তিত্ব ছিলেন যাঁদেরকে ইয়াযিদের কোনক্রমেই উপেক্ষা করার ছিল না। সে মদীনার গবর্ণর ওয়ালিদ বিন উতবাহকে উভয় বুজর্গের বাইয়াত



www.amarboi.org

দেয়ার তাকিদ দিয়ে নির্দেশ পাঠালেন। ওয়ালিদ উভয়কেই ডেকে পাঠালেন। হযরত হোসাইন (রাঃ) তার ডাকে এলেন। কিন্তু বাইয়াত গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালেন। ইবনে যোবায়ের (রাঃ) একদিনের সময় চেয়ে নিলেন এবং রাতের মধ্যেই পরিবার পরিজনসহ মদীনা থেকে বের হয়ে মক্কা মুয়াজ্জামা চলে আসেন। মক্কাবাসীরা তাঁকে সাদরে গ্রহণ করলো। কেননা তাঁর আল্লাহ ভীতি ও অন্যান্য গুণাবলীর তারা প্রশংসোকারী ছিল। সে সময়ই হযরত হোসাইন (রাঃ)–ও পরিবার পরিজনসহ কূফার উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে মক্কা তাশরীফ রাখলেন। হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ) সাইয়েদেনা হোসাইন (রাঃ)–এর কূফাগমনের কথা জানতে পেরে তাঁর নিকট এলেন এবং বললেনঃ "আপনি এখানে হেরেম শরীফে অবস্থান করুন। এটাই উত্তম এখান থেকে আপনি শহরসমূহে দূত প্রেরণ করুন এবং ইরাকী সমর্থকদেরকে এখানেই আপনার নিকট পৌঁছার কথা বলুন। অতঃপর আপনার হাত যখন শক্তিশালী হবে তখন ইয়াযিদের গবর্ণরকে এখান থেকে বের করে দেবেন। আমিও আপনাকে সমর্থন করবো। এ সমর্থন দান আমার জন্য ফরয। আমি আপনাকে এ পরামর্শ দেব যে, খিলাফতের দাবী হেরেম শরীফ থেকেই করুন। কেননা সমগ্র দুনিয়ার মানুষ এখানে সমবেত হয়। আল্লাহ চাইলে আপনি আপনার উদ্দেশ্যে অসফল হবেন না।

হযরত হোসাইন (রাঃ) কূফা গমনে দৃঢ় সংকল্প ছিলেন। এ জন্যে তিনি ইবনে যোবায়ের (রাঃ) –এর পরামর্শ গ্রহণ করলেন না। অন্য এক রাওয়ায়েত মতে তিনি হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ)–কে এ মর্মে জবাব দিয়েছিলেনঃ "আমি আমার পিতা থেকে এ হাদীস শুনেছি যে, হেরেম শরীফের একটা ভেড়া আছে। যার কারণে তার হুরমত বা মর্যাদা ভূলুন্ঠিত হবে। আমি এখানে অবস্থান করে সেই ভেড়া হতে চাই না।"

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) এবং অন্যান্য শুভাকাংখীরাও সাইয়েদেনা হোসাইন (রাঃ)–কে কূফা গমন না করার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু তিনি কারোর পরামর্শ মানলেন না এবং পরিবার–পরিজন সমেত কূফা রওয়ানা হয়ে গেলেন। ৬১ হিজরীর ১০ই মুহাররম কারবালার লোমহর্ষক ঘটনা সংঘটিত হলো। সাইয়েদেনা হোসাইন (রাঃ) নিজের বেশ কিছু প্রিয় সাথীসহ কারবালা ময়দানে ইয়াযিদের সৈন্যের হাতে শহীদ হয়ে গেলেন। এ হৃদয় বিদারক ঘটনার খবর হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ) পেলেন এবং অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। তিনি সকল মক্কাবাসীকে হেরেম শরীফে ডাকলেন এবং তাদের সামনে এক হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতা করলেন। তিনি বললেনঃ "হে মানুষেরা। ইরাকবাসীর চেয়ে জঘন্যতম সৃষ্টি এ বিশ্ব চরাচরে আর নেই। আর ইরাকীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী জঘন্য হলো কূফার মানুষ। হযরত হোসাইন (রাঃ)–এর হাতে বাইয়াত হওয়ার জন্যে বারংবার তারা তাকে চিঠি দিয়েছিল। কিন্তু হযরত হোসাইন (রাঃ) যখন তাদের সীমান্তে পৌঁছলেন তখন তারা তাঁকে বান্ধবহীন এবং সাহায্যকারীহীন অবস্থায় নিক্ষেপ করলো।

www.amarboi.org

বরং তাদের অধিকাংশই বনু উমাইয়াকে সমর্থন জানালো। ইয়াযিদ বাহিনী মজলুম হোসাইন (রাঃ)–কে ঘিরে নিল এবং ইয়াযিদের বাইয়াত করার জন্যে তাঁর নিকট দাবী জানালোঃ সাথে সাথে তাঁকে ইবনে যিয়াদের নিকট আত্মসমর্পন করতে বললো। অন্যথা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে বললো। আল্লার কসম! তিনি সাজ–সরঞ্জামহীন ছিলেন এ কথা হোসাইন (রাঃ) অবহিত ছিলেন। তবে তিনি জিল্লতীর জীবন অপসন্দ করতেন এবং মর্যাদার মৃত্যু গ্রহণ করলেন। আল্লাহ হোসাইন (রাঃ)–এর হত্যাকারীদের অপমানিত করুন। কিন্তু আল্লার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই করার নেই। আমি জিজ্ঞেস করি, হোসাইন (রাঃ)–এর শাহাদাতের পর আমরা কি সেই সব জঘন্য লোকের কথা এবং কাজের ওপর ভরসা করতে পারি? উপস্থিত জনতা একবাক্যে বললো–অবশ্যই নয়।"

হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ) বক্তৃতা অব্যাহত রেখে বললেনঃ "হে মানুষেরা! আল্লার কসম, সেই যালেমরা উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিকে হত্যা করেছে। তিনি দিনে রোযা রাখতেন এবং রাত জেগে ইবাদাত করতেন। তিনি ছিলেন কুরআনের অনুরাগী এবং পবিত্র। প্রত্যেক দিক থেকেই তিনি তার চেয়ে বেশী খেলাফতের হকদার ছিলেন। আল্লার কসম! হোসাইন (রাঃ) রোযার মুকাবিলায় মদপান, আল্লার ভয়ে ক্রন্দনের পরিবর্তে নৃত্য গীত, কুরআনের হেদায়েতের মুকাবিলায় গুমরাহী এবং হকের জিকরের পরিবর্তে শিকারী কুকুরের উল্লেখ করা অত্যন্ত অপসন্দ করতেন। আল্লাহ এ সব ধোঁকাবাজ হত্যাকারীকে কঠিন শাস্তি দেবেন।"

ইবনে যোবায়ের (রাঃ) বক্তৃতা শেষ করে কেঁদে ফেললেন এবং উপস্থিত জনতা ডুকরে কেঁদে উঠলো। অতপর সবাই ইবনে যোবায়ের (রাঃ)–এর চারপাশে একত্রিত হয়ে বললো, "আল্লার কসম! হোসাইন (রাঃ)–এর পর খিলাফতের হকদার আপনার চেয়ে বেশী আর কেউ নেই। হোসাইন (রাঃ)–এর হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে আমরা ঘৃণা প্রকাশ করছি। আপনি হাত বাড়িয়ে দিন। আমরা আপনার হাতে খিলাফতের বাইয়াত করছি।"

মানুষের পীড়াপীড়িতে হযরত ইবনে, যোবায়ের (রাঃ) নিজের হাত অগ্রসর করে দিলেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং মুহাম্মদ বিন হানফিয়াহ (রঃ) ছাড়া মক্কাবাসী তাঁর হাতে বাইয়াত করলো।

ইয়াযিদ এ কথা শুনে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলো। সে ইবনে যোবায়ের (রাঃ)–কে গ্রেফতার করে দামেস্ক প্রেরণের জন্য মদীনার গবর্ণরকে নির্দেশ দিল। এ নির্দেশ প্রাপ্তির পর মদীনার গবর্ণর ইবনে যোবায়ের (রাঃ)–কে গ্রেফতার করার জন্য একটি ছোট বাহিনী প্রেরণ করলো। এ বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিল হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)–এর এক ভাই আমর বিন যোবায়ের (রাঃ)। অন্য এক রাওয়ায়েত অনুসারে আমর বিন যোবায়ের (রাঃ) দূত হিসেবে আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ)–এর নিকট গেলেন এবং বললেন যে

www.amarboi.org

আমীরুল মু'মিনিন ইয়াযিদ বিন মাবিয়া (রাঃ) অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে আপনাকে দামেস্ক ডেকে পাঠিয়েছেন। এ দূতগীরির উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। ইবনে যোবায়ের (রাঃ) যদি তার সাথে যেতে সম্মত হয় তাহলে তাঁকে গ্রেফতার করা হবে। যা হোক, হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) ইয়াযিদ বাহিনীকে পরাজিত করলেন অথবা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অপরাধে আমর বিন যোবায়ের (রাঃ)–কে গ্রেফতার করলেন এবং কিছুদিন পর তাকে হত্যা করালেন। এরপর ইবনে যোবায়ের (রাঃ) প্রকাশ্যভাবে ইয়াযিদকে বরখাস্তের ঘোষণা দিলেন। মদীনাবাসী তাঁর অনুসরণ করলো এবং তারা ইয়াযিদের খিলাফত অস্বীকার করে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন হানজালাহ (রাঃ) গাসিলুল মালায়েকাকে নিজেদের স্থানীয় আমীর নির্বাচন করলো। কথিত আছে যে, বাইয়াত বাতিলের পূর্বে মদীনাবাসীদের একটি প্রতিনিধিদল দামেস্ক গিয়েছিল। সেখানে তাদেরকে সাদর অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল। কিন্তু সে প্রতিনিধি দল ফিরে এসে মদীনাবাসীদের সামনে ইয়াযিদের তৎপরতার এমন এক অপচিত্র পেশ করলো যে, তাতে তারা ইয়াযিদ থেকে দূরে সরে গেল। ইয়াযিদ এ পরিস্থিতি আয়ত্তে আনার জন্য মুসলিম বিন উকবাহ মাররীর নেতৃত্বে একটি সিরীয় বাহিনী হেজায প্রেরণ করলো। এ বাহিনী মদীনা পৌঁছলে মদীনাবাসী সর্ব শক্তি দিয়ে তার মুকাবিলা করলো। কিন্তু মুসলিম বিন উকবার সামরিক কৌশলের সামনে তারা পরাজিত হলো। হযরত আবদুল্লাহ বিন হানজালাহ (রাঃ) হাজার হাজার মদীনাবাসীসহ সিংহ বিক্রমে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। শহীদদের মধ্যে বিশজন সাহাবী (রাঃ)–ও ছিলেন। সিরীয় বাহিনী তিন দিন ধরে মদীনা মুনাওয়ারাতে হত্যা ও লুন্ঠনের রাজত্ব চালালো। এরপর তারা হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ)–কে অনুগত বানানোর জন্য মক্কা মুয়াজ্জামার দিকে রওয়ানা হলো। পথিমধ্যে মুসলিম বিন উকবাহ মারা গেল এবং তার স্থানে হাসিন বিন নুমায়ের সিরীয় বাহিনীর সেনাপতি হলো। সে মক্কার নিকটে পৌঁছলে ইবনে যোবায়ের (রাঃ) শহরের বাইরে বেরিয়ে সিরীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করলেন। কিন্তু সিরীয়দের প্রচণ্ড চাপের কারণে অবরুদ্ধ হয়ে বাধা দানের সিদ্ধান্ত নিলেন। হাসিন বিন নুমায়ের বুকাবিস পাহাড়ের ওপর কামান স্থাপন করে কা'বা ঘরের ওপর গোলা নিক্ষেপ শুরু করলো। এতে কা'বা ভবনের প্রচুর ক্ষতি হলো। এ সত্ত্বেও হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ) অত্যন্ত বীরত্বের সাথে মুকাবিলা করতে লাগলেন। তিনি মসজিদে হারামে তাবু টাঙিয়ে রেখেছিলেন। গোলাগুলীর কোন পরওয়া ছিল না। তাঁবু থেকে বের হয়ে অত্যন্ত নির্ভাবনায় হেরেম শরীফে নামাযে মশগুল থাকতেন। স্বয়ং হাসিন বিন নুমাইরের বর্ণনা হলোঃ আমার মক্কা অবরোধকালে ইবনে যোবায়ের (রাঃ) নিজের তাঁবু থেকে এমনভাবে বের হতেন যেমন জঙ্গল থেকে বাঘ বের হয়।

অবরোধকালে খারেজীদের একটি দল নাফে বিন আরযাক এবং নাজদাহ বিন আমের (রাঃ)–এর নেতৃত্বে মক্কায় এলো তারা ইয়াজিদ বিরোধী হলেও ইবনে যোবায়ের

www.amarboi.org

(রাঃ)–এর সমর্থক ছিল না। এসত্বেও তারা তাঁকে ইয়াযিদ থেকে উত্তম মনে করতো। তাদের ধারণা ছিল যে, ইবনে যোবায়ের (রাঃ) যদি তাদের সমর্থন করেন তাহলে তারা ইয়াযিদ বাহিনীর বিরুদ্ধে এ নাযুক সময়ে তাঁর সাহায্য করবে।

নাফে এবং নাজদাহ্ ইবনে যোবায়ের (রাঃ)–এর সাথে সাক্ষাত করে এ প্রস্তাব পেশ করলেন যে, যদি তিনি হযরত ওসমান (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত তালহা (রাঃ) এবং নিজের পিতা হযরত যোবায়ের (রাঃ)–এর প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ এবং তিরস্কার করেন তাহলে তাদের দল তাঁদের সমর্থনে সিরীয় বাহিনীর সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রয়েছে। হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ) এ সব বুজর্গকে তিরস্কার করতে পরিষ্কারভাবে অস্বীকার করলেন এবং তাদের যুক্তির দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিয়ে সর্বশেষে বললেনঃ "নিঃসন্দেহে এ সময় তোমাদের সাহায্য আমার জন্য অত্যন্ত কদরের বস্তু ছিল। কিন্তু আমার শাসক হবার ইচ্ছে নেই। জয়–পরাজয়ের চিন্তাও নেই। আমি তো সত্য এবং ন্যায়ের জন্য লড়াই করছি। যদি আমার সাথে এক হয়ে সিরীয়দের মুকাবিলা করো, তাহলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে প্রতিদান দেবেন। আর তোমরা যদি আমাকে সাহায্য না করো, আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। তোমরা যদি আমার শত্রুর সাথে গিয়ে মিলিত হও তাহলেও আমি কোন পরওয়া করি না।" তাঁর জবাব শুনে খারেজীরা নিরাশ হয়ে ফিরে গেল।

মক্কার অবরোধ অব্যাহত ছিল, ঠিক এমনি সময় ৬৪ হিজরীর ১৪ রবিউল আউয়াল ইয়াযিদ মারা গেল। তার মৃত্যুর খবর মক্কা পৌঁছলে হাছিন বিন নুমায়ের অবরোধ প্রত্যাহার করে নিল। এক রাওয়ায়েত অনুসারে অবরোধ অবসানের পর হাছিন বিন নুমায়েরের আবেদনে হযরত ইবনে যুবায়ের (রাঃ) হেরেম শরীফের দরজা খুলে দিলেন এবং সিরীয়রা নির্দ্বিধায় তাওয়াফ করতে লাগলো। এ সময় হাছিন ও ইবনে যোবায়ের (রাঃ)–এর সাক্ষাত ঘটলো। অন্য এক রাওয়ায়েতে আছে যে, রওয়ানা হওয়ার পূর্বে হাছিন ইবনে যোবায়ের (রাঃ)–কে পয়গাম পাঠিয়ে ছিলেন। তাতে সে বাতহা নামক স্থানে রাতে নির্জনে তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে চেয়েছিলো এবং উভয় পক্ষ থেকে ১০ জন করে লোক সেখানে নিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছিল। যা হোক, উভয়ের সাক্ষাত ঘটলো। হাছিন ইবনে যোবায়ের (রাঃ)–কে বললো, ইয়াযিদ মারা গেছে। আমার দৃষ্টিতে বর্তমানে আপনার চেয়ে খিলাফতের হকদার আর কেউ নেই। আমি এবং আমার সঙ্গীরা আপনার হাতে বাইয়াতের জন্য সিরিয়াবাসীদের উদ্বুদ্ধ করবো। হিজাজবাসী প্রথম থেকেই আপনার সাথে রয়েছে। সিরীয়বাসীর বাইয়াতের পর সমগ্র ইসলামী বিশ্ব আপনাকে খলিফা হিসেবে মেনে নেবে। এতদিন আমাদের মধ্যে যে রক্তাক্ত লড়াই হয়েছে তা আপনি ক্ষমা করে দিন।

www.amarboi.org

ইবনে যোবায়ের (রাঃ) হাছিন বিন নুমায়েরের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে গুরুগম্ভীর অথচ দরাজ কণ্ঠে বললেন ঃ "মদীনা এবং মক্কাবাসীর রক্তাক্ত ঘটনা ক্ষমা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আল্লাহর কসম! যতক্ষণ এক এক হিজাজবাসীর কিসাসে বা বদলীর দশ দশ সিরীয় মস্তক উড়িয়ে না দেয়াবো ততক্ষণ তোমার সাথে কোন আলোচনা বা সমঝোতা হতে পারে না।

হাছিন নিরাশ হয়ে বললো যে, "আমার ধারণা ছিল আপনি আরবের অন্যতম চিন্তাশীল ব্যক্তিত্ব এখন বুঝতে পারলাম আমার সে ধারণা ভুল ছিল। আমি আপনাকে খিলাফতের মসনদের দিকে আহবান জানাচ্ছি। আর আপনি আমাকে যুদ্ধের হুমকি দিচ্ছেন। আমি আস্তে আস্তে কথা বলছি। আর আপনি চড়া গলায় কথা বলছেন।"

এ কথা বলে হাছিন নিজের বাহিনীতে ফিরে গেল এবং পরদিন সিরিয়া রওয়ানা হয়ে গেল।

অবরোধকালে কা'বা ভবনের প্রচুর ক্ষতি সাধিত হয়েছিল। হাছিনের ফিরে যাওয়ার পর হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ) কা'বাকে নতুন করে নির্মাণের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। এ জন্যে প্রথমে পুরাতন ভবন সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে ফেলা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কেউই এ কাজে সাহস পেল না। অবশেষে ইবনে যোবায়ের (রাঃ) স্বয়ং আল্লার নাম নিয়ে প্রাচীরের ওপর চড়ে বসলেন এবং একটি পাথর খসিয়ে তা ভেঙ্গে ফেললেন। তাঁর এ কাজ দেখে অন্যান্যরাও তাতে শরীক হলো। সমগ্র প্রাচীর ভাঙ্গা শেষ হলে ভিত্তি খননের কাজ শুরু হলো। ইবনে যোবায়ের (রাঃ) হাতিমের পরিত্যক্ত অংশও কা'বার সীমানাভুক্ত করলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যেভাবে নতুন ভবন তৈরী করতে চেয়েছিলেন তেমনি তৈরী করলেন। তিনি এ কাজে অন্তর খুলে অর্থ খরচ করলেন এবং অত্যন্ত হিম্মত ও বদান্যতা দেখালেন। যে দিন তিনি এ কাজ সমাপ্ত করলেন সে দিন নতুন ভবনের আভ্যন্তরীণ ও বহির্ভাগের ওপরে এবং নীচে মিশক–আম্বর লাগালেন। তার ওপর রেশমের গিলাফ চড়ালেন। কৃতজ্ঞতায় অনেক গোলাম আযাদ করলেন। অনেক উট এবং বকরী জবেহ করলেন। অতঃপর তিনি কুরাইশের এক বড় দলের সাথে নগ্ন পায়ে ঘর থেকে বের হয়ে তানয়ীম নামক স্থানে পৌঁছে ওমরাহর ইহরাম বাঁধলেন। আল্লাহ পাক তাঁকে রাসূল (সাঃ)–এর ইচ্ছা অনুযায়ী ইবরাহীমি বুনিয়াদের ওপর কা'বা নির্মাণের তাওফিক দিলেন। এক রাওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, তিনি সর্বপ্রথম হাজরে আসওয়াদের ওপর রূপা বিছালেন। গোলাবারুদ বর্ষণের কারণে হাজরে আসওয়াদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এজন্যেই ইবনে যোবায়ের (রাঃ) তা রূপা দিয়ে বাঁধলেন।

ওদিকে সিরিয়ায় ইয়াযিদের মৃত্যুর পর তার পুত্র মাবিয়া ক্ষমতাসীন হলো। সে একজন দ্বীনদার এবং নরম প্রকৃতির লোক ছিল। শাসন কাজের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়া

www.amarboi.org

সে পছন্দ করতো না। এ জন্যে কিছু দিন পরই সে খিলাফতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিলো। এখন সমগ্র হিজাজ, ইরাক, মিসর এবং দক্ষিণ আরব ইবনে যোবায়ের (রাঃ)-এর খিলাফত মেনে নিল। এমনকি সিরিয়ার বনু উমাইয়ার বিরোধীরাও তাঁকে খলিফা হিসেবে মেনে নিলেন। সে সময় ইবনে যোবায়ের (রাঃ) এক রাজনৈতিক ভুল করে বসলেন। তিনি মদীনা মুনাওয়ারাহ থেকে বনু উমাইয়ার অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তিদেরকেও জোরপূর্বক বের করে দিলেন। বহিষ্কৃতদের মধ্যে মারওয়ান ইবিনুল হাকাম এবং তার পুত্র আবদুল মালেকও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা দামেস্ক পৌঁছলো। সে সময় সেখানে বিশৃংখলা বিরাজ করছিলো। অবশেষে বনু উমাইয়ার সকল প্রভাবশালী ব্যক্তিরা জাবিয়াহ নামক স্থানে একত্রিত হয়ে মারওয়ানকে খলিফা নির্বাচিত করলো। মারওয়ান ১৩ হাজার উমাইয়া যোদ্ধাসহ "মরজে রাহেতের" দিকে অগ্রসর হলো। সেখানে জাহাক বিন কায়েস (রাঃ)-এর নেতৃত্বে ইবনে যোবায়ের (রাঃ)-এর সমর্থক বাহিনী তাবুতে অবস্থান করছিল। উভয় পক্ষের মধ্যে রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হলো। এ যুদ্ধে উমাইয়া বাহিনীই অগ্রগামী ছিল। এভাবে সমগ্র সিরিয়ার ওপর বনু উমাইয়ার কর্তৃত্ব বহাল হলো। মারওয়ান সাঈদ বিন আছের নেতৃত্বে একটি বাহিনী মিশর প্রেরণ করলো। ইবনে যোবায়ের (রাঃ)-এর নিয়োগকৃত মিশরের গবর্ণর আবদুর রহমান বিন আহমদ আক্রমণে তিষ্ঠাতে না পেরে মিশর আমর বিন সাঈদের হাওয়ালা করে দিলো। এখন অবস্থা এ দাঁড়ালো যে, হিজাজ এবং ইরাক হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ)-এর কবজায় রলো। অন্য দিকে সিরিয়া ও মিশরের ওপর মারওয়ানের রাজত্ব। মারওয়ান বেশী দিনের জন্য শাসন কাজ চালাতে পারলো না এবং সে ৬৫ হিজরীর রামাদান মাসে মৃত্যুমুখে পতিত হলো। তার পর তার পুত্র আবদুল মালিক ক্ষমতার মসনদে বসলো।

সে সময় জাসার অভিযানের (১৩ হিজরী) শহীদ সেনাপতি আবু ওবায়েদ ছাকাফীর (রঃ) পুত্র মুখতার ছাকাফী ইরাক দখলের জন্য তৎপরতা শুরু করে। সে হোসাইনের কিসাস বা বদলা গ্রহণের ঝাণ্ডা উড্ডীন করলো এবং কুফাকে আন্দোলনের কেন্দ্র বানালো। ইরাকে অবস্থানরত বনু উমাইয়া বিরোধীরা তার সাথে একত্রিত হলো। তারা ইবনে যোবায়ের (রাঃ)-এর পক্ষ থেকে কুফার গবর্ণর আবদুল্লাহ বিন মতিকে জোরপূর্বক বের করে দিল। এভাবে কুফা এবং সে সাথে সমগ্র ইরাকের (বসরা ছাড়া) ওপর মুখতার বিন আবি ছাকাফীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হলো। এক্ষণে সে প্রতিশোধের তরবারী খাপ থেকে বের করলো এবং যারা কারবালার ঘটনায় অংশ নিয়েছিল অথবা বনু উমাইয়াকে সহযোগিতা করেছিল তাদেরকে বেছে বেছে হত্যা করলো। নিহতদের মধ্যে ছিল শামার জিল জওশান, হারমাল বিন কামিল, খাওলী বিন ইয়াযিদ, ওমর বিন সায়াদ, যিয়াদ বিন মালিক, আবদুল্লাহ বিন কায়েস এবং ওসমান বিন খালিদের মত ২০ জন। এরপর সে ইবরাহীম বিন মালিক আশতারের নেতৃত্বে একটি বাহিনী ওবায়েদ উল্লাহ বিন যিয়াদকে

উৎখাতের জন্য মোছাব প্রেরণ করলো। আরব এবং মোছাবের মধ্যবর্তী স্থানে খাজির নদীর তীরে তার এবং ইবনে যিয়াদ বাহিনীর সংঘর্ষ হলো। ইবরাহীম বিন মালিক আশতার ইবনে যিয়াদকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত এবং স্বহস্তে হত্যা করলো।

মুখতার যদি আন্দোলনকে শুধুমাত্র হোসাইন (রাঃ)-এর হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতো তাহলে ব্যাপারটি এক ধরনের হতো। কিন্তু একই সময় সে ইবনে যোবায়ের (রাঃ) এবং বনু উমাইয়া উভয়ের ক্ষমতার বিরুদ্ধে সশস্ত্র তৎপরতা শুরু করলো। সে নিজের বাজে ধ্যান-ধারণা এবং আকীদা-বিশ্বাসও মানুষের মধ্যে প্রচার করতে লাগলো। ইবনে যিয়াদকে পরাজিত করার পর বনু উমাইয়ার সাথে মুখতারের সরাসরি কোন সংঘর্ষ হয়নি। অবশ্য ইবনে যোবায়ের (রাঃ)-এর সাথে তার দ্বন্দ্ব ক্রমেই বেড়ে চললো। ওদিকে ইবনে যোবায়ের (রাঃ)-এর মনে সন্দেহ ঘনীভূত হলো। তিনি মনে করলেন যে, হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) এবং মুহাম্মাদ বিন হানফিয়াহ হয়তো তাকে সহযোগিতা করছেন। তিনি সতর্কতা হিসেবে উভয় বুজর্গকে নজরবন্দী করলেন। এ খবর পেয়ে মুখতার মক্কায় একটি বাহিনী প্রেরণ করে তাদেরকে নজর বন্দী থেকে মুক্ত করালেন। এরপর উভয় বুজর্গই মক্কা থেকে তায়েফ চলে গেলেন।

আযমীদের শক্তিতে শক্তিমান হয়ে মুখতার ১৮ মাস যাবত বনু উমাইয়াহ এবং ইবনে যোবায়ের (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে সফল লড়াই চালালো। এ সময় সে কূফার আরবদের ওপর প্রচণ্ড নির্যাতন করলো। ফলে তারা তার বিরুদ্ধে চলে গেল এবং তাদের অনেক শরীফ ব্যক্তি কূফার স্থায়ী আবাস পরিত্যাগ করে বসরাহ চলে গেলেন। তখন হযরত আবদুল্লা বিন যোবায়ের (রাঃ)-এর ছোট ভাই মাসয়াব বিন যোবায়ের (রাঃ) বসরার গবর্নর ছিলেন। তাঁরা মাসয়াবকে কূফার ওপর হামলা চালানোর জন্যে অনুপ্রাণিত করলেন। মাসয়াব সমকালীন প্রখ্যাত জেনারেল মুহাল্লাব বিন আবি আফরাহকে বসরা ডেকে পাঠালেন। সে সময় সে খারেজীদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষরত এবং ইবনে যোবায়ের (রাঃ)-এর পক্ষ থেকে পারস্যের গবর্নর ছিলেন। তিনি খারেজীদের সাথে এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত সন্ধি করে নিয়েছিলেন এবং এক শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে বসরাহ পৌঁছলেন।

এক্ষণে মাসয়াব বিন যোবায়ের (রাঃ) সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয়ে কূফার দিকে অগ্রসর হলেন। মুখতারও মুকাবিলার জন্যে ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল। উভয় পক্ষের মধ্যে দু'তিনটি রক্তাক্ত সংঘর্ষে মুখতার পরাজিত হলো এবং অবশেষে কূফার রাজধানী ভবনে অবরুদ্ধ হয়ে বসে পড়লো। মাসয়াব এত কঠোর অবরোধ আরোপ করলেন যে, ৪০ দিন পর তাকে বাইরে বেরিয়ে আসতে হলো। সে সময় তার সাথে মাত্র ১৯ জন ছিল।

www.amarboi.org

মুখতারসহ তারা সবাই মাসয়াব বাহিনীর সাথে লড়াই করতে করতে মৃত্যুমুখে পতিত হলো। এমনিভাবে ইবনে যোবায়ের (রাঃ)–এর এক বড় শত্রু শেষ হলো এবং ইরাকের ওপর তাঁর কর্তৃত্ব বহাল হলো। মুখতার ইবনে যোবায়ের (রাঃ) এবং বনু উমাইয়াহ উভয়েরই শত্রু ছিল। তার হত্যার পর আবদুল মালিক এবং ইবনে যোবায়ের (রাঃ) পরস্পর মুখোমুখী হলো এবং উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেল। সর্ব প্রথম আবদুল মালিক এক শক্তিশালী বাহিনীসহ কারকেসিয়ার দিকে অগ্রসর হলো। হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ)–এর পক্ষ থেকে যাফর বিন হারিস এখানকার গবর্ণর ছিলেন। যাফর অত্যন্ত বীরত্বের সাথে আবদুল মালিকের মুকাবিলা করলো। কিন্তু অবশেষে তিনি আবদুল মালিকের সাথে সন্ধি করে নিলেন এবং স্বীয় কন্যাকে তার পুত্র মুসায়লামার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন। এরপর আবদুল মালিক এক বিরাট বাহিনীসহ ইরাকের দিকে রওয়ানা হলো। তার ইরাক পৌঁছার পূর্বেই মাসয়াব বিন যোবায়ের (রাঃ) মুহাল্লাব বিন আবি সাফরাহকে পারস্য এবং আবদুল্লাহ বিন হাযেমকে খোরাসান প্রেরণ করেছিলেন। ফলে আবদুল মালিকের মুকাবিলার জন্য তাঁর নিকট খুব কম সৈন্যই ছিল। এ সত্ত্বেও তিনি হিম্মত হারা হলেন না এবং "দীরে জাসলিক" নামক স্থানে উমাইয়াহ বাহিনীর বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তি দিয়ে মুকাবিলা করলেন। আবদুল মালিক মাসয়াবের জীবনের নিরাপত্তা দানের প্রস্তাব পেশ করলো। কিন্তু তিনি এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন এবং বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে নিহত হলেন। মাসয়াব হত্যার পর ইরাক আবদুল মালিকের পদানত হলো। অতপর সে মক্কা মুয়াজ্জামায় সৈন্য প্রেরণের প্রস্তুতি শুরু করলো। মুসতাদরাকে হাকিমে বর্ণিত আছে যে, একদিন সে বনু উমাইয়ার সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব এবং তার শুভাকাংখীদেরকে একত্রিত করলো এবং মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললোঃ "তোমাদের মধ্যে কে ইবনে যোবায়েরকে খতম করার দায়িত্ব নেবে?" আবদুল মালিকের এ প্রশ্নে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ছাকাফী দাঁড়িয়ে বললোঃ

"আমীরুল মু'মিনিন! এ কাজের দায়িত্ব আমার ওপর ন্যস্ত করুন," আবদুল মালিক তিনবার প্রশ্নটি উচ্চারণ করলেন এবং তিনবারই হাজ্জাজ এ কাজের জন্য নিজেকে পেশ করলো। হাজ্জাজ আরো বললো যে, সে একটি ঢাল ছিন্ন করেছে বলে স্বপ্নে দেখেছে।

সর্বশেষে আবদুল মালিক এ অভিযানের দায়িত্ব হাজ্জাজের ওপর ন্যস্ত করলো এবং বর্তমানে মদীনাবাসীদের সাথে কোন বিবাদে জড়িয়ে না পড়ার জন্যে তাকে নির্দেশ দিলো। সেই সঙ্গে তায়েফ পৌঁছে অবস্থান গ্রহণ এবং সেখান থেকে ছোট ছোট বাহিনী মক্কার ওপর হামলার জন্যে প্রেরণের নির্দেশও তাকে দেয়া হলো। ফলে ইবনে যোবায়ের (রাঃ)–এর শক্তি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়বে। এর পর যদি আরও সৈন্যের প্রয়োজন হয় তাহলে তাকে জানানোর কথা বলা হলো।

www.amarboi.org

হাজ্জাজ এ সব নির্দেশ পালনের ওয়াদা করলো এবং তিন হাজার সৈন্যসহ তায়েফ পৌঁছে অবস্থান নিলো। ইবনে যোবায়ের (রাঃ) পরিস্থিতি অবগত হলেন এবং মক্কা মুয়াজ্জামা রক্ষার ব্যবস্থাদি সম্পন্ন করলেন। হাজ্জাজ বাহিনী প্রায়ই মক্কার ওপর হামলার চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু ইবনে যোবায়ের (রাঃ)–এর সমর্থকরা তাদেরকে ভাগিয়ে দিলো। এভাবে কয়েকমাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর হাজ্জাজ আবদুল মালিকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলো এবং সাথে সাথে মক্কা আবরোধের অনুমতি চাইলো। আবদুল মালিক তৎক্ষণাৎ পাঁচহাজার যোদ্ধার একটি বাহিনী হাজ্জাজের সাহায্যার্থে প্রেরণ করলো এবং তাকে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হওয়ার অনুমতি দিল। সাহায্য পৌঁছতেই হাজ্জাজ অগ্রসর হয়ে মক্কা অবরোধ করলো এবং বুকাবিস পাহাড়ের ওপর কামান স্থাপন করে শহর ও হেরেম শরীফের ওপর পাথর এবং আগুনের গোলা নিক্ষেপ শুরু করলো। ৭২ হিজরীর (৬৯২ সালের ২৫ মার্চ) পহেলা জিলকদ এ অবরোধ শুরু হয়ে সাত মাসেরও কিছু অধিক সময় তা অব্যাহত থাকলে এ সময় মক্কা শহর এবং বাইতুল্লাহ শরীফ অব্যাহতভাবে পাথর ও আগুনের গোলার শিকার হলো। হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ) অত্যন্ত ধৈর্য্য, স্থৈর্য এবং সাহসিকতার সাথে আবরোধের মুকাবিলা করলেন। পাথর এবং আগুনের গোলা বর্ষণের মধ্যেও তিনি অত্যন্ত ইতমিনান ও ধীর স্থিরভাবে কা'বা শরীফে নামাযয পড়তেন। কিন্তু এ সময় দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটলো। শহরে খাদ্যের অভাব দেখা দিল। ইবনে যোবায়ের (রাঃ)–এর সঙ্গীরা অবরোধের কাঠোরতা এবং ক্ষুধায় কাতর হয়ে তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করতে লাগলো। ইবনে আছির (রঃ) বর্ণনা করেছেন, দশ হাজার মানুষ ইবনে যুবায়ের (রাঃ)–এর সঙ্গ পরিত্যাগ করে হাজ্জাজের আশ্রয়ে চলে গেল। তাদের মধ্যে ইবনে যোবায়ের (রাঃ)–এর দু'পুত্র হামজাহ এবং খুবায়েবও ছিল। শুধু এক পুত্র যোবায়ের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তার সাথে ছিলেন।

এ সময় একদিন হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বৃদ্ধমাতা হযরত আসমার (রাঃ) খিদমতে হাজির হলেন। সে সময় হযরত আসমার বয়স একশ বছরেরও বেশী ছিল এবং তার দৃষ্টি শক্তি রহিত হয়ে গিয়েছিল। হযরত আবদুল্লাহ জিজ্ঞেস করলেনঃ

"আম্মাজান! আপনি কেমন আছেন।"

হযরত আসমা (রাঃ) ঃ আমার অবস্থা আর কি জিজ্ঞেস করছো। দৃষ্টিশক্তি রহিত হয়ে গেছে।

হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ) ঃ আম্মাজান! মৃত্যুতে প্রশান্তি আছে।

হযরত আসমা (রাঃ)ঃ পুত্র! আমি তোমার পরিণতি দেখে মরতে চাই। তুমি যদি শাহাদাত বরণ করো তাহলে নিজের হাতে তোমার কাফন দাফন করবো। আর যদি তুমি বিজয়ী হও তাহলে আমার অন্তর ঠাণ্ডা হবে।

www.amarboi.org

এ কথা শুনে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) হেসে দিলেন এবং প্রস্থান করলেন। দশ দিন পর তিনি শেষ সালামের জন্য তাঁর খিদমতে পুনরায় হাজির হলেন। সে সময় তিনি মসজিদে হারামে অবস্থান করছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) আরজ করলেনঃ "আম্মাজান! অবরোধের সাত মাস চলে গেল। আমার পুত্র যোবায়ের এবং হাতেগোনা কয়েকজন ছাড়া সকলেই আমাকে পরিত্যাগ করে হাজ্জাজের নিকট চলে গেছে। সে আমাকেও নিরাপত্তা দিতে প্রস্তুত। আমি যা চাইব তাই দিতে আবদুল মালিকও ওয়াদা করেছে। বলুন! এ অবস্থায় আপনার কি নির্দেশ?

হযরত আসমা (রাঃ)ঃ পুত্র! তুমি নিজের ব্যাপার আমার চেয়ে ভালো বোঝো। যদি তুমি হকের ওপর থেকে থাকো তাহলে যাও। যে পথে তোমার সাথী–সঙ্গীরা জীবন কুরবাণী করেছে সে পথে তুমিও জীবন দান কর। আর যদি তুমি নাহক বা হক পরিপন্থী পথে লড়াই করে থাকো, তাহলে খুব খারাব কাজ করেছ। মুসলমানদের রক্ত প্রবাহিত করেছ। সাথীদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছ এবং নিজেও হালাক হয়েছ।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) ঃ আম্মাজান! আমি হক এবং সত্যের জন্যে লড়াই করেছি এবং হক ও সত্যের জন্যে সাথীদের দিয়ে যুদ্ধ করিয়েছি। শুধুমাত্র পরিবর্তিত পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করার লক্ষ্যে আপনার খিদমতে হাজির হয়েছি।

হযরত আসমা (রাঃ) ঃ যদি তুমি নিজেকে হকপন্থী মনে কর অথচ এখন সমর্থক না থাকার কারণে এবং পরিস্থিতি প্রতিকূল হওয়ার জন্যে দুশমনের সামনে নতি স্বীকার করতে চাও, তা কিন্তু ঠিক নয়। এটা শরীফ এবং দ্বীনদারদের নীতি নয়।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) ঃ আম্মাজান! আমি মৃত্যুকে ভয় করি না। শুধু এ ধারণাই করছি যে, মৃত্যুর পর দুশমন আমার দেহকে টুকরো টুকরো করে শুলে চড়াবে।

হযরত আসমা (রাঃ) ঃ পুত্র! বকরী জবেহ করার পর চামড়া ছাড়ানো হোক অথবা তার দেহ টুকরো টুকরো করা হোক তাতে কি পরওয়া? আল্লার ওপর ভরসা করে তুমি বের হও। মৃত্যুর ভয়ে গোলামীর জিল্লতী বা লাঞ্ছনা কবুল করো না। আল্লার কসম! ইজ্জতের মৃত্যু জিল্লতীর হুকুমাত থেকে উত্তম এবং হক পথে তরবারীর কিমা হওয়া পথভ্রষ্টদের গোলামীর চেয়ে হাজার গুণ শ্রেষ্ঠ।

জলিলুল কদর মাতার এ সাহসিকতাপূর্ণ কথা শুনে হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ) ভাবাবেগে নিমজ্জিত হলেন। তিনি অগাধ ভালোবাসায় মায়ের মাথায় চুমু দিলেন এবং বললেনঃ "আম্মাজান! হক পথে বীরত্বপূর্ণ লড়াই করে জীবন দানের ইচ্ছাই আমার ছিল। কিন্তু আপনার মতও আমি নিতে চেয়েছি। যাতে আমার মৃত্যুর পর আপনি দুঃখ প্রকাশ না করেন। আলহামদুলিল্লাহ! আমি আপনাকে দৃঢ়চেতা পেয়েছি। আপনার

www.amarboi.org

কথা আমার ঈমানকে শক্তিশালী এবং আত্মাকে আরো মজবুত করেছে। আমি আজ অবশ্যই কতল হয়ে যাবো। আমার বিশ্বাস, আমার নিহত হওয়ার পরও আপনি এমনি ধৈর্য্য ও শোকরের পথ অবলম্বন করবেন। আল্লাহর কসম! আমি কখনো খারাবকে পছন্দ করিনি। কোন মুসলমানের ওপর যুলুম করিনি। কোন ওয়াদা ভঙ্গ করিনি। আমানতের খেয়ানত করিনি। আমার কোন আমিল অহেতুক যুলুম করলে তা প্রতিরোধ করেছি। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ছাড়া আর আমার কোন উদ্দেশ্য নেই।"

অতপর তিনি আসমানের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেনঃ "হে আল্লাহ! আমি এসব কথা ফখর করার উদ্দেশ্যে বলিনি। বরং নিজের মায়ের ইতমিনান এবং প্রশান্তির জন্যে বলেছি।"

হযরত আসমা (রাঃ) বললেন, যাও বেটা, আল্লাহর রাহে জীবন দান কর। ইনশাল্লাহ আমি ছাবির এবং শাকির থাকবো। একটু এগিয়ে এসো। শেষ বারের মত তোমাকে একটু আদর করি।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) সামনে অগ্রসর হলেন এবং হযরত আসমা (রাঃ) তাকে গলায় মিলালেন। তাঁর হাত হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর জিরার ওপর পড়লে জিজ্ঞেস করলেন, বেটা! তোমার শরীরের ওপর এটা কি? ইবনে যোবায়ের (রাঃ) ঃ আম্মাজান! এটা জিরা। দুশমনের তরবারী এবং হামলা থেকে পরিত্রাণের জন্যে এটা ব্যবহার করি।

হযরত আসমা (রাঃ) ঃ বেটা! আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার জন্যে বের হও। আর এসব ভঙ্গুর বস্তুর সাহায্য নাও।

ইবনে যোবায়ের (রাঃ) তৎক্ষাণাৎ জিরা খুলে ফেললেন এবং শিরস্ত্রাণ খুলে নিক্ষেপ করলেন। অতপর সাধারণ পোশাক পরিধান করে মাথায় সাদা রুমাল বেঁধে নিলেন। মাকে ব্যাপারটি জানালে তিনি বললেন, আমি এখন আনন্দিত। যাও, আল্লাহর রাস্তায় লড়াই কর এবং তার নিকট এ পোশাকেই গমন কর।

মা'র নিকট থেকে বিদায় হয়ে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) কামিসের কোণা উঠিয়ে কোমরের সাথে বেঁধে নিলেন। দু' আস্তিন উঠিয়ে দু'হাতে তরবারী ধরে যুদ্ধ ক্ষেত্রে পৌঁছলেন। এ সময় হাতে গোনা কয়েকজন ফিদাকার তাঁর সাথে ছিলেন। পুত্র যোবায়ের একপাশে এবং ইবনে সাফওয়ান অন্য পাশে তাঁর সহগামী ছিলো। ইবনে যোবায়ের (রাঃ) এবং তাঁর সাথীরা যেদিকে অগ্রসর হতেন সিরীয় সৈন্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত। ইবনে যোবায়ের (রাঃ)-এর বয়স সে সময় ৭২ বছর হলেও বীরত্বের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন নজিরবিহীন। দু'হাতে তরবারী চালিয়ে শত্রু ব্যূহের অনেক অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। অতপর ফিরে আবার সাথীদের সাথে এসে মিলিত হলেন। একে একে সাথীরা শহীদ হয়ে

www.amarboi.org

গেলে তাঁকে একজন বললো, আপনি অনুমতি দিলে আমি কা'বার দরজা খুলে দিতে পারি, যাতে আপনি সেখানে প্রবেশ করে দুশমনের হাত থেকে রক্ষা পান। সে সময় ইবনে যোবায়র (রাঃ)–এর মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়েছিলঃ "আমি লাঞ্ছনা বা জিল্লতী স্বীকার করে জীবন বাঁচাতে চাই না এবং মৃত্যুর ভয়ে সিঁড়িতে চড়নেওয়ালা নই। আমি এমন তীর ভালোবাসি যা বিচ্ছিন্ন হয় না এবং মৃত্যুর সাক্ষাৎ প্রার্থী কোন দিকে চাইতে পারে।"

এরপর তিনি বাঘের মত সিরীয়দের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং জোহর নামায পর্যন্ত অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করতে লাগলেন। ইত্যবসরে তিনি কয়েকটি আঘাত পান। কিন্তু সাহসে মোটেই ভাটা পড়েনি। এক সময় জনৈক কৃষ্ণকায় ব্যক্তি গালি দিলে তিনি আগুয়ান হয়ে এমনভাবে তরবারী চালালেন যে, তার দেহ দু'টুকরো হয়ে গেল। অবশেষে জনৈক সিরীয় তাঁর মাথার ওপর পাথর মারলো। ফলে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হলেন। মাথা দিয়ে ফিনকি মেরে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগলো।

প্রচণ্ড রক্তক্ষরণের ফলে তিনি খুব দুর্বল হয়ে পড়লেন। এ অবস্থায় সিরিয়রা হল্লা করে তাঁর ওপর তরবারীর আঘাত বর্ষণ করলো। এভাবে রাসূল (সাঃ)–এর সহচর এবং জাতুন নাতাকাইনের দৃষ্টি রশ্মি এবং সমকালীন শ্রেষ্ঠতম বাহাদুর শহীদ হয়ে মাটিতে ঢলে পড়লেন। সিরীয়রা কালবিলম্ব না করে তার মাথা কেটে নিল।

হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ)–এর শাহাদাতের খবর হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে অবহিত করা হলে সে খুব খুশী হলো। সে তার মাথা দামেস্কে আবদুল মালিকের নিকট প্রেরণ করলো এবং লাশ এক উঁচু স্থানে শুলে চড়িয়ে দিলো। হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ দৃশ্য দেখে তিনি খুব দুঃখিত হলেন এবং লাশকে উদ্দেশ করে তিনবার এ বাক্য উচ্চারণ করলেনঃ "আবু খুবায়েব! আসসালামু আলাইকা। আল্লাহর কসম, তুমি বড় নামাযি এবং রোযাদার মানুষ ছিলে। এটা ভিন্ন কথা যে, তুমি দুনিয়াকে তার মর্যাদা থেকে বেশী সম্মান দিয়েছ। প্রকৃতপক্ষে দুনিয়া এত সম্মানের যোগ্য ছিল না। যে জামায়াতের সদস্য তুমি ছিলে সে জামায়াত অত্যন্ত মর্যাদাবান জামায়াত ছিল।"

শাহাদাতের তৃতীয় দিনে হযরত আসমা (রাঃ) হাজুনে তাশরীফ নিলেন। সেখানে ইবনে যোবায়ের (রাঃ)–এর লাশ লটকানো ছিল। ঘটনাক্রমে সে সময় হাজ্জাজও সেখানে উপস্থিত ছিলো। হযরত আসমা (রাঃ)–কে বলা হলো যে, হাজ্জাজ তাঁর নিকট দণ্ডায়মান রয়েছে। তিনি তাকে সম্বোধন করে বললেনঃ "এ সওয়ারের অবতরণের সময় কি এখনো আসেনি?"

www.amarboi.org

হাজ্জাজঃ সে বিপথগামী ছিল। প্রাপ্য শাস্তি সে পেয়েছে।

হযরত আসমা (রাঃ) ঃ আল্লাহর কসম! সে বিপথগামী বা অবিশ্বাসী ছিল না। রোযা রাখতো। নামায পড়তো এবং পরহেজগার ছিল।

হাজ্জাজঃ বড় বিবি! এখান থেকে চলে যাও। তোমার জ্ঞান লোপ পেয়েছে।

হযরত আসমা (রাঃ) ঃ আমার জ্ঞান লোপ পায়নি। আল্লার কসম! আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে শুনেছি যে, বনু ছাকিফে এক কাজ্জাব বা মিথ্যুক এবং এক হন্তা জন্ম নেবে। যাই হোক, কাজ্জাবকে (অর্থাৎ মুখতার ছাকাফী) আমরা দেখেছি আর হন্তা হলে তুমি।

অন্য এক রাওয়াতে আছে যে, হজ্জাজ যখন শুনলো যে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) ইবনে যোবায়েরের (রাঃ) প্রশংসা করেছে তখন সে তার লাশ শুল থেকে নামিয়ে ইহুদীদের কবরস্তানে নিক্ষেপ করেছিল এবং হযরত আসমা (রাঃ)-কে ডেকে পাঠিয়েছিল। তিনি আসতে অস্বীকৃতি জানালেন। এতে হাজ্জাজ অগ্নিশর্মা হয়ে পুনরায় তাঁকে অবিলম্বে চলে আসার কথা বললো। নচেত চুলের ঝুটি ধরে মাটিতে টেনে নেয়ার হুমকি দিল। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে জবাব দিলেন, আল্লাহর কসম! সে সময় পর্যন্ত আমি আসবো না, যতক্ষণ আমার চুলের ঝুটি ধরে মাটিতে টানা না হয়। এ জবাব শুনে হাজ্জাজ স্বয়ং তাঁর নিকট গেলো এবং বললোঃ "সত্যকথা বলতে কি আল্লাহর শত্রুর কি পরিণতি হয়েছে।"

হযরত আসমা (রাঃ) বললেনঃ "হ্যাঁ, তুমি তার দুনিয়া খারাব করেছ। কিন্তু সে তোমার আখিরাত বরবাদ করে দিয়েছে। বিদ্রূপ করে তুমি আমার পুত্রকে ইবনে জাতুন নাতাকাইন বলতে। আল্লাহর কসম! আমিই জাতুন নাতাকাইন। এ সম্মানিত উপাধি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে সে সময় দিয়েছিলেন যখন আমি (হিজরতের সময়) তাঁর খাবার পিঁপড়া থেকে রক্ষার জন্যে নিজের নাতাক দিয়ে ঢেকেছিলাম। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, বনি ছাকিফে একজন কাজ্জাব এবং একজন যালেম হবে। কাজ্জাবকে তো আমরা দেখেছি। আর যালেম হলে তুমি।"

হযরত আসমা (রাঃ)-এর এ স্পষ্টবাদিতায় হাজ্জাজ চুপে চুপে চলে গিয়েছিল।

আর এক রাওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, কোন মাধ্যমে আবদুল মালিক খবর পেলো যে হাজ্জাজ ইবনে যোবায়ের (রাঃ)-এর লাশ হযরত আসমা (রাঃ)-এর নিকট হস্তান্তর করেনি। সে তার লাশ হযরত আসমা (রাঃ)-এর নিকট অবিলম্বে হস্তান্তরের নির্দেশ

www.amarboi.org

দিলো। সুতরাং হাজ্জাজ হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ)-এর লাশ তাঁর শোকাতুর মায়ের কাছে সোপর্দ করলো। তিনি তাঁকে গোসল দিয়ে হাজুনে দাফন করলেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ)-এর শাহাদাতের সামান্য কিছু দিন পরই তাঁর জলিলুলকদর মাতা হযরত আসমা (রাঃ) ইন্তেকাল করেন।

হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ) সে সব সাহাবীর অন্তর্ভূক্ত যারা জ্ঞান ও ফযিলতের দিক দিয়ে উচ্চতর আসনে সমাসীন। যদিও তিনি রাসূল (সাঃ)-এর ফায়েজে অবগাহিত হওয়ার বেশী সুযোগ পাননি, তবুও হযরত যোবায়ের (রাঃ) ইবনুল আওয়াম (পিতা), হযরত আসমা (রাঃ) বিনতে আবু বকর সিদ্দিক (মাতা), হযরত আবু বকর সিদ্দিক (নানা) এবং উম্মুল মু'মিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহ-এর (খালা) মত বিরাট মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের ছায়ায় লালিত-পালিত হয়েছিলেন। এ জন্যে তিনি দীনি এলমে সমুদ্রের মত গভীরতা অর্জন করেছিলেন।

ইসলামের সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল উৎস হলো কুরআনে হাকিম। হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ) কুরআনে হাকিমের বিরাট আলেম এবং ক্বারী ছিলেন। তিনি কখনো কখনো কুরআনে হাকিমের তাফসির করতেন। বস্তুতঃ তার থেকে কতিপয় আয়াতের তাফসির সহিহ বুখারীতে বর্ণিত আছে। কুরআনের কিরআতে তার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) তার কিরআতের অনুরাগী ছিলেন এবং তাকে "ক্বারীউ লিল কুরআন" বলে অভিহিত করতেন। হযরত ওসমান জুন্নুরাইন (রাঃ) ৩০ হিজরীতে কুরআনে হাকিম নকল করার দায়িত্ব যেসব সাহাবীর ওপর ন্যস্ত করেছিলেন তাদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ)-ও একজন ছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ) থেকে ৩৩টি হাদীস বর্ণিত আছে। তার মধ্যে দুটিতে ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম ঐকমত্য পোষণ করেন। ছয়টি বুখারী এবং দু'টিতে মুসলিম ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন। বর্ণিত হাদীসের বেশীরভাগই স্বয়ং রাসূল (সাঃ)-এর নিকট থেকে গৃহীত। হুজুর (সাঃ) ছাড়াও তিনি হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ), হযরত ওমর ফারুক (রাঃ), হযরত ওসমান গনি (রাঃ), হযরত আলী কারামাল্লাহু ওয়াজহাহু, উম্মুল মু'মিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) এবং হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন ছাবিত আনসারী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার শাগরিদদের মধ্যে হযরত উরওয়াহ বিন যোবায়ের (রাঃ), তাউস (রঃ), আতা বিন আবি রাবাহ (রঃ), ইবনে আবু মালিকাহ (রঃ), ছাবিত বিন আসলাম বানানি (রঃ), মুহাম্মদ বিন মুনকাদ (রঃ), উবাদ (রঃ), হিশাম (রঃ), আবুসা আছা (রঃ) এবং আবুজ জরিয়ানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

www.amarboi.org

তাফাককুহ ফিদ্দীনের দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ) মদীনার ফকিহ সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হতেন। তিনি জনগণকে মাসলা-মাসায়েল বলতেন এবং তাদেরকে সুন্নাতের ওপর চলার পরামর্শ ও নির্দেশ দিতেন। নিজের ফযিলত ও কামালিয়াত সত্ত্বেও তিনি সমকালীন বুজর্গদের নিকট থেকে দীনি এবং ইলমী বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারে লজ্জা অনুভব করতেন না। যে বিষয়ে জানতেন না নির্দ্বিধায় তাদের কাছ থেকে তিনি তা জিজ্ঞেস করে নিতেন। তাদের মত সঠিক মনে করলে তার ওপরই আমল করতেন।

মুসতাদরাকে হাকিমে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ) আরবী ছাড়া অন্য আরো কয়েকটি ভাষাতেও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তার নিকট বিভিন্ন জাতি ও বংশের অনেক গোলাম থাকতো এবং তাদের ভাষাও ছিল বিভিন্ন ধরনের। ইবনে যোবায়ের (রাঃ) সবার সাথে তাদের মাতৃভাষায় কথা বলতেন। কতিপয় ঐতিহাসিক বলেছেন, হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ) সাতটি বিদেশী ভাষার ওপর দখল রাখতেন।

হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ) একজন বাগ্মী ছিলেন। ফাসাহাত এবং বালাগাতের দিক দিয়ে তাঁর ভাষণ ছিল অত্যন্ত উঁচু স্তরের। কতিপয় রাওয়ায়েতে আছে যে কাব্যেও তার প্রভুত দখল ছিল।

হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ)-এর আখলাক বা চরিত্র খনি মনিমুক্তায় পরিপূর্ণ ছিল। ইবাদাত, সাধনা, হক কথন, ধৈর্য ও স্থৈর্য, সুন্নাতের পাবন্দী এবং বাহাদুরীর মত বিশেষ গুণাবলী তাঁকে বিভূষিত করেছিল।

আল্লাহর ইবাদাতে তিনি নিবেদিত চিত্ত ছিলেন। প্রায়ই সারা রাত জেগে নামায পড়তেন এবং দিনে রোযা রাখতেন। ইবাদাতের শওক এবং মসজিদের সাথে গভীর সম্পর্কের কারণে তিনি "হামামাতুল মাসজিদ" উপাধিতে মশহুর হয়েছিলেন। নামাযে এত নিবিষ্টচিত্ত ছিলেন যে, দাঁড়ানো অবস্থায় তাকে প্রাণহীন খুঁটি বা স্তম্ভের মত মনে হতো। সিজদারত অবস্থায় এমন মনে হতো যে কাপড়ের পুঁটুলী পড়ে রয়েছে। বিভিন্ন ধরনের পাখী এবং কবুতর মাথা, কাঁধ এবং পিঠের ওপর এসে বসতো। কিন্তু তিনি তার কোন খবরই রাখতেন না। অনেক সময় রুকূ এবং সিজদাতেই সারা রাত কাটিয়ে দিতেন। ইবনে আছির (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, লোকেরা কয়েকবার পুরো সূরায়ে বাকারাহ শেষ করতো কিন্তু ইবনে যোবায়ের (রাঃ)-এর রুকূ'ই শেষ হতো না। একবার ঘরের মধ্যে নামায আদায় করছিলেন। পাশেই তার একটি ছোট শিশু ঘুমুচ্ছিলো। বাড়ীর ছাদ থেকে আচমকা একটি সাপ শিশুর ওপর পড়লো। বাড়ীর সবাই শিশুকে বাঁচানোর জন্য দৌড়াদৌড়ি এবং চেঁচামেচি শুরু করলো। কিন্তু ইবনে যোবায়ের (রাঃ) ঘটনাটির খবরই

www.amarboi.org

রাখলেন না। তিনি নিবিষ্টচিত্তে নামাযে মশগুল রলেন। নামায শেষ হলে তিনি ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হলেন।

হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ) কঠিন থেকে কঠিনতম সময়েও নামাযে একাগ্রতা কয়েম রাখতেন। মক্কা অবরোধের সময় তার চারপাশে বৃষ্টির মত পাথর বর্ষণ হচ্ছিল। কিন্তু তিনি অত্যন্ত নিবিষ্ট চিত্ততা, একাগ্রতা এবং ইতমিনানের সাথে নামাযে মশগুল রলেন। একবার কামানের এক পাথর মসজিদে হারামের গম্বুজে এসে লাগলো এবং এক কোণা খসে পড়লো। হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ) পাশেই নামায পড়ছিলেন। তিনি সেদিকে ভ্রুক্ষেপই করলেন না এবং তার চেহারায় কোন ধরনের প্রভাবই পরিলক্ষিত হলো না।

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলতেন, তোমরা যদি রাসূল (সাঃ)–এর নামায দেখতে চাও তাহলে ইবনে যোবায়ের (রাঃ)–এর নামায দেখো।

হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ) জীবনে বহুবার হজ্ব করেছেন। এক রাওয়ায়েতে আছে যে, জ্ঞান হওয়ার পর থেকে তিনি কোন বছর হজ্ব বাদ দেননি। অন্য রাওয়ায়েতসমূহে বলা হয়েছে যে, তিনি মোট আটবার হজ্ব করেছেন। একবার কা'বা শরীফে বন্যার পানি জমা হয়েছিল। হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ) কয়েক ফুট পানিতে সাঁতার কেটে তাওয়াফ করেছিলেন।

হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ) অত্যন্ত স্পষ্টবাদী ছিলেন। অন্তরে যা থাকতো মুখেও তাই উচ্চারণ করতেন এবং কোন মুসলিহাতের কারণে তা বলতেন না। হযরত আমীর মাবিয়া (রাঃ) খুব শক্তিশালী শাসক ছিলেন। কিন্তু হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ) তার সামনেই ইয়াযিদকে উত্তরাধিকার নিয়োগের প্রতিবাদ করলেন এবং কোনক্রমেই তাকে মেনে নিতে রাজী হলেন না।

খারেজীদের এক শক্তিশালী দল কতিপয় শর্তে তাকে সাহায্যের প্রস্তাব দিয়েছিল। সময়টি ছিল অত্যন্ত নাজুক এবং তার সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তিনি খারেজীদের শর্ত মানতে পরিস্কার অস্বীকার করেন এবং আকীদা বিশ্বাস থেকে সরে দাঁড়াতে প্রস্তুত নন বলেও জানিয়ে দেন।

হাছিন বিন নুমায়ের তাকে সিরিয়া গমনের দাওয়াত দেন এবং সাহায্যের ওয়াদা করেন। বিগত কয়েক মাস সিরীয়বাসীরা যে রক্তাক্ত কাণ্ড ঘটিয়েছিল তা ক্ষমা করার শর্তও সে আরোপ করেছিল। কিন্তু তিনি তাদের এ রক্তাক্ত কাণ্ড ক্ষমা করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। হাছিনকে পরিস্কার জানিয়ে দেন যে, তিনি প্রতিশোধ নিয়েই ছাড়বেন।



www.amarboi.org

ইবনে যোবায়ের (রাঃ) প্রায় ১২ বছর খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় একদিনের জন্যও শান্তির সাথে তিনি বসতে পারেননি। বনু উমাইয়াহ, মুখতার ছাকাফী, খারেজী এবং অন্যান্য বিরোধীরা তাকে খুব পেরেশান করেছিল। কিন্তু তিনি অত্যন্ত নাজুক অবস্থাতেও হিম্মতহারা হননি এবং অত্যন্ত ধৈর্য ও স্থৈর্যের সাথে প্রতিটি তুফানের মুকাবিলা করেছেন। মক্কা অবরোধের শেষ দিকে যখন সাফল্যের কোন আশা ছিল না তখনও তিনি নিজের ভূমিকায় অটল ছিলেন।

সুন্নাতের অনুসরণকারী হিসেবে তিনি ছিলেন নজীরবিহীন। প্রতিটি কাজে তিনি রাসূল (সাঃ)–এর আদর্শকে সামনে রাখতেন এবং লোকদেরকেও এমনিভাবে কাজ করার উপদেশ দিতেন। নিজের শাসনকালে শরীয়াতের হুকুম–আহকাম জারীর প্রশ্নে তিনি শক্তি প্রয়োগ করতেও দ্বিধা করেননি। হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ)–এর বাহাদুরী বন্ধু ও শত্রু উভয়ের নিকটই ছিল স্বীকৃত। তিনি আরবের অন্যতম বাহাদুর ছিলেন। একবার এক ব্যক্তি মুহাল্লাব বিন আবি ছাফরাহকে জিজ্ঞেস করলো, আজকাল কাদেরকে আরবের বাহাদুর বলা যেতে পারে?

মুহাল্লাব জবাব দিলেনঃ "মুসায়েব বিন যোবায়ের (রাঃ), ওমর বিন ওবায়দুল্লাহ এবং উবাদ বিন হাছিন।"

প্রশ্নকারী আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলো, "এবং আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের?" মুহাল্লাব জবাব দিল, "সে তো জ্বীন, আমিতো সাধারণ মানুষের কথা বলছি।"

মুহাল্লাব বিন আবি ছাফরাহ প্রথম যুগের মহান মুসলমান জেনারেলদের মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। বাহাদুরীর ব্যাপারে তিনি যতখানি অবহিত ছিলেন অন্য কেউ তা কমই জানতেন। তাঁর নিকট ইবনে যোবায়ের (রাঃ)–এর বাহাদুরী ছিল অসাধারণ। তাঁর মত বাহাদুরী কোন জ্বিনের নিকট থেকেই আশা করা যায়।

ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ূতী (রঃ) "তারিখুল খুলাফা" গ্রন্থে লিখেছেন, ইবনে যোবায়ের (রাঃ) কুরাইশদের মধ্যে মশহুর অশ্বারোহী ছিলেন এবং তাঁর বাহাদুরীর কথা সবার মুখে মুখে ফিরতো।

হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ) মাতা–পিতার সীমাহীন খিদমত গুজার ছিলেন এবং তাদের আনুগত্য নিজের ঈমানের অংশ মনে করতেন। উষ্ট্রের যুদ্ধে হযরত যোবায়ের (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)–কে ওসিয়ত করলেন যে, আমি যদি মারা যাই তাহলে আমার ওপর যে ঋণের বোঝা রয়েছে তা আদায়ের দায়িত্ব হবে তোমার।

www.amarboi.org

হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ) সম্মানিত পিতার ওসিয়ত অনুসারে তাঁর ঋণের পাই পাই আদায় করে দিয়েছিলেন এবং সতর্কতা বশতঃ পর পর চার বছর হজ্বের সময় ঘোষণা করতেন যে, কেউ যদি তার মরহুম পিতাকে ঋণ দিয়ে থাকে তাহলে তার নিকট থেকে তা ওসুল করতে পারে। যখন তার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হলো যে; এখন আর কোন ঋণদাতা বাকী নেই তখন পিতার মিরাছ বা সম্পদ সকল ওয়ারেসের মধ্যে শরীয়তের হুকুম অনুসারে বন্টন করে দিলেন। মাতা দীর্ঘজীবি হয়েছিলেন। তাঁকে সবসময় নিজের কাছে রেখেছিলেন এবং জানপ্রাণ দিয়ে খিদমত করতেন। উম্মুল মু'মিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহ (রাঃ) তাঁর খালা ছিলেন। তিনি তাঁকে খুব ভালবাসতেন। তাঁর নামানুসারে তিনি নিজের কুনিয়ত রেখেছিলেন উম্মে আবু আবদুল্লাহ। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ) তাঁকে সীমাহীন সম্মান প্রদর্শন এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা করতেন। উম্মুল মু'মিনিন অত্যন্ত দানশীলা এবং প্রশস্ত মনের মানুষ ছিলেন। ইবনে যোবায়ের (রাঃ) তাঁকে যা কিছু দিতেন অবিলম্বে তিনি তা আল্লাহর পথে খরচ করে দিতেন। একবার ইবনে যোবায়ের (রাঃ) বলে ফেললেন যে, খালাজান যদি হাত না গুটান তাহলে ভবিষ্যতে আর আমি সাহায্য করবো না। উম্মুল মু'মিনিন এ কথা শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন এবং অসন্তুষ্ট হয়ে আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর সাথে আর কথা না বলার কসম খেলেন। দীর্ঘদিন এ অবস্থা চললো। ফলে ইবনে যোবায়ের (রাঃ) ঘাবড়ে গেলেন। হযরত মিসওয়ার বিন মাখরামাহ (রাঃ) এবং আবদুর রহমান বিন আসওয়াদের মাধ্যমে শ্রদ্ধেয় খালার খিদমতে হাজির হয়ে গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। কিন্তু উম্মুল মু'মিনিন চুপ মেরে রলেন। এতে হযরত মিসওয়ার (রাঃ) ও আবদুর রহমান রাসূল (সাঃ)-এর হাদীস বর্ণনা করলেন যে, এক মুসলমান অন্য মুসলমানের সাথে তিন দিনের বেশী কথা না বলা জায়েয নয়। উম্মুল মু'মিনিন রোরুদ্যমান হয়ে বললেন, আমি আবদুল্লাহর সাথে কথা না বলার জন্য কসম খেয়েছি এবং কসম ভাঙাও জায়েয নয়। কিন্তু তারা দু'জন বারবার পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। অবশেষে উম্মুল মু'মিনিন ভাগিনার সাথে কথা বলতে রাজী হলেন এবং কসম ভাঙার কাফফারা স্বরূপ ৪০টি গোলাম আজাদ করে দিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) পিতার অনেক ধন-সম্পদ পেয়েছিলেন। নিজেও বিভিন্ন যুদ্ধে অংশ নিয়ে প্রচুর গনিমতের মাল হাছিল করেছিলেন। এ জন্যে জীবিকার প্রশ্নে মুখাপেক্ষীহীন ছিলেন। ধনী হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত ব্যয় সংকোচন করেতন। কিন্তু যখন বৈধ প্রয়োজন হতো তখন দরাজ হাতে অর্থ ব্যয় করতেন। উম্মুল মু'মিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহ (রাঃ) তো তাঁর খালা ছিলেন। তিনি অন্যান্য উম্মুল মু'মিনিনকেও আর্থিক সাহায্য দিতে দ্বিধা করতেন না। কা'বার সংস্কার কাজেও তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। বস্তুতঃ মুত্তাকী হওয়ার কারণে দানশীল বলা পছন্দ করতেন না। প্রকৃত

www.amarboi.org

হাজতমন্দ হিসেবে কারোর ওপর আস্থা এলেই তাকে সাহায্য করতেন। অবশ্য মাতা হযরত আসমা (রাঃ) এবং খালা হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ)-এর মাধ্যমে প্রচুর অর্থ আল্লাহর রাস্তায় বন্টন করতেন।

হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ)-এর স্ত্রী ও পুত্রের সঠিক সংখ্যা বর্ণনা করা খুব কঠিন ব্যাপার। কেননা এ ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রচুর মতভেদ রয়েছে। "খাওলাহ বিনতে মনজুর কাজারিয়াহ" নামক এক স্ত্রীর কথা কতিপয় রাওয়ায়েতে বিস্তারিতভাবে পাওয়া যায়। এমনিভাবে কতিপয় ঐতিহাসিক খুবায়েব, উবাদ, হামজাহ এবং যোবায়েরের নাম পুত্র হিসেবে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। আকার আকৃতিতে হযরত আবুদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ) জলিলুল কদর নানা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)-এর সাথে অনেকাংশেই সাদৃশ্য রাখতেন। কতিপয় প্রখ্যাত চরিতকার লিখেছেন যে, তাঁর মুখমণ্ডলে কোন চুল ছিল না। অবশ্য তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী গাম্ভীর্য মণ্ডিত ছিলেন। দু'হাতে দু'টি তরবারী ধরে অবলীলাক্রমে চালাতে পারতেন। নামকরা অশ্বারোহী এবং যুদ্ধবিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ)-এর খিলাফতকাল অত্যন্ত ঘনঘটাপূর্ণ ছিল। সমস্যা সংকুল হওয়া সত্ত্বেও শাসনাধীন এলাকাসমূহে তিনি কুরআন-সুন্নাহর হুকুম-আহকাম জারীর সম্ভাব্য সবরকম প্রচেষ্টা চালান। তিনি লোকদেরকে খেলতামাশায় মশগুল হওয়া থেকে কঠোর ভাবে বিরত রাখতেন এবং রাসূল (সাঃ)-এর এ হাদীসের ওপর আমল করতেনঃ "কোন ব্যক্তি যদি শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপ দেখে তাহলে সে যেন তা শক্তি প্রয়োগ করে নির্মূল করে।"

তিনি তাঁর খিলাফতকালে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, কোন ব্যক্তিকে শতরঞ্জ খেলা অবস্থায় পাওয়া গেলে আল্লার কসম আমি তার চুল কেটে দেব এবং দুররাহ মারবো। এ ধরনের অপরাধীকে যে আটক করবে তাকে অপরাধীর শরীরের সকল সরঞ্জাম বাজেয়াফত করে দিয়ে দেয়া হবে।

ইবনে যোবায়ের (রাঃ) শাসন ও বিচার বিভাগকে পৃথক রেখেছিলেন। সব সময় কাজীরা যেন আল্লাহর কিতাব এবং রাসূল (সাঃ)-এর সুন্নাহর ভিত্তিতে ফায়সালা করেন এবং বিচারে যেন পক্ষপাতিত্ব না হয়-এ নির্দেশ তিনি দিয়ে রেখেছিলেন।

ইবনে যুবায়ের (রাঃ) গবর্ণর মনোনয়নে সব সময় তাকওয়া এবং দীনদারীর প্রশ্নটি খেয়াল রাখতেন। তাঁর কতিপয় গবর্ণর হলেনঃ হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন ইয়াযিদ খাতমী (মক্কা মুয়াজ্জামা —সংক্ষিপ্তকালের জন্য), হযরত নুমান (রাঃ) বিন বাশির (রাঃ)

www.amarboi.org

(হেমস), আবদুল্লাহ বিন মতি (কুফা), মুহাজ্জাব বিন আবি হাকারাহ (খোরাসান), আবদুর রহমান বিন হাজদাম (মিশর) এবং মাছয়াব বিন যোবায়ের (বসরাহ)।

ইবনে যুবায়ের (রাঃ) গবর্ণরদের প্রতি কড়া দৃষ্টি রাখতেন। কোন গবর্ণরের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ পাওয়ার সাথে সাথে তিনি তার তাহকিক করতেন। অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হলে অভিযোগের ধরন হিসেবে বিধান করতেন। একবার তিনি নিজের পুত্র হামজাহকে বসরার গবর্ণর নিয়োগ করে পাঠালেন। সে বসরার শরীফদের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করলো। হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ) এ খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ হামজাহকে বসরার ইমারতি থেকে বরখাস্ত করলেন। একবার মদীনার গবর্ণর জাবের বিন আসওয়াদ জলিলুল কদর তাবেয়ী হযরত সায়ীদ (রাঃ) বিন মুসাইয়িবকে বেত্রাঘাত করলো। অপরাধ ছিল তিনি ইবনে যোবায়ের (রাঃ)-এর বাইয়াত করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। ইবনে যোবায়ের এ ঘটনার খবর পেয়ে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন এবং ক্রোধ মিশ্রিত একটি চিঠি জাবেরকে লিখলেন। তিনি চিঠিতে বাড়াবাড়ির জন্যে তাকে গালি দিলেন এবং সায়ীদ (রাঃ)-এর সাথে কোন বাদানুবাদ না করার নির্দেশ দিলেন।

হযরত ইবনে যুবায়ের (রাঃ) ইসলামের ইতিহাসের সর্বপ্রথম গোলাকৃতির মুদ্রা (দিরহাম) তৈরী করেন। মুদ্রার একদিকে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' লিপিবদ্ধ ছিল এবং অন্য দিকে ছিল আমারাল্লাহ বিন ওফারি ওয়াল আদালি'–এ বাক্য।

হযরত ইবনে যুবায়ের (রাঃ)-এর নিকট পদাতিক বাহিনী ছাড়াও নৌবাহিনীও ছিল। কিন্তু তিনি নৌবাহিনী সুসংগঠিত করার ব্যাপারে নজর দিতে পারেন নি। মাছয়াব বিন যোবায়ের (রাঃ) নিহত হওবার পর তাঁর নৌবাহিনীর শক্তিও খুব কম হয়ে যায়।

হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ)-এর চরিত্র এবং কাজের প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে জানা যাবে যে, তিনি কখনো কোন জোড় তোড় এবং ষড়যন্ত্রে অংশ নেননি। রাষ্ট্রীয় পদসমূহকে তিনি রাজনৈতিক ঘুষ হিসেবেও ব্যবহার করেননি। তাঁর খিলাফতকালে কয়েকবার এমন সুযোগও এসেছিল যে, তিনি চাইলে রাজনৈতিক জোরাজোরির মাধ্যমে শত্রুদেরকে কাবু করতে পারতেন। কিন্তু তিনি সব সময় জাহের ও বাতেনকে একই ধরনের রেখেছিলেন এবং কখনো চালবাজীর মাধ্যমে কোন কাজ করেননি। হক মনে করে প্রথম দিন যে মনোভাব বা ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন আমৃত্যু সে ভূমিকার প্রতিই অটল ছিলেন। কোন লোভ-লালসা তাকে নিজের পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি এবং শত্রুর প্রচণ্ড শক্তিও তাকে করতে পারেনি অবদমিত। অত্যন্ত বিপদসংকুল অবস্থাতেও তিনি নিজের সাহস উজ্জীবিত রেখেছিলেন। মাথা কাটিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু শত্রুর সামনে অবনত

www.amarboi.org

হত্যাকে সহ্য করেননি। যদি তিনি রাজনৈতিক ভাগ্যান্বেষীদের মত যোগসাজশ করতেন অথবা মক্কা মুয়াজ্জামা থেকে বের হয়ে যেতেন তাহলে সম্ভবতঃ আজ ইসলামের ইতিহাস ভিন্নভাবে লিখা হতো। কিন্তু তিনি নিজের ব্যক্তিত্বকে ধোঁকাবাজীর আবরণে ঢাকা দেননি এবং হেরেম শরীফ থেকেও বিচ্ছিন্ন হননি। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, কতিপয় ব্যাপারে হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ)-এর কর্মপদ্ধতির সাথে দ্বিমত পোষণ করা যায়। তবে, এ হাকীকত বা তাৎপর্যও অস্বীকার করা যায় না যে, তিনি প্রথম যুগের এক বিরাট ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

www.amarboi.org

# হযরত মুগিরাহ (রাঃ) বিন হারিছ হাশেমী

নবুয়াত প্রাপ্তির পূর্বে যেসব ব্যক্তি রাসূল (সাঃ)-এর বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন, মুগিরাহ (রাঃ) বিন হারিছ ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। ইতিহাসে তিনি আবু সুফিয়ান পদবীতে যশস্বী হয়ে আছেন। তিনি হুযুর (সাঃ)-এর চাচাতো এবং দুধ ভাইও ছিলেন। কেননা উভয়েই হযরত হালিমা সাদিয়া (রাঃ)-এর দুধ পান করেছিলেন। হযরত আবু সুফিয়ান মুগিরাহ (রাঃ)-এর বংশনামা হলোঃ মুগিরাহ বিন হারিছ বিন আবদুল মুত্তালিব বিন হাশিম বিন আবদে মান্নাফ বিন কুসাই।

মাতার নাম ছিল গাযনাহ (অন্য রাওয়ায়েত অনুযায়ী গাযিয়াহ)। তাঁর সম্পর্ক ছিল বনু ফাহর গোত্রের সাথে। তাঁর নসবনামা হলোঃ গাযনাহ (গাযিয়াহ) বিনতে কায়েস বিন তুরায়েফ বিন আবদুল উজ্জা বিন আমিরাহ বিন উমাইরাহ বিন ওয়াদিয়াহ বিন হারিছ বিন ফাহর।

মুগিরাহ (রাঃ) প্রিয় নবী (সাঃ)-এর সম বয়সী এবং অন্তরের দোস্ত ছিলেন। চরিতকারদের বর্ণনা মতে তিনি আকৃতিতে হুযুর (সাঃ)-এর সাদৃশ্য রাখতেন। সুদর্শন, যুদ্ধবিদ্যা এবং কাব্য সাহিত্যের প্রতি তিনি ছিলেন আসক্ত। যৌবন কালেই কুরাইশের অত্যন্ত ভালো অশ্বারোহী এবং কবিদের মধ্যে পরিগণিত হতে থাকেন। নিকটাত্মীয়ের সম্পর্ক এবং এক বয়সী হওয়ার কারণে উভয়ের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ছিল। হুযুর (সাঃ)-এর সমবয়সী কুরাইশ যুবকদের মধ্যে তাকে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো যে, মানবতার মুক্তির দিশারী প্রিয় নবী (সাঃ) যখন হকের দাওয়াত প্রদান শুরু করলেন মুগিরাহ তখন সে দাওয়াতের প্রতি ইতিবাচক সাড়া প্রদান এবং সাহায্য সহযোগিতার পরিবর্তে উল্টো তাঁর বিরোধীদের কাতারে শামিল হয়ে গেলেন এবং হকের বিরোধিতা করা যেন একমাত্র দায়িত্ব হিসেবে বেছে নিলেন। তার বিরোধিতা রাসূল (সাঃ) -এর সাথে শত্রুতায় পর্যবসিত হয়। এমনকি তিনি হুযুর (সাঃ)-কে গালমন্দ করা এবং হক পন্থীদের যুলুম নির্যাতন প্রশ্নে অন্যান্য নিকৃষ্ট কুরাইশদের থেকে পিছিয়ে রইলেন না। হুযুর (সাঃ) মক্কা থেকে হিজরাত করে মদীনা মুনাওয়ারাহ তাশরীফ

www.amarboi.org

রাখলেন। এ সত্ত্বেও মুগিরাহর ইসলামের দুশমনীতে ভাটা পড়লো না। ইমাম হাকিম (রঃ) "মুসতাদরাকে হাকিমে" লিখেছেন, মক্কা বিজয়ের পূর্বে মুসলমান ও মক্কার মুশরিকদের মধ্যে যত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তাতে আবু সুফিয়ান মুগিরাহ মুশিরিকদের পক্ষে অত্যন্ত সোৎসাহে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এমনিভাবে হকের বিরোধিতা করতে করতে তিনি বিশ বছর কাটিয়ে দেন। আশার বিপরীত তাঁর এ কাজ এবং শত্রুতামূলক আচরণ রাসূল (সাঃ)–এর জন্য অত্যন্ত দুঃখের কারণ হয়েছিল। এ জন্যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর ওপর ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

অষ্টম হিজরীতে মুগিরাহ (রাঃ) খবর পেলেন যে, বিশ্ব নবী মুহাম্মাদ মুস্তফা (সাঃ) এক বিরাট বাহিনীসহ মক্কা দখল করতে আসছেন। এ খবর শুনে তিনি অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়লেন এবং স্ত্রী ও শিশুদেরকে বললেন, মুহাম্মাদ (সাঃ) বিরাট বাহিনীসহ মক্কা আগমন করছেন। কুরাইশের এমন শক্তি নেই যে, তাঁকে বাধা দেবে। আমি যদি মুসলমানদের হস্তগত হই তাহলে তারা আমাকে জীবিত রাখবে না। এ জন্যে এখান থেকে চলে যাওয়াই আমাদের জন্যে উত্তম।

স্ত্রী অত্যন্ত নেকবখত এবং সমঝদার ছিলেন। তিনি অত্যন্ত দরদ ভরা কণ্ঠে বললেনঃ "এখনো কি তোমার চোখ খুলেনি। আরব এবং আজমের লোক দলে দলে মুহাম্মাদ (সাঃ)–এর আনুগত্য কবুল করছে। তোমার জন্যে আফসোস যে, তুমি এখনো শত্রুতামূলক আচরণ করে চলেছ। প্রকৃতপক্ষে অন্যান্যদের চেয়ে বেশী মুহাম্মাদ (সাঃ)–কে সাহায্য–সহযোগিতা করা তোমার উচিত ছিল।"

স্ত্রীর কথায় হযরত মুগিরাহ (রাঃ) বিশেষভাবে প্রভাবিত হলেন এবং যখন তার সন্তানরাও মায়ের কথার প্রতি সমর্থন জানালো তখন তাঁর অন্তরজগত সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ তিনি গোলাম "মাজকুরকে" একটি উটনী এবং ঘোড়া তৈরীর নির্দেশ দিলেন। অতপর তিনি নবজাত শিশু জাফরকে সাথে নিলেন এবং নবী (সাঃ)–এর খিদমতে হাজির হওয়ার ইচ্ছায় মদীনার দিকে রওয়ানা দিলেন। সে সময় মুসলমানদের অগ্রবর্তী বাহিনী আবওয়া নামক স্থানে পৌঁছে গিয়েছিল। তাঁদের দেখে মুগিরাহ (রাঃ) নিজের বেশ পরিবর্তন করে নিলেন এবং সওয়ারীকে এক স্থানে বেঁধে রেখে চুপিসারে এক মাইল পায়ে হেঁটে বৃহৎ ইসলামী বাহিনীতে গিয়ে পৌঁছলেন। সে সময় তিনি ছিলেন ভীত সন্ত্রস্ত। প্রতি মুহূর্তে ভয়ে পা কাঁপছিল–এ বুঝি কোন মুসলমানের হাতে পড়ে কতল হয়ে গেলেন। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ একা একা বিশ্ব নবী (সাঃ)–এর সামনে এসে পড়লেন। অগ্রসর হয়ে রাসূল (সাঃ) –এর সামনে এসে দাঁড়ালেন এবং মুখ থেকে চাদর সরিয়ে দিলেন। তাঁর ধারণা ছিল হুযুর (সাঃ) সামনে পেয়ে খুশী হবেন। কিন্তু স্মরণ ছিল না যে, বিগত ২০ বছরে দীনে হকের বিরোধিতায় তিনি কত

www.amarboi.org

কি করেছেন। তখন তার জন্যে রাসূল (সাঃ) –এর অন্তরে আর কোন স্থান নেই। রাসূল (সাঃ) তার প্রতি ঘৃণা পোষণকারী হয়ে গেছেন। দৃষ্টি যেই মুগিরাহর ওপর পড়লো ওমনি তিনি পবিত্র মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলেন। মুগিরাহ আবার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পুনরায় মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলেন। মুসলমানরা তাকে হুযুর (সাঃ)–এর সাথে এ অবস্থায় দেখলেন। তারাও তার সাথে একই আচরণ করলো। আনসার সাহাবী হযরত নুয়াইমান (রাঃ) এমন আবেগতাড়িত হয়ে পড়লো যে, কর্কশ কণ্ঠে মুগিরাহকে সম্বোধন করে বললেন, "এই আল্লার দুশমন তুইতো সে ব্যক্তি যে রাসূল (সাঃ)–এর ওপর সর্ব পন্থায় নির্যাতন চালিয়েছিস এবং তাঁর শত্রুতায় আসমান জমিন একাকার করে ফেলেছিস। সময় এসে গেছে এখন তুই সকল অপকর্মের স্বাদ গ্রহণ কর।"

হযরত নুয়াইমান (রাঃ)–এর স্বর ক্রমেই উচ্চ মার্গে চড়তে লাগলো। এদিকে ভয়ে মুগিরার জীবনও যায় যায় অবস্থা। তিনি দৌড়ে নিজের চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ)–এর আশ্রয় নিলেন। হযরত আব্বাস (রাঃ) প্রথমে তাঁর প্রতি ভ্রূক্ষেপ করলেন না কিন্তু যখন তিনি খুব করে অনুনয় বিনয় এবং আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে নুয়াইমান (রাঃ) ও অন্যান্য মুসলমানদের হাত থেকে তাঁর জীবন রক্ষার আবেদন জানালেন তখন হযরত আব্বাস (রাঃ)–এর দয়া হলো এবং তিনি হযরত নুয়াইমান (রাঃ)–কে সম্বোধন করে বললেনঃ "হে নুয়াইমান। আবু সুফিয়ান (মুগিরাহ) রাসূল (সাঃ)–এর চাচাতো ভাই এবং আমার ভ্রাতুষ্পুত্র। এটা ঠিক যে, বর্তমানে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তার প্রতি অসন্তুষ্ট রয়েছেন। কিন্তু তিনি ভবিষ্যতে তাকে ক্ষমাও তো করতে পারেন।"

হযরত আব্বাস (রাঃ)–এর কথা শুনে হযরত নুয়াইমান (রাঃ) চুপ মেরে গেলেন এবং অন্যান্য মুসলমানও তার আহার ওপর ছেড়ে দিলেন।

বিশ্বনবী (সাঃ) হুজফাহ আগমন করলেন। এ সময় মুগিরাহ পুত্রসহ রাসূল (সাঃ)–এর আবাসস্থলের বাইরে বসে গেলেন। হুযুর (সাঃ) বাইরে বেরিয়ে তাঁকে দেখে বিরক্তির সাথে মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলেন। হযরত মুগিরাহ (রাঃ) খুব দুঃখিত হলেন ঠিকই কিন্তু নিরাশ হলেন না। যেভাবেই হোক রাসূল (সাঃ)–এর নিকট পৌঁছে নিজের অপরাধ ক্ষমা করিয়ে নেয়ার অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন। হুযুর (সাঃ) যেখানেই যেতেন সেখানেই যেতেন । সেখানেই তিনি পৌঁছতেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নিতেন। সব শেষে হযরত মুগিরাহ (রাঃ) উম্মুল মুমিনিন হযরত উম্মে সালমাহ (রাঃ)–এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে রাসূল (সাঃ) –এর নিকট তাঁর প্রশ্নের সুপারিশ পেশ করার নিবেদন জানালেন। তিনি রাজী হলেন এবং

www.amarboi.org

হুযুর (সাঃ)–এর খিদমতে আরজ করে বললেন ঃ "ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার চাচার পুত্রকে নিরাশ করবেন না।"

ইরশাদ হলো ঃ "আমার এমন চাচার পুত্রের প্রয়োজন নেই। সে আমার ওপর কম নির্যাতন চালায়নি।"

হযরত মুগিরাহ (রাঃ) হুযুর (সাঃ)–এর জবাব শুনলেন। তাঁর অন্তর ভেঙে খান খান হয়ে গেল। নিরাশ হয়ে তিনি স্ত্রীকে বললেন, "আমার জন্যে ক্ষমার দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। এখন জীবিত থেকে কি লাভ? আমি এ অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্রকে নিয়ে এখান থেকে চলে যাচ্ছি। আমরা দু'জন উদ্দেশ্যহীনভাবে এদিক সেদিক চলতে থাকবো এবং একদিন ক্ষুৎ–পিপাসায় কাতর হয়ে মৃত্যুবরণ করেবো।"

কোন মাধ্যমে রাসূল (সাঃ)–এর নিকট হযরত মুগিরাহর এ অবস্থার খবর পৌঁছলো। এ সময় দয়ার সাগর রাসূল (সাঃ)–এর অন্তরও আবেগময় হয়ে উঠলো। তিনি হযরত মুগিরাহ (রাঃ)–কে তার সামনে আগমনের অনুমতি মঞ্জুর করলেন। পিতা–পুত্র উভয়েই চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে রাসূল (সাঃ) –এর খিদমতে হাজির হলেন এবং আসসালামু আইলকা ইয়া রাসূলুল্লাহ বলে অগ্রসর হলেন। হুযুর (সাঃ) খাদেমদেরকে তাদের মুখের ওপর থেকে চাদর হটানোর নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, মুখতো দেখা যাক। তারা তৎক্ষণাৎ চাদর সরিয়ে দিলেন। পিতা–পুত্র উভয়েই সে সময় কালেমা শাহাদাত পাঠ করে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করলেন। হুযুর (সাঃ) মুগিরাহ (রাঃ)–এর দিকে ইশারাহ করে বললেন ঃ "আবু সুফিয়ান! তুমি আমাকে কবে মক্কা থেকে বের করে দিয়েছিলে?"

তিনি আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল। আমি প্রথমেই খুব লজ্জিত আছি। এরপর আরো গালাগালি করে লজ্জা দেবেন না।"

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ "এখন আর কোন গালাগালি নয়।"

অতপর তিনি হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুকে চাচার পুত্রকে সাথে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে তাকে ওজু এবং সুন্নাতের তালিম প্রদান এবং গোসল দিয়ে পুনরায় তার নিকট নিয়ে আসতে বললেন। হযরত আলী (রাঃ) নবী (সাঃ)–এর নির্দেশ পালনের পর হযরত মুগিরাহ (রাঃ)–কে দ্বিতীয়বার হুযুর (সঃ)–এর খিদমতে পেশ করলেন। তিনি তাকে নামায পড়ালেন এবং ঘোষণা করে দিলেন যে, আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল আবু সুফিয়ানের প্রতি রাজী হয়ে গেছেন। এ জন্যে সকল মুসলমানও যেন রাজী হয়ে যায়। রাসূল (সাঃ)–এর এ ঘোষণায় হযরত মুগিরাহ (রাঃ) খুশীতে মাটিতে আর পা রাখতে

www.amarboi.org

পারছিলেন না। এখন তার জীবনে বিপ্লব এসে গেল এবং দ্বীনে হকের একজন জানবাজ সৈনিক বনে গেলেন।

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত আবু সুফিয়ান (মুগিরাহ) (রাঃ) মক্কা বিজয়ে রাসূল (সাঃ)-এর সাথে অংশ গ্রহণকারী ১০ হাজার মুসলমানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন। অষ্টম হিজরীর শওয়াল মাসে হুনাইনের যুদ্ধ সংঘটিত হলো এ যুদ্ধেও হযরত মুগিরাহ (রাঃ) অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে অংশ নিলেন। যুদ্ধের সূচনায় বনু হাওয়াযেনের প্রচণ্ড তীর বর্ষণে মুসলমানদের মধ্যে বিশৃংখলা দেখা দেয়। এ সময় হযরত মুগিরাহ (রাঃ) কতিপয় সাহাবীসহ রাসূল (সাঃ)-এর সাথে যুদ্ধের ময়দানে অটল পাহাড় হিসেবে দণ্ডায়মান ছিলেন। যখন শত্রুর চাপ বেশী বেড়ে গেল তখন তিনি নাঙ্গা তলোয়ার হাতে নিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়লেন এবং শত্রুর দিকে অগ্রসর হতে চাইলেন। হযরত আব্বাস (রাঃ) এ জীবন বাজী দেখে রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে আরজ করলেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ! চাচার পুত্রের প্রতি রাজী হয়ে যান।" হুযুর (সাঃ) বললেন, "আমি রাজী হয়ে গেলাম। সে আমার সাথে যত শত্রুতাই করে থাকুক না কেন আল্লাহ তাকে মাফ করুন।" অতপর তিনি হযরত মুগিরাহ (রাঃ)-কে সম্বোধন করে বললেন, "আমার বয়সের কসম। তুমি আমার ভাই।" হুযুর (সাঃ)-এর ইরশাদ শুনে তিনি খুশীতে আত্মহারা হয়ে তাঁর কদম মুবারকে চুমু দিলেন। এক রাওয়ায়েতে আছে যে, সে সময় হযরত আব্বাস (রাঃ) হুযুর (সাঃ)-এর সাদা খচ্চরের লাগাম ধরে রেখেছিলেন এবং হযরত মুগিরাহ জিনের পেছনের অংশ ধরা অবস্থায় ছিলেন। রাসূল (সাঃ) -এর ইরশাদ শুনেই তিনি মুশরিকদের ওপর অমিতবিক্রমে হামলা করে বসলেন। অন্যান্য মুসলমানও তাঁর অনুসরণ করলো এবং মুশরিকদের পিছনে হটিয়ে দিল। ইবনে সায়াদ (রঃ) বর্ণনা করছেন যে, হযরত মুগিরাহ (রাঃ)-এর বাহাদুরী এবং জীবন উৎসর্গের এ আবেগ হুযুর (সাঃ)-কে অত্যন্ত খুশী করেছিল এবং তিনি তাঁকে "আসাদুল্লাহ" এবং "আসাদুর রাসূল" উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

হুনাইনের পর রাসূল (সাঃ)-এর যুগে সংঘটিত অন্যান্য যুদ্ধেও হযরত মুগিরাহ (রাঃ) হুযুর (সাঃ)-এর সহগামী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

ইসলাম কবুলের পর হযরত মুগিরাহ (রাঃ) শুধুমাত্র যুদ্ধসমূহে অংশ গ্রহণ করেই অতীত জীবনের কাফফারা আদায় করেননি বরং দিন রাত্রির অধিকাংশ অংশে ইবাদাত এবং আধ্যাত্মিক সাধানায় ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। ইবনে সায়াদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি সমগ্র রাত ধরে নামায পড়তেন এবং গরমের দীর্ঘ দিনে সকাল থেকে অর্ধ দিন পর্যন্ত নফল পড়তেন। কিছু বিরতির পর আবার নামায শুরু করতেন এবং আছর পর্যন্ত তা অব্যাহত রাখতেন। একবার প্রিয় নবী (সাঃ) তাঁকে মসজিদে প্রবেশ

www.amarboi.org

করতে দেখে উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহ (রাঃ)–কে বললেন ঃ "আয়েশাহ! জানো একে ?"

তিনি আরজ করলেন ঃ "ইয়া রাসূলুল্লাহ! না।"

ইরশাদ হলোঃ "সে আমার চাচার পুত্র আবু সুফিয়ান ইবনুল হারিছ। দেখো, সে সবার আগে মসজিদে প্রবেশ করছে এবং সকলের শেষে বের হয়ে আসবে। তার দৃষ্টি জুতোর চামড়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না।"

ইমাম হাকিম (রঃ) "মুসতাদরাকে হাকিমে" এ রাওয়ায়েত উপস্থাপন করেছেন, হযরত মুগিরাহ (রাঃ)–এর ইবাদাত এবং আধ্যাত্মসাধনার একাগ্রতা দেখে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে "জান্নাতের যুবকদের সরদার" উপাধি প্রদান করেন। সে যুগে হযরত মুগিরাহ (রাঃ) সাইয়েদুল আনামের প্রশংসায় অনেক কবিতা রচনা করেন।

হযরত মুগিরাহ (রাঃ) জীবনের নতুন যুগে রাসূল (সাঃ)–এর নবুয়াত প্রাপ্তির পূর্বের যুগের মত নবিজী (সাঃ)–এর অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে পরিগণিত হন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) খুশীতে তাঁকে "উত্তম পরিজন" বলতেন। হুযুর (সাঃ)–এর প্রতি হযরত মুগিরাহরও সীমাহীন ভালোবাসা ছিল। ১১ হিজরীতে বিশ্বনবী (সাঃ) ওফাত হলে দুনিয়া তার নিকট অন্ধকার হয়ে গেল এবং তিনি এক অন্তরস্পর্শী মারছিয়াহ রচনা করেন। তিন–চার বছর পর তাঁর প্রিয় ভাই নাওফিল (রাঃ) বিন হারিছ মারা গেলে তাঁর অন্তর একদম শীতল হয়ে গেল। সে সময় তিনি আল্লার নিকট দোয়া করে বললেন হে আল্লাহ! রাসূল (সাঃ) এবং ভাইয়ের পর জীবন বিস্বাদ ও দুনিয়া নিরানন্দ হয়ে পড়েছে। এ জন্যে শীঘ্র দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নাও । এ দোয়ার কিছুদিন পরই হজ্জের মওসুম এলো। তিনি হজ্জে শরীক হলেন। মিনায় মাথা মুণ্ডালেন। এ সময় মাথায় ক্ষুর লেগে এমন বেগে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগলো যে, তা আর বন্ধ হয় না। মদীনা মুনাওয়ারাহ ফিরে গিয়ে নিজেই নিজের কবর খুঁড়লেন। অবস্থার অবনতি ঘটলে আত্মীয় স্বজন ক্রন্দন করতে লাগলো। তিনি সবাইকে ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আজ পর্যন্ত আল্লাহ পাক প্রতিটি গুনাহ থেকে মাহফুজ রেখেছেন। কবর খোঁড়ার তিন দিন পর আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেলেন। আমীরুল মুমিনিন হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) নামাযে জানাযা পড়ালেন এবং জান্নাতুল বাকীতে দাফন করলেন। তিনি অনেক ছেলে–মেয়ে রেখে যান। কিন্তু তাদের দিয়ে বংশ পরম্পরা অব্যাহত থাকেনি।

–০–

www.amarboi.org

# হযরত আবুল আছ (রাঃ) বিন রবি

কুরাইশের তিন সন্তান ছিল খুবই ভাগ্যবান। এ তিন ভাগ্যবানের মধ্যে অন্যতম হলেন সাইয়েদেনা হযরত আবুল আছ (রাঃ) বিন রবি'। তিনজনের অপর দু'জন হলেন হযরত ওসমান জুন্নুরাইন (রাঃ) এবং হযরত আলী মুরতাজা (রাঃ)। এ তিনজন ছিলেন ফখরে মওজুদাত সারওয়ারে কায়েনাত রহমতে দোআলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামাতা। ভিন্ন রাওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত আবুল আছ (রাঃ)-এর নাম ছিল লাকিত, মুহশিম অথবা হিশম। কিন্তু তিনি আবুল আছ কুনিয়তেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কুরাইশের অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত বংশ আবদি শামছের সাথে তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন। তার নছবনামা হলোঃ আবুল আছ (রাঃ) বিন রবি' বিন আবদুল উজ্জা বিন আবদি শামছ বিন আবদি মান্নাফ বিন কুসাই। আবদি মান্নাফ পর্যন্ত তাঁর নছব প্রিয় নবী (সাঃ) -এর নছবনামার সাথে মিলে যায়।

মাতার নাম ছিল হালাহ (রাঃ) বিনতে খুয়ায়েলদ। তিনি ইসলামের প্রথম মহিলা উম্মুল মুমিনিন হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রাঃ)-এর আপন বোন। চরিতকারদের সকলেই ঐকমত্য পোষণ করে বলেছেন যে, তিনি ইসলাম গ্রহণ ও সাহাবিয়াহ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন এবং হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রাঃ)-এর ইন্তিকালের পরও জীবিত ছিলেন।

হাফিজ ইবনে আবদুল বার (রঃ) "আল ইসতিয়াব" গ্রন্থে লিখেছেন, একবার তিনি প্রিয় নবী (সাঃ) -এর সাথে সাক্ষাতের জন্য মক্কা মুকাররমা থেকে মদীনা তাইয়্যিবা গেলেন। রাসূল (সাঃ) -এর আবাসস্থল পৌঁছে ভেতরে গমনের অনুমতি চাইলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রাঃ) -এর কণ্ঠস্বরের সাথে মিল ছিল। হুযুর (সাঃ)-এর কানে তাঁর আওয়াজ পৌঁছলো। তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে রাসূল (সাঃ)-এর হযরত খাদিজাতুল কুবরাহ (রাঃ)-এর কথা স্মরণ হলো এবং উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়শা সিদ্দিকা (রাঃ)-কে বললেনঃ "খাদিজা (রাঃ)-এর বোন হালাহ হতে পারেন।" ভেতরে এলে তিনি তাঁকে অত্যন্ত তাজিম করলেন। উম্মুল মুমিনিন হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রাঃ) ভাগিনা আবুল আছ (রাঃ)-কে অত্যন্ত

www.amarboi.org

স্নেহ করতেন এবং নিজের সন্তান বলে মনে করতেন। আবুল আছ (রাঃ) যৌবনকালেই ব্যবসায়ে মশগুল হয়ে গিয়েছিলেন এবং বুদ্ধিমত্তা ও সুন্দর আচরণের জন্যে বিরাট ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এ ভাবে তিনি কুরাইশদের মধ্যে বিত্তবান বলে পরিগণিত হন। তার দিয়ানতদারী, সুন্দর আচার-আচরণ ও লেন-দেনের ওপর মানুষের খুব আস্থা ছিল। ফলে মানুষ তার নিকট আমানত রাখতো। ইবনে আছিরের বক্তব্য অনুসারে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মত তিনিও "আমিন" হিসাবে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত আবুল আছ (রাঃ) "আমিন" হওয়া ছাড়াও অত্যন্ত সাহসী এবং বাহাদুর ছিলেন। আরববাসী বাহাদুরীর স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে "হেজাযের বাঘ" লকব দিয়েছিল। নবুয়াত প্রাপ্তির কিছু দিন পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আবুল আছ (রাঃ)-এর সাথে নিজের বড় মেয়ে হযরত যয়নব (রাঃ)-এর বিয়ে দেন। হযরত আবুল আছ (রাঃ) -এর সুন্দর চরিত্রই এ বিয়ের কারণ ছিল। অন্য দিকে হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রাঃ)-এর ইচ্ছা এবং পীড়াপীড়িও বিয়েতে কাজ দিয়েছিল। চরিতকাররা ব্যাখ্যা করে বলেননি যে, বিয়ের সময় যয়নব (রাঃ)-এর বয়স কত ছিল। তবে, অপ্রাপ্ত বয়স্কা ছিলেন। এ জন্য কিয়াস করা হয় যে, আবুল আছ (রাঃ)-এর সাথে তার প্রথম বিয়ে হয়।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (সাঃ) নবুয়াত প্রাপ্তির পর হকের দাওয়াত প্রদান শুরু করলেন। এ সময় উম্মুল মুমিনিন হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রাঃ)-এর সাথে হযরত যয়নব (রাঃ)-ও ইসলাম কবুল করেন। কিন্তু হযরত আবুল আছ (রাঃ) বিভিন্ন কারণে পিতৃধর্মের ওপর কায়েম থাকেন। তবে তিনি দ্বীনে হক এবং রাসূল (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে কখনো কোন তৎপরতায় অংশ নেননি। ইবনে হিশাম বর্ণনা করেছেন যে, একবার কুরাইশের কতিপয় ব্যক্তি হযরত আবুল আছ (রাঃ)-কে হযরত যয়নব (রাঃ)-কে তালাক দেয়ার জন্যে বাধ্য করতে চাইলো এবং কুরাইশের অন্য কোন মেয়ের সাথে বিয়ের প্রস্তাব দিলো। কিন্তু তিনি পরিষ্কারভাবে এ কাজ করতে অস্বীকার করলেন। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই তার কথা সব সময় উল্লেখ করতেন। নবুয়াত প্রাপ্তির ৭ বছর পর কুরাইশের মুশরিকরা প্রিয় নবী (সাঃ) এবং তার সাহায্যকারী ও সমর্থক হাশেমী ও মুত্তালেবীদেরকে শি'বে আবিতালিবে অবরোধ করলো এবং খানা-পিনার কোন বস্তু সেখানে নিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ করে দিল। এ ভয়ানক অবরোধ তিন বছর অব্যাহত ছিল। এ ঘোর দুর্দিনে মুশরিকদের বিধি-নিষেধ এবং বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও হযরত আবুল আছ (রাঃ) জীবন বাজী রেখে খানা-পিনার কিছু বস্তু কখনো কখনো শি'ব অভ্যন্তরে পৌঁছে দিতেন। মিরযা মুহাম্মাদ তকীর বক্তব্য অনুসারে হুযুর (সাঃ) তার

www.amarboi.org

এ খিদমতের স্বীকৃতি এ ভাষায় দিয়েছিলেন-"আবুল আছ জামাইয়ের অধিকার আদায় করেছে।"

নবুয়াত প্রাপ্তির ত্রয়োদশ বছরে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মক্কা মুয়াজ্জামা থেকে হিযরত করলেন। এ সময় হযরত যয়নব (রাঃ) শ্বশুর বাড়ীতে ছিলেন। হযরত আবুল আছ (রাঃ) নিজের বাপ-দাদার ধর্মের ওপর থাকা সত্ত্বেও তার সাথে ভালো ব্যবহার করতেন। দ্বিতীয় হিজরীতে মক্কার মুশরিকরা বদরের যুদ্ধে রওয়ানা হওয়ার সময় হযরত আবুল আছ (রাঃ)-কেও সাথে নিয়ে গেল। অবস্থা এমনই ছিল যে, কোন সুস্থ ব্যক্তি যুদ্ধ অপছন্দ করলেও পিছে থাকতে পারতো না। মুশরিকরা তাকে ভীরু এবং কাপুরুষ বলে তিরস্কার এবং গালি দিত। আর কোন কুরাইশের জন্য এটা ছিল বড় শরমের ও লজ্জার ব্যাপার। বদরের ময়দানে কুরাইশরা পরাজিত হলো। হযরত আবুল আছ (রাঃ) এক আনসারী জানবাজ হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন জাবিরের হাতে বন্দী হলেন। তার সাথে অন্যান্য অনেক মুশরিককেও মুসলমানরা গ্রেফতার করলো।

মক্কাবাসী এ খবর শুনলো। বন্দীদের নিকটাত্মীয়রা রাসূল (সাঃ)-এর নিকট আত্মীয়দের মুক্তির জন্য ফিদিয়া বা অর্থ প্রেরণ করলো। হযরত যয়নবও (রাঃ) দেবর আমর বিন রবির মাধ্যমে ইয়েমেনী আকীক পাথরের একটি হার হযরত আবুল আছ (রাঃ)-এর মুক্তির জন্যে পাঠালেন। হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রাঃ) এ হার কন্যা যয়নব (রাঃ)-কে বিয়ের সময় উপহার দিয়েছিলেন। হুযুর (সাঃ)-এর খিদমতে যখন এ হার পেশ করা হলো তখন হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রাঃ)-এর কথা তার মনে পড়লো এবং অশ্রুতে তার চোখ ঝাপসা হয়ে এলো। তিনি সাহাবা (রাঃ)-দেরকে সম্বোধন করে বললেনঃ যদি তোমরা ভালো মনে কর তাহলে যয়নব (রাঃ)-কে এ হার ফেরত পাঠিয়ে দাও। এটা তার মায়ের স্মৃতির নিদর্শন। আবুল আছ (রাঃ) মক্কায় ফিরে গিয়ে যয়নব (রাঃ)-কে মদীনা পাঠিয়ে দেবে। এটাই তার জন্যে ফিদিয়া হিসেবে বিবেচিত হবে।"

সকল সাহাবী (রাঃ) নবী (সাঃ)-এর এ নির্দেশের কাছে মাথানত করলেন। হযরত আবুল আছ (রাঃ) ও এ শর্ত মেনে নিলেন। মুক্ত হয়ে তিনি মক্কা পৌঁছলেন এবং ওয়াদা অনুযায়ী হযরত যয়নব (রাঃ)-কে নিজের ছোট ভাই কিনানাহ বিন রবি'র সাথে মদীনা রওয়ানা করে দিলেন। কুরাইশ মুশরিকরা যখন খবর পেল যে, হযরত যয়নব (রাঃ) মদীনা যাচ্ছেন তখন তারা কিনানাহ বিন রবি' এবং হযরত যয়নব (রাঃ)-এর পিছু নিল এবং "যি তাওয়া" নামক স্থানে তাদেরকে ঘিরে ফেললো। হযরত যয়নব (রাঃ) উটের ওপর সওয়ার ছিলেন। হিবার বিন আসওয়াদ নামক

একজন মুশরিক নিযাহ্ দিয়ে হযরত যয়নব (রাঃ)-কে মাটিতে ফেলে দিল অথবা উটের মুখ ফিরানোর জন্যে নিজের নিযাহ্ ঘুরালো। উট খুব দ্রুত পেছনের দিকে মোড় নিল। এতে হযরত যয়নব (রাঃ) মাটিতে পড়ে গেলেন। তিনি গর্ভবতী ছিলেন। প্রচণ্ড আঘাত পেলেন ফলে গর্ভপাত হয়ে গেল। কিনানাহ্ বিন রবি' অগ্নি শর্মা হয়ে গেলেন। তূনীর থেকে তীর বের করে হুংকার ছেড়ে বললেনঃ "খবরদার! এখন তোমাদের মধ্য থেকে কেউ অগ্রসর হলেই একদম ছাতু ছাতু করে ফেলবো।"

কাফিররা থেমে গেল। আবু সুফিয়ান কিনানাহ্‌কে সম্বোধন করে বললোঃ "ভ্রাতুষ্পুত্র তীর সম্বরণ কর আমি তোমার সাথে কিছু কথা বলতে চাই।"

কিনানাহ্ বললো ঃ "বলো কি বলতে চাও।"

আবু সুফিয়ান তার কানে কানে বললো, "মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর হাতে আমরা যেভাবে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়েছি তা তুমি জানো। যদি তুমি তার কন্যাকে এভাবে প্রকাশ্যে আমাদের সামনে দিয়ে নিয়ে যাও তাহলে আমরা বড় অপমানিত হবো। তার চেয়ে বরং এটাই উত্তম হবে যে, তুমি এখন যয়নবকে সাথে নিয়ে মক্কা ফিরে এসো এবং অন্য কোন সময়ে গোপনে তাকে নিয়ে যেও।" কিনানাহ্ এ প্রস্তাব মেনে নিল এবং হযরত যয়নব (রাঃ)-কে সাথে নিয়ে মক্কা ফিরে এলেন। কিছুদিন পর সে রাতে চুপিসারে হযরত যয়নব (রাঃ)-কে নিজের সাথে নিয়ে মক্কা থেকে বের হয়ে মদীনা পৌঁছে দিল। অন্য আরেক রাওয়ায়েতে আছে যে, হুযুর (সাঃ) হযরত আবুল আছ (রাঃ)-এর সাথে হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন হারিছাকে পাঠিয়ে দিলেন। যাতে তিনি হযরত যয়নব (রাঃ)-কে নিজের সাথে মদীনা নিয়ে আসতে পারেন। হযরত যায়েদ (রাঃ) "বাতনে ইয়াজুজ" নামক স্থানে অবস্থান নেন। কিনানাহ্ হযরত যয়নব (রাঃ)-কে এ স্থান পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে মক্কা চলে যান এবং সেখান থেকে হযরত যায়েদ (রাঃ) হযরত যয়নব (রাঃ)-কে মদীনা নিয়ে যান।

হযরত যয়নব (রাঃ) -এর মদীনা গমনের পর কুরাইশের একটি দল হযরত আবুল আছ (রাঃ)-এর নিকট এসে তাকে তালাক দেয়ার কথা বললো এবং পরিবর্তে কুরাইশের যে মহিলাকে সে পছন্দ করবে তার সাথেই তার বিয়ে দেবে বলে জানালো। হযরত আবুল আছ (রাঃ) জবাবে বললেন ঃ "আল্লাহর কসম! আমি যয়নবকে কক্ষণই পরিত্যাগ করেত পারবো না। কুরাইশের অন্য কোন মহিলা তার বরাবর হতে পারে না।" এতে কুরাইশরা ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে গেল।

www.amarboi.org

হযরত যয়নব (রাঃ)-এর প্রতি হযরত আবুল আছ (রাঃ)-এর ভালোবাসা ছিল অত্যন্ত গভীর। তিনি মদীনা চলে যাওয়ার পর থেকে হযরত আবুল আছ (রাঃ) নিরানন্দ এবং অশান্তিতে দিন কাটাতে লাগলেন। একবার হযরত আবুল আছ (রাঃ) সিরিয়া সফর করছিলেন। এ সময় খুব ব্যথিত স্বরে তিনি একটি কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। কবিতাটির ভাবার্থ হলো ঃ "আমি যখন এরম নামক স্থান অতিক্রম করছিলাম তখন যয়নবের কথা মনে পড়লো। হেরেমে অবস্থানকারী সে ব্যক্তিকে আল্লাহ চিরসবুজ রাখুক। আমিন (সাঃ)-এর কন্যাকে আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দিক এবং প্রত্যেক স্বামীই সে কথারই প্রশংসা করে যা সে ভালভাবে জানে।"

৬ষ্ঠ হিজরীতে এক বাণিজ্যিক কাফেলার সাথে হযরত আবুল আছ (রাঃ) সিরিয়া গমন করছিলেন। আইছ নামক স্থানে ইসলামের মুজাহিদদের একটি দল কাফিলার ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে সব ধন-সম্পদ কবজাহ করে নিল।

মুসলমানদের প্রত্যাবর্তনের পর হযরত আবুল আছ (রাঃ)-ও সোজা মদীনা মুনাওয়ারহ পৌঁছলেন এবং হযরত যয়নব (রাঃ)-এর নিকট গিয়ে আশ্রয় চাইলেন। নিশ্চিন্তে তিনি তাঁকে আশ্রয় দিলেন। ভোরে মুসলমানরা যখন নামায পড়ার জন্যে মসজিদে নববীতে এলো তখন হযরত যয়নব (রাঃ) উচ্চৈস্বরে বললেনঃ " হে মুসলমানরা ! আমি আবুল আছ বিন রবিকে আশ্রয় দিয়েছি।"

হুযুর (সাঃ) নামায থেকে ফারেগ হয়ে বললেন, "তোমরা কি কিছু শুনেছ?"

সবাই আরজ করলেন, "আল্লাহর রাসূল, হ্যাঁ।"

হুযুর (সাঃ) বললেন, "আল্লাহর কসম! এর আগে এ ঘটনা আমি জানতাম না এবং আশ্রয় দানের অধিকারতো প্রতিটি নগণ্য মুসলমানেরই রয়েছে।"

এরপর নবী করীম (সাঃ) ঘরে তাশরীফ নিলেন। এ সময় হযরত যয়নব আবুল আছ (রাঃ) -এর মাল ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে সুপারিশ করলেন। হযরত আবুল আছ (রাঃ) মক্কায় হযরত যয়নব (রাঃ)-এর সাথে ভালো ব্যবহার করেছিলেন। এ জন্যে হুযুর (সাঃ) তাকে সম্মান করতেন। তিনি সাহাবী (রাঃ)-দের বললেন ঃ "তোমরা আমার এবং আবুল আছ (রাঃ)-এর আত্মীয়তার ব্যাপারটি অবগত আছ। যদি তোমরা তার মাল ফিরিয়ে দাও তাহলে এটা তোমাদের ইহসান হবে এবং আমি খুশী হবো। আর যদি না দাও তাহলে এ মাল হবে আল্লাহর উপহার এবং তাতে তোমাদেরই অধিকার রয়েছে। তাতে আমার কোন প্রশ্ন বা পীড়াপীড়ি নেই।

সাহাবায়ে কিরামতো সব সময় রাসূল (সাঃ)-এর সন্তুষ্টিই চাইতেন।



www.amarboi.org

অবিলম্বে তারা সকল মাল ও আসবাব হযরত আবুল আছ (রাঃ)-কে ফিরিয়ে দিলেন। তিনি তা নিয়ে মক্কা পৌঁছলেন এবং সকল লোককে তাঁর নিকট রক্ষিত আমানত ফিরিয়ে দিলেন। অতপর মক্কাবাসীদেরকে সম্বোধন করে বললেন : "হে কুরাইশরা! এখন আমার জিম্মায় কারো কোন আমানত অথবা মালতো নেই?"

মক্কার সকল লোক একবাক্যে বললো : "অবশ্যই নয়। খোদা তোমাকে ভালো করুন। তুমি একজন নেক্কার এবং বিশ্বাসী মানুষ।"

হযরত আবুল আছ (রাঃ) তাদের জবাব শুনে বললেন, "তাহলে শুনে নাও; আমি মুসলমান হচ্ছি। আল্লাহর কসম। তোমরা আমাকে খিয়ানতকারী মনে না কর এ ভেবেই শুধু আমি মুসলমান হইনি।" একথা বলেই কালেমায়ে শাহাদাত পড়লেন এবং তারপর মক্কা থেকে হিযরত করে মদীনা চলে এলেন। এটা সপ্তম হিজরীর মুহাররাম মাসের ঘটনা।

মদীনা পৌঁছেই হযরত আবুল আছ (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বাকায়দাহ ঈমান আনলেন। হযরত আবুল আছ (রাঃ) -এর ইসলাম গ্রহণের পর হুযুর (সাঃ) হযরত যয়নব (রাঃ)-এর সাথে নতুন করে বিয়ে দিয়েছিলেন কি? এ সম্পর্কে দু'ধরনের রাওয়ায়েত পাওয়া যায়। প্রথম হলো, নতুন করে বিয়ে দেননি। প্রথম আকদ অনুসারেই তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় রাওয়াত হলোঃ হযরত যয়নব (রাঃ) এবং হযরত আবুল আছের মধ্যে শিরকের কারণে বিচ্ছিন্নতা এসেছিল । এ জন্যে নবী করিম (সাঃ) হযরত আবুল আছ (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের পর হযরত যয়নব (রাঃ)-কে প্রথম দফা নির্ধারিত মহরানায় দ্বিতীয় বার বিয়ে দেন এবং হযরত আবুল আছ (রাঃ) -এর বাড়ী পাঠিয়ে দেন।

হযরত আবুল আছ (রাঃ) মক্কায় বিরাট ব্যবসা এবং কারবার ছেড়ে এসেছিলেন এবং তাঁর সুন্দর লেনদেন, আমানত ও দিয়ানতের কারণে মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও মুশরিকরা তাঁকে মক্কায় অবস্থানে বাধা দেয়নি। বস্তুতঃ তিনি রাসূল (সাঃ)-এর অনুমতি নিয়ে পুনরায় মক্কা চলে এলেন এবং আগের মত যথারীতি ব্যবসায়ে নিমগ্ন হলেন। মক্কায় অবস্থানের কারণে যুদ্ধে অংশ গ্রহণের সুযোগ তাঁর হয়নি।

হযরত ইবনে হাজর (রঃ)-এর বর্ণনা অনুযায়ী তিনি শুধুমাত্র একটি যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। ১০ হিজরীতে প্রিয় নবী (সাঃ) হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর নেতৃত্বে একটি বাহিনী ইয়েমেন প্রেরণ করেন। এক রাওয়ায়েতে আছে

www.amarboi.org

যে, হযরত আলী (রাঃ) ইয়েমেন থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় হযরত আবুল আছ (রাঃ)-কে সেখানকার গভর্ণর বানিয়ে দিয়েছিলেন।

হযরত আবুল আছ (রাঃ)-এর স্ত্রী হযরত যয়নব (রাঃ) বিনতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অষ্টম হিজরীতে ওফাত পান। তাঁর ইন্তিকালে হযরত আবুল আছ (রাঃ) শোকে কাতর হয়ে পড়েন। কিন্তু অত্যন্ত ধৈর্যের পরিচয় দেন এবং সন্তানদের লালন-পালনে মশগুল হয়ে পড়েন। হযরত যয়নব (রাঃ)-এর ইন্তিকালের পর তিনি অন্য কোন মহিলাকে বিয়ে করেননি। এমনিভাবে তিনি তাঁর প্রতি নিবেদিত প্রাণ ছিলেন।

হাফিজ ইবনে আবদুল বার (রঃ) "আল-ইসতিয়াব" গ্রন্থে লিখেছেন, ১৩ হিজরীর যিলহজ্ব মাসে হযরত আবুল আছ (রাঃ) ইন্তিকাল করেন। কিন্তু তারিখে ইবনে মানদাহ ওয়াল আকমাল গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত আবুল আছ (রাঃ) হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)-এর খিলাফতকালে ধর্মদ্রোহীদের উৎখাতে পুরোপুরি অংশ নিয়েছিলেন এবং মুসায়লামাহ কাজ্জাবের বিরুদ্ধে ইয়ামামার লড়াইয়ে বীরত্বের সাথে লড়াই করতে করতে শাহাদাতের পিয়ালা পান করেন। (এ ব্যাপারে আল্লাহই ভালোজানেন)।

হযরত যয়নব (রাঃ)-এর গর্ভে হযরত আবুল আছ ( রাঃ)-এর দু' সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। ছেলেটির নাম ছিল আলী (রাঃ) এবং মেয়ের নাম ছিল উমামাহ (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ) বিন আবুল আছ (রাঃ) রাসূলে (সাঃ)-এর সবচেয়ে বড় নাতি ছিলেন এবং তিনি তাকে খুব স্নেহ করতেন। তার ব্যাপারে তিন ধরনের রাওয়ায়েত পাওয়া যায়। প্রথম হলো তিনি শৈশবেই মারা যান। দ্বিতীয় রাওয়ায়েত হলো তিনি মায়ের দুধ পানের দু' বছর বনি গাজিরাহ গোত্রে কাটান। দুধ পানের সময় শেষ হলে রাসূল্লাহ (সাঃ) তাকে মদীনা মুনাওয়ারাহ চেয়ে নেন এবং স্বয়ং তার লালন-পালন করেন। তিনি হযরত যয়নব (রাঃ) এবং হযরত আবুল আছ (রাঃ)-এর নিকট থেকে তাকে চেয়ে নিয়ে ছিলেন। মক্কা বিজয়ের সময় রাসূল (সাঃ)-এর উটের ওপর তাঁর পিছনে এ আলী (রাঃ)-ই বসেছিলো। সে সময় তার বয়স ছিল ১৪-১৫ বছর।

পিতার জীবদ্দসায় যৌবনকালে তিনি মারা যান।

তৃতীয় রাওয়ায়েত হলো, তিনি ইয়ারমুকের যুদ্ধে (১৫ হিজরী) শাহাদাতের পিয়ালা পান করেন।

হযরত উমামাহ (রাঃ) বিনতে আবুল আছ (রাঃ) দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে খুব ভালোবাসতেন। একবার নাজ্জাশী (হাবশার বাদশাহ) একটি

www.amarboi.org

আংটি হুযুর (সাঃ)-কে তোহফা হিসেবে প্রেরণ করেছিল। এ আংটি পেয়ে তিনি বললেন ঃ "যে আমার নিকট সব চেয়ে প্রিয় তাকেই এ আংটি দেব।"

এ কথা যারা শুনেছিল তাদের ধারণা হয়েছিল যে, তিনি আংটিটি হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহ (রাঃ)-কে দেবেন। কিন্তু তার লক্ষ্য ছিল ছোটদের প্রতি। সুতরাং তিনি হযরত উমামাহ (রাঃ)-কে ডাকলেন এবং তার আঙ্গুলে পরিয়ে দিলেন। অন্যান্য রাওয়ায়েতে আংটির পরিবর্তে স্বর্ণের হারের কথা উল্লেখ রয়েছে। হারটি কেউ তোহফা হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন। হুযুর (সাঃ) হযরত উমামাহ (রাঃ)-কে ডেকে এ হার তার গলায় পরিয়ে দিয়েছিলেন।

সহিহ বুখারী শরীফে আছে যে, হুযুর (সাঃ) হযরত উমামাহ (রাঃ)-কে এত অধিক স্নেহ করতেন যে, তিনি তাকে কোন কোন সময়ে মসজিদে নিয়ে যেতেন। একদিন তিনি তাঁকে কাঁধের ওপর চড়িয়ে মসজিদে উপস্থিত হলেন। তিনি এ অবস্থাতেই নামায পড়া শুরু করলেন। যখন রুকূ ও সিজদায় যেতেন তখন শিশু উমামা (রাঃ)-কে আস্তে কাঁধ থেকে নামিয়ে দিতেন যখন দাঁড়াতেন তখন পুনরায় কাঁধের ওপর বসিয়ে দিতেন। এভাবেই তিনি পুরো নামায আদায় করতেন।

অষ্টম হিজরীতে হযরত যয়নব (রাঃ) ওফাত পেলে হযরত উমামাহ (রাঃ) নানা (সাঃ)-এর অভিভাবকত্বে আসে। হুযুর (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর পিতা হযরত আবুল আছ তাঁর অভিভাবক হন। তিনি মৃত্যুর (শাহাদাত) পূর্বে হযরত উমামাহ (রাঃ)-কে হযরত যোবায়ের (রাঃ)-এর বিন আওয়ামের (মামাতো ভাই) অভিভাবকত্বে প্রদান করেন। হযরত ফাতিমাতুজ জোহরা (রাঃ)-এর ইন্তেকালের পর তার ওছিয়ত মোতাবেক এবং হযরত যোবায়ের (রাঃ)-এর ইঙ্গিতে হযরত আলী (রাঃ) হযরত উমামাহ (রাঃ)-কে বিয়ে করেন। ৪০ হিজরীতে হযরত আলী (রাঃ) শাহাদাত প্রাপ্ত হলে মুগিরাহ বিন নওফিল (রাঃ) তাকে নিকাহ করেন এবং তাঁর জীবদ্দশাতেই ওফাত পান। কতিপয় রাওয়াত অনুসারে হযরত উমামাহ (রাঃ)-এর কোন সন্তান হয়নি। অনেকে বলেছেন, মুগিরাহর ঔরষে ইয়াহিয়া নামক এক পুত্র জন্ম নিয়েছিল।

www.amarboi.org

# হযরত ইয়াযিদ (রাঃ) বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ)

হযরত আবু খালিদ ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ) একজন বাহাদুর মানুষ ছিলেন। বাতিলের মুকাবিলায় তিনি ছিলেন ইস্পাত কঠিন মনের অধিকারী। তরবারীর ঝনঝনানি দিয়ে তিনি রচনা করেছিলেন ইসলামের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়। কুরাইশের সম্ভ্রান্ত শাখা বনু উমাইয়ার সাথে তিনি ছিলেন সম্পৃক্ত। তিনি কুরাইশের সেনাপতি আবু সুফিয়ান (রাঃ)-এর (বিন হারব বিন উমাইয়াহ বিন আবদি শামস বিন আবদি মান্নাফ বিন কুসাই) প্রিয় পুত্র ছিলেন। চরিতকাররা বলেছেন, আবু সুফিয়ান (রাঃ)-এর সব পুত্রের মধ্যে তিনি ছিলেন যোগ্য বাহাদুর, দরাজ দিল, এবং সুন্দর চরিত্রের অধিকারী। এ জন্যে মক্কাবাসীদের মধ্যে তিনি ইয়াযিদুল খায়ের উপাধিতে মশহুর হয়েছিলেন। উম্মুল মুমিনিনি হযরত 'উম্মে হাবিবাহ (রাঃ) হযরত ইয়াযিদ (রাঃ)-এর বৈমাত্রিয় (মা'র দিক থেকে সতালো) বোন ছিলেন। এভাবে তিনি প্রিয় নবী (সাঃ)-এর শ্যালক ছিলেন। আরবের বিজ্ঞজন আমীর মাবিয়া (রাঃ) তাঁর ছোট বৈমাত্রীয় ভাই ছিলেন। উম্মুল মুমিনিন হযরত উম্মে হাবিবাহ (রাঃ) নবী (সাঃ)-এর নবুয়াত প্রাপ্তির প্রথম যুগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আর এমনিভাবেই তিনি সাবিকুনাল আওয়ালুন অর্থাৎ প্রথম যুগের পবিত্র অগ্রগামী দলের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। অবশ্য হযরত ইয়াযিদ (রাঃ) পরিবারের অন্যান্য সদস্যের সাথে মক্কা বিজয়কালে (৮ম হিজরীর রামাদান মাস) ইসলাম গ্রহণ করেন। এ সত্ত্বেও তিনি জাহেলী যুগে মুসলমানদেরকে কখনো দুঃখ কষ্ট দেননি এবং নীচ বা হীন আচরণও করেননি।

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত ইয়াযিদ (রাঃ) সর্বপ্রথম হুনাইনের যুদ্ধে (৮ম হিজরীর শওয়াল মাসে) অংশগ্রহণ করেন। বিজয়ের পর প্রিয় নবী (সাঃ) গণিমতের মাল বন্টন করলেন। এ সময় তিনি ৪০টি স্বর্ণ অথবা রৌপ্যমুদ্রা এবং একশ উট তাকে দিলেন। হাফিজ ইবনে হাজার (রঃ) "আল-ইসাবাহ"-তে উল্লেখ করেছেন যে, হুনাইনের যুদ্ধের পর হুযুর (সাঃ) হযরত ইয়াযিদ (রাঃ)-কে বনি ফারাসের, আমীর নিয়োগ করেছিলেন।

হযরত ইয়াযিদ (রাঃ) বিন আবু সুফিয়ান বীরত্ব এবং ঔদার্যে নজীরবিহীন ছিলেন। কিন্তু তিনি অনেক বিলম্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ফলে নবী (সাঃ)-এর যুগে তিনি তাঁর তরবারীর শক্তিমত্তা প্রদর্শনের সুযোগ পাননি। বিশ্ব নবী (সাঃ)-এর ইন্তিকালের পর

www.amarboi.org

হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) খলিফা নির্বাচিত হলেন। এ সময় ধর্মদ্রোহিতার ফিতনা সমগ্র আরবকে গ্রাস করে নিয়েছিল। রাসূল (সাঃ)–এর খলিফা (রাঃ) সংকল্পে ছিলেন পাহাড়ের মত অটল। কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি সে ফিতনা উৎখাত করে ছাড়লেন। এরপর তিনি রোম এবং ইরানের দিকে মনোযোগ দিলেন। সর্বপ্রথম তিনি সিরিয়ায় সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি নিলেন। সে সময় সিরিয়া শাসন করতো রোমের বাদশাহ হিরাক্লিয়াস। হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) সমগ্র আরবে জিহাদের দুন্দুভি বাজিয়ে দিলেন। এ আহবানে সাড়া দিয়ে প্রত্যেক দিক থেকে মুজাহিদরা উৎসাহ–উদ্দীপনার সাথে মদীনা পৌছতে লাগলেন। যখন বহুসংখ্যক মানুষ একত্রিত হলো তখন হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) হযরত আবু ওবায়েদাহ (রাঃ) ইবনুল জাররাহ, হযরত ইয়াযিদ (রাঃ) বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ),হযরত শুরাহবিল (রাঃ) বিন হাসানাহ (রাঃ) এবং হযরত মায়াজ (রাঃ) বিন জাবাল আনসারীকে ডেকে পাঠালেন এবং তাদেরকে সম্বোধন করে বললেনঃ "আমি তোমাদের ওপর সিরিয়ার জিহাদের দায়িত্ব সমর্পণ করতে চাই। যত সৈন্য একত্রিত হবে তা পৃথক পৃথকভাবে তোমাদের নেতৃত্বে রওয়ানা করাবো। জিহাদের ময়দানে একত্রিত হলে তোমাদের প্রধান সেনাপতি হবে আবু ওবায়েদা (রাঃ) ইবনুল জাররাহ । সে যদি না থাকে তাহলে ইয়াযিদ (রাঃ) বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ) সমগ্র বাহিনীর নেতৃত্ব করবেন। এখন তোমরা যাও এবং সিরিয়া রওয়ানা হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ কর।" কয়েকদিন পর যখন আরো মুজাহিদ মদীনা পৌছলেন তখন হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) সেনানিবাসে তাশরীফ নিলেন এবং হযরত ইয়াযিদ (রাঃ) বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ)–কে ঝাণ্ডা প্রদানপূর্বক রওয়ানার নির্দেশ দিলেন। হযরত ইয়াযিদ (রাঃ) বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ) ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে মদীনা মুনাওয়ারাহ থেকে রওয়ানা হলেন। এ সময় হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) পায়ে হেঁটে তার সাথে কিছু দূর পর্যন্ত গেলেন। হযরত ইয়াযিদ (রাঃ) বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ) অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে আরজ করলেন, "হে রাসূল (সাঃ)–এর খলিফা! হয় আপনিও ঘোড়ায় সওয়ার হোন, অথবা আমাকে সওয়ার থেকে নেমে হেঁটে চলার অনুমতি দিন। আপনি হেঁটে চলবেন আর আমি ঘোড়ায় চড়ে যাবো। এটা হয় না।"

হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) বললেনঃ "আমিও ঘোড়ায় চড়বো না, তোমাকেও ঘোড়া থেকে নামতে দেবো না। আমি যত কদম হাঁটবো তা আল্লার রাস্তায় হাঁটবো এবং আল্লাহ তার প্রতিদান দেবেন বলে আশা করবো।"

কিছুদূর অগ্রসর হয়ে হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) হযরত ইয়াযিদ (রাঃ) বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ)–কে বিদায় জানালেন এবং এ ওসিয়ত করলেনঃ "আবু খালেদ! সিরিয়ার অনেক স্থানে তুমি দুনিয়াত্যাগী পাদরীদের সাক্ষাৎ পাবে। তাদেরকে নিজেদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দেবে এবং কোন কষ্ট দেবে না। যুদ্ধে তুমি এমন সব লোকের

www.amarboi.org

সামনা সামনি হবে যারা মাথার মধ্যখান থেকে চুল কাটে। তুমি এবং তোমার সাথীরা তাদের মাথার সেই স্থানেই তলোয়ার চালাবে। এছাড়া ১০টি ব্যাপারে বিশেষভাবে খেয়াল রাখবে। তাহলো মহিলা, শিশু এবং বৃদ্ধদের ওপর হাত তুলবে না। সবুজ বৃক্ষ কাটবে না, বস্তি বিরাণ করবে না, বিনা প্রয়োজনে বকরি এবং উট যবেহ করবে না, বৃক্ষে অগ্নি সংযোগ করবে না, কাউকে পানিতে ডুবিয়ে দেবে না, খেয়ানত করবে না এবং কাপুরুষতা প্রদর্শন করবে না।

এরপর তিনি হযরত ইয়াযিদ (রাঃ) বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ)-এর হাত ধরে মহাবাগুের আবেগে বললেন, "ইয়াযিদ তোমাকে আল্লাহর হাওয়ালা করছি। তোমার ওপর আল্লাহর রহমত এবং শান্তি বর্ষিত হোক। তুমি আমার প্রথম সেনাপতি। (মদীনা মুনাওয়ারাহ থেকে বিদায় হচ্ছে)।"

মদীনা মুনাওয়ারাহ থেকে বিদায় হয়ে হযরত ইয়াযিদ (রাঃ) বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ) অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হলেন। ইত্যবসরে হযরত খালিদ (রাঃ) বিন ওয়ালিদও ইরাকের অভিযানসমূহ শেষ করে তার নিকট পৌঁছে গেলেন এবং উভয়ে সম্মিলিতভাবে সীমান্তবর্তী শহর বসরাহর ওপর হামলা করে বসলো। দূররে নাজ্জার নামক রোমক সেনাপতি পাঁচ হাজার সৈন্যসহ মুসলমানের মুকাবিলা করলো। কিন্তু পরাজিত হয়ে পালিয়ে দুর্গে আশ্রয় নিল। অবশেষে জিযিয়া প্রদান এবং তার বিনিময়ে মুসলমানরা রোমকদের জানমালের নিরাপত্তা দানের শর্তে সে সন্ধি করলো।

হযরত ইয়াযিদ (রাঃ) বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ)-এর সিরিয়া আগমনের পর হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ), হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ), হযরত মায়াজ (রাঃ) বিন জাবাল ও হযরত শুরাহবিল বিন হাসানাহ (রাঃ)-কে সৈন্যসহ সিরিয়া রওয়ানা করে দিলেন। সেই সাথে আম্মানে অবস্থানরত আমর (রাঃ) ইবনুল আছকে সৈন্যসহ সিরিয়া পৌঁছার নির্দেশ দিলেন। এ সমগ্র বাহিনী সিরিয়ার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়লো। অন্যদিকে রোমের বাদশাহ সিরিয়ায় মুসলমান বাহিনীর অগ্রযাত্রার খবর পেল। খবর পেয়ে সে এক বিরাট বাহিনী মুসলমানদের মুকাবিলার জন্যে প্রেরণ করলো। এ বাহিনী ফিলিস্তিনের আজনাদাইন নামক স্থানে এসে তাঁবু ফেললো (ফিলিস্তিন সে যুগে সিরিয়ারই একটি অংশ ছিল)। রোমক বাহিনীর নেতৃত্ব সরদার তাজারক এবং কাবকালার নামক দু'জন নামকরা জেনারেল দিচ্ছিলো। মুসলমানরাও রোমকদের সৈন্য সমাবেশের কথা অবহিত হয়ে চারদিক থেকে একত্রিত হয়ে আজনাদাইন পৌঁছে গেল। হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ) ইবনুল জাররাহ, হযরত খালিদ (রাঃ) বিন ওয়ালিদ

www.amarboi.org

হযরত ইয়াযিদ (রাঃ) ইবনুল আবু সুফিয়ান (রাঃ), হযরত শুরাহ বিল (রাঃ) বিন হাসানাহ (রাঃ) এবং হযরত আমর (রাঃ) ইবনুল আছ মুসলমানদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। ইবনে ইসহাকের বর্ণনা মতে ১৩ হিজরীর ২৮শে জমাদিউল আউয়াল রোমক এবং মুসলমানদের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হলো। রোমকরা জীবনবাজি রেখে যুদ্ধ করলো, কিন্তু আবেগ উদ্দীপ্ত মুসলমানদের দ্রুত ও শাণিত হামলার সামনে তারা তিষ্টাতে পারছিল না এবং অবিলম্বে তাদের ওপর পরাজয়ের আলামত পরিস্ফুট হয়ে উঠলো। তাজারক ও কাবকালার নিজের বাহিনীকে খুব করে উৎসাহ দিলো এবং দীর্ঘক্ষণ হাল ধরে রাখলো। কিন্তু উভয়েই যখন মুসলমান জানবাজদের তরবারীর খোরাক হয়ে গেল তখন রোমকরা হিম্মতহারা হয়ে পড়লো এবং যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে গেল। এ যুদ্ধে তিন হাজার মুসলমান শাহদাতের পিয়ালা পান করলেন। অন্যদিকে রোমকদের নিহতের সংখ্যা এর চেয়ে অনেক বেশী ছিল।

ঐতিহাসিক ইবনে হিশাম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আজনাদাইনের শহীদদের মধ্যে হযরত আমর (রাঃ) ইবনুল আছের সহোদর হযরত হিশাম (রাঃ) ইবনুল আছও ছিলেন।

আজনাদাইনের যুদ্ধের পর মুসলমানরা সিরিয়ার সদর স্থান দামেস্কের দিকে অগ্রসর হলো এবং চারিদিক থেকে দামেস্ক অবরোধ করলো। শহরটির বড় বড় দরজায় সিরিয়ার বিভিন্ন প্রদেশ করতলগত করার জন্যে আগত অফিসারদের নিয়োজিত করা হলো। বস্তুত হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ) ইবনুল জাররাহ বাবুল জাবিয়াহতে, হযরত শুরাহবিল (রাঃ) বিন হাসানাহ (রাঃ) বাবুল ফারাদিসে, হযরত আমর (রাঃ) ইবনুল আছ বাবে তুমায়, হযরত খালিদ (রাঃ) বিন ওয়ালিদ বাবুশ শারকে এবং হযরত ইয়াযিদ (রাঃ) বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ) বাবে কিসানে নিয়োজিত হলেন।

এ অবরোধ দীর্ঘদিন পর্যন্ত (এক বর্ণনা অনুসারে ৬ মাস পর্যন্ত) অব্যাহত থাকলো। এ সময় হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) ওফাত পেলেন এবং হযরত ফারুক (রাঃ) খলিফা নির্বাচিত হলেন। তিনি এক পত্রের মাধ্যমে হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ)-কে সিদ্দিকে আকবর (রাঃ)-এর মৃত্যুর খবর দিলেন। যে দূত এ পত্র নিয়ে গিয়েছিলেন তাকে তিনি হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ)-এর নিকট থেকে বিশেষভাবে হযরত খালিদ (রাঃ) বিন ওয়ালিদ, হযরত ইয়াযিদ (রাঃ) বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ), হযরত আমর (রাঃ) ইবনুল আছ, হযরত সাঈদ (রাঃ) বিন যায়েদ এবং হযরত মায়াজ (রাঃ) বিন জাবালের অবস্থা জিজ্ঞেস

www.amarboi.org

করার তাকিদ দিয়েছিলেন। বিশ্লেষণের পর হযরত আবু ওবায়াদাহ (রাঃ) তাকে বললেন, এ সব ব্যক্তিত্ব নিজেদের রীতিনীতি এবং মুসলমানদের শুভ কামনায় তেমনি রয়েছেন যেমন তারা আমার এবং ওমর (রাঃ)–এর নিকট হওয়া উচিত। ছ'মাস অবরুদ্ধ থাকার পর দামেস্কের রোমক বাহিনীকে অস্ত্র সমর্পণে বাধ্য হতে হলো। কেননা, এক রাতে তাদের গাফলতির সুযোগ নিয়ে হযরত খালিদ (রাঃ) বিন ওয়ালিদ কতিপয় জীবন উৎসর্গকারীসহ শহরের প্রাচীরের ওপর চড়ে বসলেন। অভ্যন্তরের দিকে নেমে শহরের দরজা খুলে দিলেন। এদিকে ইসলামী বাহিনী প্রস্তুত ছিল। বানের পানির মত তারা শহরে ঢুকে পড়লো। রোমকরা সাধারণভাবে বাধা দিল। কিন্তু অবশেষে অস্ত্র ফেলে দিয়ে সন্ধির প্রস্তাব করে বসলো। হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ) তাদের ওপর জিযিয়া আরোপ করে সন্ধি মঞ্জুর করলেন।

দামেস্কের বিজয়ের কারণে রোমকরা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লো এবং প্রত্যেক দিক থেকে একত্রিত হয়ে পুরো শক্তি সঞ্চয় করে মুসলমানদের মুকাবিলার জন্যে অগ্রসর হলো। আল্লামা তাবারী (রঃ)–এর বর্ণনা অনুযায়ী ৪০ হাজার (অন্য বর্ণনায় ৮০ হাজার) রোমক হাইকালার নামক এ প্রখ্যাত জেনারেলের নেতৃত্বে জর্দানের বিসান শহরে তাঁবু ফেললো। হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ) পরিস্থিতি অবগত হয়ে নিজেও সৈন্যসহ জর্দানের দিকে অগ্রসর হলেন এবং বিসানের বিপরীত ফাহাল নামক স্থানে তাঁবু ফেললেন। রোমকরা প্রথমে দূত প্রেরণ করে হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ)–কে এ মর্মে প্রস্তাব পেশ করলো যে, যদি মুসলমানরা ফিরে যায় তাহলে তাদের প্রত্যেক সৈন্যকে দু' আশরাফী (স্বর্ণ মুদ্রা) করে দেয়া হবে। হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) তাদের এ প্রস্তাব তাচ্ছিল্য সহকারে প্রত্যাখ্যান করলেন এবং যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ালো। দূত ফিরে যাওয়ার পরদিন উভয় বাহিনীর মধ্যে রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হলো। রোমকরা জীবন দিয়ে মুকাবিলা করলো। কিন্তু মুসলমান জীবন উৎসর্গকারীরা অবিলম্বে তাদের ব্যূহ তুলো ধুনা করে ছাড়লো। অবশেষে তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পালিয়ে গেল।

এ যুদ্ধের পর জর্দানের অন্যান্য সকল শহর এবং স্থান সহজেই বিজিত হলো। আল্লামা বালাজুরী (রঃ) "ফতুহল বুলদান" গ্রন্থে লিখেছেন যে, জর্দান বিজয়ের পর হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ) ইবনুল জাররাহ হযরত ইয়াযিদ (রাঃ) বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ)–কে উপকূলবর্তী এলাকায় প্রেরণ করলেন। তিনি হযরত আমর (রাঃ) ইবনুল আছের সাথে মিলিত হয়ে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময়ে তা করতলগত করলেন।

www.amarboi.org

জর্দান এবং উপকূলীয় এলাকা পদানত করার পর হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ) হেমস অভিমুখে রওয়ানা হলেন। এ সময় তিনি হযরত ইয়াযিদ (রাঃ) বিন আবি সুফিয়ান (রাঃ)-কে দামেস্কে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে রেখে গেলেন।

রোমের বাদশাহ হিরাক্লিয়াস এ মর্মে খবর পেল যে, মুসলমানরা হেমসের ওপর হামলা করতে চায়। এ খবর পেয়ে সে জেনারেল তুজারের নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী বাহিনী দামেস্কের দিকে রওয়ানা করে দিল। যাতে সে মুসলমানদেরকে হেমসের দিকে অগ্রসর হওয়া থেকে বিরত রাখতে পারে। অন্য দিকে সম্ভব হলে দামেস্ক কবজা করে নেবে। তুজার দামেস্কের পশ্চিমে মারজুর রুম নামক স্থানে তাঁবু ফেললো। হিরাক্লিয়াস তার সাহায্যার্থে আরো একটি বাহিনী রওয়ানা করে দিল। এ বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল সানাছ নামক এক রোমক জেনারেল। হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ) তুজারের মুকাবিলার জন্যে হযরত খালিদ (রাঃ) বিন ওয়ালিদকে নিয়োগ করলেন এবং সানাছের মুকাবিলার জন্যে নিজে অগ্রসর হলেন।

হযরত ইয়াযিদ (রাঃ বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ) দামেস্কে চুপচাপ বসে ছিলেন না। বরং পরিস্থিতির ওপর কড়া দৃষ্টি রাখছিলেন। তিনি তুজারের অভিপ্রায়ের কথা জানতে পেরে একদিন নিজের বাহিনীসহ দামেস্ক থেকে বের হলেন এবং তার মাথার ওপর গিয়ে পৌছুলেন। সে-ও লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুত ছিল। উভয় বাহিনী যুদ্ধ ধ্বনি দিতে দিতে পরস্পরের ওপর হামলা করে বসলো। ঘোরতর লড়াইয়ের সময় হযরত খালিদ (রাঃ) বিন ওয়ালিদও নিজের বাহিনীসহ পৌছে গেলেন। তিনি রোমকদের পিছন দিক থেকে হামলা করে বসলেন। এভাবে উভয় দিক থেকে ইসলামী বাহিনী রোমকদের নাস্তানাবুদ করে ফেললো। অন্যদিকে হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ) সানাছ বাহিনীকে পরাজিত করলেন এবং সামনে অগ্রসর হয়ে হেমস ঘেরাও করে নিলেন। হেমসবাসীরা অবিলম্বে আনুগত্য স্বীকার করলো। এরপর হুমাত, শিজার, মুয়াররাতুন, নুমান এবং লাজাকিয়াহও একের পর এক পদানত হলো।

একের পর এক পরাজয়ের কারণে রোমক বাদশাহ অত্যন্ত বিচলিত হলো। এ জন্য সিরিয়ার প্রতিটি স্থান থেকে মুসলমানদেরকে বিতাড়িত করার জন্যে সে ইন্তাকিয়ায় বিরাট সৈন্য সমাবেশ ঘটানোর সংকল্প করলো। এ বাহিনীতে বড় বড় অভিজ্ঞ সৈন্য এবং অফিসার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা যখন ইন্তাকিয়া থেকে রওয়ানা হলো তখন চারদিকে সাড়া পড়ে গেল। রোমাকদের এ হামলা প্রস্তুতির কথা হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ) জানতে পেরে পরামর্শ পরিষদের বৈঠক আহবান করলেন। বৈঠকে মুসলমান দখলীকৃত শহরসমূহ থেকে সৈন্য অপসারণ

www.amarboi.org

করে এক স্থানে সমবেত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। সিদ্ধান্তটি ছিল অত্যন্ত সুবিবেচনা প্রসূত এবং প্রজ্ঞাসম্পন্ন। কারণ এ পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র এভাবেই ভয়ারহ রোমক শক্তির মুকাবিলা সম্ভব ছিল। অধিকৃত হেমস, দামেস্ক প্রভৃতি শহর পরিত্যাগের সময় মুসলমানরা এত উন্নতমানের চারিত্রিক গুণাবলী প্রদর্শন করেছিল যা বিশ্ব ইতিহাসে এক নজীরবিহীন ঘটনা। আল্লাহর এ সব পবিত্র বান্দারা অধিকৃত শহর পরিত্যাগের সময় সেখানকার বাসীন্দাদেরকে জিযিয়ার অর্থ এ বলে ফেরত দিয়েছিলেন যে, বর্তমান অবস্থায় তারা আর তাদের নিরাপত্তা বিধান করতে পারছেন না। এ জন্যে জিযিয়া গ্রহণ তাদের জন্যে অবৈধ। মুসলমানদের এ কাজে খৃষ্টান এবং ইহুদীরা অত্যন্ত প্রভাবান্বিত হলো এবং চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে আল্লার নিকট তারা যেন ফিরে আসে এ দোয়া করেছিলো।

মুসলমানরা সিরিয়ার অধিকৃত শহরগুলো পরিত্যাগ করে ইয়ারমুক পৌছলো এবং সেখানে মজবুতভাবে অবস্থান নিল। এখানেই সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধ হয়েছিল এবং সিরিয়ার ভাগ্য স্থির হয়ে গিয়েছিল। ইসলামী বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল সর্বমোট ৩০ থেকে ৪০ হাজার। এর মোকাবিলায় রোমক সৈন্য সংখ্যা ছিল ২ থেকে ৩ লাখ। প্রথমে উভয় পক্ষ থেকে দূত বিনিময় শুরু হলো। রোমক সেনাপতি বাহান চাইলো যে মুসলমানরা অর্থ নিয়ে ফিরে যাক। কতিপয় ঐতিহাসিকের বর্ণনা মতে মুসলমান সেনাপতি দশ হাজার, প্রত্যেক অফিসার এক হাজার এবং প্রত্যেক সৈন্যকে সে একশ' দিনার দানের প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু মুসলমানরা এ প্রস্তাব গ্রহণ করলো না এবং যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। ইসলামী বাহিনীর সৈন্য ব্যুহের বামদিকের অফিসার ছিলেন হযরত ইয়াযিদ (রাঃ) বিন আবু সুফিয়ান। তিনি চরম বাহাদুরীর সাথে লড়াই করলেন। রোমকরাও প্রাণপণ লড়াই করলো এবং কয়েকবার মুসলমানদের ব্যুহ বিশৃংখল করে ফেললো। একবার তো তারা মুসলমানদেরকে হটাতে হটাতে মহিলাদের তাঁবু পর্যন্ত পৌছে গেল। ইসলামের মর্যাদাবান মহিলারা এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে তাঁবুর বাইরে এসে গেলেন এবং তাঁবুর খুঁটি উচিয়ে রোমকদের ওপর হামলা করে বসলো। সে সময় হযরত আমর (রাঃ) বিন আবু সুফিয়ান, হযরত ইয়াযিদ (রাঃ) বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ), হযরত আমর (রাঃ) ইবনুল আস, হযরত সাঈদ (রাঃ) বিন যায়েদ, হযরত শুরাহবিল (রাঃ) বিন হাসানাহ (রাঃ) এবং হযরত কুবাছ (রাঃ) বিন আশিম এমন অকুতোভয়ে লড়াই করছিলেন যে, দুনিয়ার কোন কিছু সম্পর্কেই আর হুশ ছিল না। হঠাৎ করে হযরত ইয়াযিদ (রাঃ)-এর পিতা হযরত আবু সুফিয়ান সেদিকে এলেন। তিনি পুত্রকে

www.amarboi.org

ডেকে বললেন প্রাণাধিক পুত্র। এ সময় একজন সিপাহী বাহাদুরীর চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করছে। তুমি মুসলমানদের একজন সেনাপতি। সৈন্যদের তুলনায় তোমার ওপর বাহাদুরী প্রদর্শনের দায়িত্ব বেশী। আল্লাহকে বেশী ভয় কর। সব অবস্থাতেই তাঁর ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখ। তোমার সাথীদের মধ্যে তোমারই বেশী আখিরাতের সাফল্যের প্রচেষ্টা চালানো উচিত। যুদ্ধের মুসিবতসমূহ বরদাশত করছো। আজ যদি তোমার সৈন্যের মধ্য থেকে একজনও তোমার ওপরে বাজী নিয়ে যায় তাহলে তা হবে তোমার জন্যে অত্যন্ত লজ্জাকর ব্যাপার।"

হযরত ইয়াযিদ (রাঃ) প্রথম থেকেই বীর বিক্রমে যুদ্ধ চালাচ্ছিলেন। পিতার হুংকারে তিনি আরো বাহাদুরীর সাথে যুদ্ধ করতে লাগলেন। ইত্যবসরে কায়েস (রাঃ) বিন হাবিরাহ একটি সৈন্যদলসহ বিদ্যুৎবেগে রোমকদের পিছন থেকে হামলা করে বসলো। এ রণকৌশলে শত্রু বাহিনীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি হলো এবং তারা দিগ্বিদিকভাবে পলায়ন করলো। মুসলমানরা অনেক দূর পর্যন্ত রোমকদের ধাওয়া করে স্থানে স্থানে লাশের স্তূপ করেরাখলো।

এ যুদ্ধে মুসলমানদের পূর্ণ সফলতা এলো। আর এ যুদ্ধই সিরিয়ার ভাগ্যের প্রায় ফায়সালা করে দিয়ে দিল। হিরাক্লিয়াস পালিয়ে কাসতানতুনিয়া চলে গিয়েছিল। আর কোন দিন সিরিয়ার মাটিতে তার পা রাখার ভাগ্য হয়নি। এখন শহরের পর শহর দখলে আসতে লাগলো। এবং সিরিয়ার বেশীরভাগ অংশই মুসলামানদের করতলগত হলো। অতঃপর মুসলমানরা বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে অগ্রসর হলেন। এবং তা অবরোধ করা হলো। হযরত ওমর (রাঃ)–এর উপস্থিতিতে লিখিত সন্ধির ভিত্তিতে মুসলমানরা বাইতুল মুকাদ্দাস দখল করলেন।

বাইতুল মুকাদ্দাস অবস্থানকালে একদিন হযরত ইয়াযিদ (রাঃ) বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)–কে বললেন, "আমীরুল মু'মিনীন, এখানে আমরা সবকিছুই পাচ্ছি। আল্লাহর রহমতে মুসলমানরা এখন সচ্ছল। আপনি যদি ভালো কাপড় পরিধান করেন, ভালো সওয়ারীতে সওয়ার হন এবং মুসলমানদেরকেও তা ব্যবহারের অনুমতি দেন তাহলে অন্যান্যের দৃষ্টিতে আপনার ও মুসলমানদের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে।"

হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, "না, এযিদ। আমি আমার সাদাসিধে জীবন পরিত্যাগ করবো না। আমি এটা চাই না যে, রোমকদের দৃষ্টিতে আমার ইজ্জত বৃদ্ধি পাক। আর আল্লার দরবারে আমার সম্মান কমে যাক।"

www.amarboi.org

হযরত ইয়াযিদ (রাঃ) চুপ হয়ে গেলেন এবং আমিরুল মুমিনীন (রাঃ) শেষ পর্যন্ত সাদাসিধে জীবনে অটল ছিলেন। তার এ সরল জীবন যাপন খৃষ্টানদেরকে প্রভূতভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল। সন্ধিনামা স্বাক্ষরের কিছুদিন পর হযরত ওমর (রাঃ) মদীনা চলে গেলেন। ১৮ হিজরীতে ইসলামী বাহিনীতে মহামারী আকারে প্লেগ রোগ দেখা দিল। তাতে হাজার হাজার মুসলমান মৃত্যুমুখে পতিত হলো। তাদের মধ্যে সিরীয়ার আমীর হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ) ইবনুল জাররাও ছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) এ খবর পেয়ে হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ)–এর স্থলে হযরত ইয়াযিদ (রাঃ) বিন অবু সুফিয়ান (রাঃ)–কে সিরিয়ার গবর্ণর নিয়োগ করলেন এবং অবিলম্বে কাইসারিয়ার অভিযানে রওয়ানা হয়ে যাওয়ার জন্যে তাকে নির্দেশ দিলেন। হযরত ইয়াযিদ (রাঃ) ১৭ হাজার মুজাহিদসহ কাইসারিয়া পৌঁছে শহর অবরোধ করলেন। অবরোধকালে তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেন এবং তাই আমীর মাবিয়া (রাঃ)–কে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে দামেস্কে ফিরে এলেন। ১৮ অথবা ১৯ হিজরীতে এখানেই তিনি আল্লার ডাকে সাড়া দিয়ে পরপারে চলে যান। এক বর্ণনায় আছে যে, তাঁর জীবদ্দশাতেই আমীর মাবিয়া (রাঃ) কাইসারিয়া দখল করে নেন এবং তাকে খবর দেন। তিনি হযরত ওমর (রাঃ)–কে এ বিজয়ের খবর দিয়েছিলেন। অন্য বর্ণনা অনুসারে আমীর মাবিয়া তার মৃত্যুর পর এ অভিযানে সফল হয়েছিলেন। যা হোক হযরত ইয়াযিদ (রাঃ) সিরিয়ার বিজয়সমূহের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিশেষ ভূমিকা পালন করেন এবং নিজের বীরত্ব ও ধৈর্যের আমোচনীয় ছাপ ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

www.amarboi.org

# হযরত ওবায়দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)

হযরত ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) উম্মার জ্ঞানের সাগর হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)–এর সহোদর ছিলেন। তিনি নবী (সাঃ)–এর হিজরতের একবছর পূর্বে (নবুয়ত প্রাপ্তির ১২ বছরে) জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম হাকিম "মুসতাদরাকে হাকিমে" লিখেছেন হযরত আব্বাস সন্তানদের মধ্যে তাকে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসতেন। বিশ্বনবী (সাঃ)–এর শ্রদ্ধেয় চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ)–এর সন্তানদেরকে খুব ভালেবাসতেন এবং তিনি তাদেরকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন।

প্রিয় নবী (সাঃ) বহুবার আবদুল্লাহ (রাঃ), ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) এবং কাছির (রাঃ)–কে ডেকে পাঠাতেন এবং তাদেরকে বলতেন, তোমাদের মধ্যে যে দৌড়ে সর্বপ্রথম আমাকে স্পর্শ করতে পারবে তাকে আমি অমুক জিনিস দেবো। তিন ভাই, দৌড়ে তাঁর দিকে যেতো। কেউ তাঁর বুকের ওপর চড়ে বসতো। কেউ পিঠের ওপর উঠে বসতো। তিনি সবাইকে বুকে জড়িয়ে ধরতেন এবং খুব আদর করতেন।

হযরত আব্বাস (রাঃ) ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের কিছুদিন পূর্বে নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন এবং পরিবার–পরিজনসহ মক্কা থেকে হিযরত করে মদীনা আগমন করেন। সে সময় হযরত ওবায়দুল্লাহ (রাঃ)–এর বয়স ৯ বছরের মত ছিল। তিনি নিজের ভাইদের সাথে সময় সময় রাসূল (সাঃ)–এর খেদমতে যেতেন এবং নবী (সাঃ)–এর ফয়েজ লাভ করতেন। রাসূল (সাঃ)–এর ওফাতের পর (১১ হিজরী) হযরত ওবায়দুল্লাহ (রাঃ)–এর পিতা হযরত আব্বাস (রাঃ) এবং মাতা হযরত উম্মুল ফজল যবাবাহ (রাঃ)–এর জ্ঞান ও ফজিলত থেকে উপকৃত হতে থাকেন। তিনি বড় ভাই হযরত আবদুল্লাহ বিন–আব্বাস (রাঃ)–এর জ্ঞানের গভীরতার খুব প্রশংসা করতেন। হাফিজ ইবনে আবদুল বার (রঃ) "আল–ইসতিয়াব" গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)–এর প্রসঙ্গে তাঁর এ মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেনঃ

"আমি আবদুল্লাহ বিন আব্বাস থেকে বড় সুন্নাহর আলেম, তাঁর থেকে বেশী সঠিক মতের এবং তাঁর চেয়ে বড় সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন কাউকেই দেখিনি।"

www.amarboi.org

তিনি নিজের এক পুত্র আবদুল্লাহ (রঃ)–কে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)–এর শাগরেদ বানিয়ে দিয়েছিলেন।

হযরত আলী (রাঃ) ৩৫ হিজরীতে খলিফা নির্বাচিত হলেন। এ সময় তিনি হযরত ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) বিন আব্বাস (রাঃ)–কে ইয়েমেনের গবর্ণর নিযুক্ত করলেন। অতঃপর ৩৬ ও ৩৭ হিজরীতে তাঁকে আমীরে হজ্ব নিয়োগ করেন এবং উভয় বছরেই তাঁর নেতৃত্বে হজ্ব কাজ সমাধা করা হয়।

৪০ হিজরীতে সিরিয়ার গবর্ণর আমীর মাবিয়া (রাঃ) বাছার বিন আবি আরতাতকে হেজাজ এবং ইয়েমেন দখলের জন্যে প্রেরণ করলেন। কোন বাধা ছাড়াই সে মক্কা–মুয়াজমা ও মদীনা–মুনাওয়ারা দখল করে নিলেন এবং ইয়েমেনের দিকে অগ্রসর হলেন। হযরত আলী (রাঃ)–এর পক্ষ থেকে এখানে হযরত ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) ইমারাতের দায়িত্ব পালন করছিলেন।

হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রাঃ) অত্যন্ত গোপনভাবে হযরত ওবায়দুল্লাহ (রাঃ)–কে খবর দিলেন যে, বাছার বিন আরতাত ইয়েমেনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ইয়েমেন দখল করে জনসাধারণের নিকট থেকে সে আমীর মাবিয়া (রাঃ)–এর বাইয়াত নেয়ার ইচ্ছা পোষণ করে। যারা বাইয়াত করার প্রশ্নে ইতস্তত অথবা বাধা দান করে সে তাদেরকে নির্দয়ভাবে হত্যা করে। হযরত ওবায়দুল্লাহ (রাঃ)–এর নিকট এত সৈন্যবল ছিল না যে, সে বাছার বিন আরতাতের মুকাবিলা করে। তিনি স্বয়ং খিলাফতের দরবারে গিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করাকেই সঠিক মনে করলেন। বস্তুতঃ তিনি আবদুল্লাহ বিন আবদুল মাদানকে ইয়েমেনে নিজের নায়েব বানিয়ে কূফা রওয়ানা হয়ে গেলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে বাছার ইয়েমেন দখল করে নিলো এবং হযরত আলী (রাঃ)–এর সমর্থকদের এক বিরাট অংশকে হত্যা করলো। হযরত ওবায়দুল্লাহ (রাঃ)–এর পরিবার–পরিজন ইয়েমেনেই ছিলেন। পাষাণ হৃদয় বাছার তাঁর অপ্রাপ্ত বয়স্ক দু'শিশুকে তাদের মায়ের সামনে ধরে হত্যা করলো। হযরত ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) নিজের নিষ্পাপ শিশুদের শাহাদাতের খবর পেয়ে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। কিন্তু অত্যন্ত ধৈর্য ও সাহসিকতার পরিচয় দিলেন এবং আল্লার সন্তুষ্টির নিমিত্তে মাথা নত করে নিলেন। হযরত আলী (রাঃ) বাছার বিন আরতাতের যুলুম–নির্যাতনের খবর পেলেন। তিনি তাকে উৎখাত করার জন্যে সৈন্য একত্রিত করতে শুরু করলেন। কিন্তু প্রস্তুতি শেষ না হতেই ইবনে মালজামের বিষ মাখা

www.amarboi.org

তীর তাঁকে শহীদ করে ফেললো। আর এ সাথেই শাসন ক্ষমতার বাগডোর উল্টে গেল। এ লোমহর্ষক ঘটনার পর হযরত ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) একাকীত্ব অবলম্বন করলেন এবং অবশিষ্ট জীবন চুপ চাপ কাটিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর বছর সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। অবশ্য হাফিজ ইবনে আবদুল বার (রঃ) "আল – ইসতিয়ার" গ্রন্থে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলেছেন যে, তিনি ৫৮ হিজরীতে পরপারে যাত্রা করেন।

হাদীসের কিতাবে হযরত ওবায়দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত কতিপয় হাদীস মওজুদ রয়েছে। এ সব হাদীস তিনি নিজের পিতা হযরত আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। হযরত ওবায়দুল্লাহ (রাঃ)–এর বর্ণিত হাদীসের সনদে তার সন্তান আবদুল্লাহ (রঃ) এবং মশহুর তাবেয়ী ইবনে সিরীন (রঃ) রয়েছেন।

নেতৃত্বস্থানীয় চরিতকাররা বর্ণনা করেছেন, হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) যেমন জ্ঞানের বাদশাহ ছিলেন তেমনি হযরত ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) বিন আব্বাস নজীরবিহীন দানশীল ছিলেন। তাঁর দস্তরখান অত্যন্ত প্রশস্ত ছিল। এখান থেকে প্রত্যেক গরীব, মিসকিন এবং অভাবী লোকের উপকৃত হওয়ার প্রকাশ্য অনুমতি ছিল। এভাবে অসংখ্য গরীব এবং মিসকিন তাঁর দস্তরখানে লালিত–পালিত হতো। প্রত্যেকদিন একটি করে উট জবেহ করা তাঁর একটি সাধারণ নিয়ম ছিল।

একবার হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) তাঁকে এত দাতাগিরী বন্ধের পরামর্শ দিয়ে বললেন, কতদিন পর্যন্ত আর এ বদান্যতা অব্যাহত রাখতে পারবেন? হযরত ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) ভাইকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু তাঁর এ পরামর্শ মোটেই পছন্দ হলো না। কেননা বদান্যতা এবং দাতাগিরী তাঁর চরিত্রের সাথে মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। যেদিন হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) তাঁকে সেই পরামর্শ দিয়েছিলেন সেদিন থেকেই তিনি দস্তরখানের জন্যে একটির পরিবর্তে দু'টি করে উট জবেহ করতে লাগলেন।

হযরত ওসমান জুন্নুরাইন (রাঃ)–এর শাহাদাতের পর হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু নিজের খিলাফতকালে দু'ভাইকে ভিন্ন ধরনের দায়িত্ব সমর্পণ করেন। এ সময় তাঁকে মদীনা মুনাওয়ারা অবস্থান ত্যাগ করতে হয়। এ সত্ত্বেও তিনি যখন মদীনায় একত্রিত হতেন তখন আবদুল্লাহ (রাঃ)–এর নিকট জ্ঞান পিপাসুদের ভীড় জমে যেত। পক্ষান্তরে হযরত ওবায়দুল্লাহ (রাঃ)–এর নিকট গরীব ও অভাবগ্রস্তদের লাইন পড়তো ইবনে আছির (রঃ) "উসদুল গাবাহ" গ্রন্থে তাঁর দানশীলতার এক

www.amarboi.org

চমকপ্রদ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। একবার হযরত ওবায়দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাঃ) নিজের গোলামসহ কোথায়ও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে সন্ধ্যা হয়ে গেল। নিকটেই এক বুদ্দুর ঘর দেখা গেল। গোলাম বললো, অন্ধকারে সফর করা ভীতির ব্যাপার। কোথাও আমরা রাস্তা ভুলে যেতে পারি। ঐ বুদ্দুর বাড়ীতে রাতে অবস্থান করাটাই যুক্তিযুক্ত। হযরত ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ। চলো, বাড়ীর মালিকের নিকট থেকে অনুমতি নেয়া যাক। উভয়েই বুদ্দুর নিকট গেলেন এবং বললেন, ভাই আজ রাতে আমরা তোমার মেহমান। হযরত ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) অত্যন্ত লম্বা দেহী ও সুদর্শন মানুষ ছিলেন। বুদ্দু নিজের অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অনুভব করতে পারলেন যে, নিশ্চয়ই সে কোন সম্মানিত ব্যক্তি। সে অত্যন্ত আনন্দ চিত্তে তাঁকে আহলান, সাহলান ও মারহাবা বা খোশ আমদেদ জানালেন এবং বাড়ীর অভ্যন্তরে গিয়ে নিজের স্ত্রীকে বললেন, আজ এক সম্মানিত ব্যক্তি আমাদের বাড়ীতে অবস্থান করবে। খানা-পিনার জন্যে কি কিছু আছে? জবাবে সে বললো, খানা-পিনার জন্যে অন্য কোন বস্তুতো নেই। অবশ্য এ বকরী রয়েছে। আর বকীরীটির দুধের ওপরই তোমার শিশুর জীবন নির্ভরশীল। বুদ্দু বললো, যাই হোক আমি বকরী জবেহ করে মেহমানকে খাওয়াবো। স্ত্রী বললো, নিষ্পাপ শিশুকে কি মেরে ফেলবে? বুদ্দু বললো, যা হবার তাই হবে। মেহমানকে অভুক্ত রাখা যাবে না। বস্তুতঃ বকরী জবেহ করে হযরত ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) এবং তাঁর গোলামকে সে খাবার খাওয়ালো। হযরত ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) স্বামী-স্ত্রীর আলাপ-আলোচনা শুনে ছিলেন। সকালে ঘুম থেকে জেগে গোলামকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার তহবিলে কত আছে? সে বললো, পাঁচশ' দিনার। তিনি পাঁচশ দিনারই বুদ্দুকে দিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। গোলাম বললো, সুবহান আল্লাহ হে আমীর। সেতো আমাদেরকে পাঁচ দিরমহামের বকরী খাইয়েছে। আর আপনি তাকে পাঁচশ' দিনার দিচ্ছেন?

হযরত ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) খুব অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, "আফসোস, তোমার বুদ্ধির! আল্লাহর কসম! এ গরীব মেজবান আমাদের থেকেও অনেকাংশে হৃদয়বান। আমরাতো আমাদের সম্পদ থেকে খুব নগণ্য একটি অংশ তাকে দিচ্ছি। আর সে নিজের কলিজার টুকরো কোরবাণী করে নিজের সমস্ত সম্পদ আমাদের সামনে উপস্থিত করেছে। (অর্থাৎ বকরীটিই তার একমাত্র সম্বল ছিল। তা জবেহ করে আমাদেরকে খাইয়ে দিয়েছে) এবং একমাত্র দুগ্ধপোষ্য শিশুর জীবনেরও পরওয়া করেনি।

একথায় গোলাম চুপ মেরে গেল এবং সে কৃতজ্ঞতার সাথে এ অর্থ বুদ্দুকে দিয়ে দিল।



www.amarboi.org

# হযরত যবরকান (রাঃ) বিন বদর তামিমী সা'দী

প্রিয় নবী (সাঃ)-এর প্রত্যেক সাহাবীই এমনিতেই ছিলেন সিরত এবং সুরতে সুন্দর ও সুদর্শন। কিন্তু আল্লাহ পাক কিছু কিছু সাহাবীকে অসাধারণ সুন্দর চেহারা প্রদান করেছিলেন। হযরত যবরকান (রাঃ) ছিলেন এ ধরনের সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি আরবের মশহুর কবিলাহ বনু তামিমের শাখা বনু সায়াদের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পুষ্প নিংড়ানো লাল রং এবং সুন্দর গণ্ডের জন্যে তিনি "মাহে নজদ" উপাধিতে পরিচিত ছিলেন। নিজের গোত্রের লোকজন তাঁর প্রতি খুবই অনুরক্ত ছিলো। কিন্তু অপরিচিত কোন ব্যক্তি তাঁকে দেখা মাত্র থ' মেরে যেতেন। এ কারণেই তিনি যখন দেশের বাইরে যেতেন তখন চেহারার ওপর কাপড় বেঁধে নিতেন। যাতে তাঁর সুন্দর চেহারা দেখে কেউ ফিতনায় না পড়ে যায়। হযরত যবরকানের (রাঃ)-এর কুনিয়ত বা পারিবারিক পদবী ছিল আবু আয়াশ এবং আসল নাম ছিল হোসাইন। কিন্তু তিনি ইতিহাসে যবরকান উপাধিতে মশহুর হন। তাঁর নসবনামা হলোঃ যবরকান (রাঃ) বিন বদর বিন ইমরুল কায়েস বিন খালফ বিন বাহদিলাহ বিন আওফ বিন কায়াব বিন যায়েদ মানাত বিন তামিম।

হযরত যবরকান (রাঃ)-এর পিতৃপুরুষরা কোন এক সময় বনু তামিমের বাদশাহ ছিলেন। বস্তুতঃ শাহী বংশের সদস্য হওয়ার কারণে স্বগোত্রে তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখা হতো। রাসূল (সাঃ)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির সময় তিনি "বনু সায়াদের" নেতা ছিলেন। এটা সেই গোত্র যার সাথে হুযুর (সাঃ)-এর ধাত্রী মাতা বিবি হালিমার সম্পর্ক ছিল। হযরত যবরকান (রাঃ) শুধুমাত্র একটি গোত্রেরই নেতা ছিলেন না বরং একজন শক্তিশালী কবিও ছিলেন এবং বনি তামিমের কবিদের মধ্যে উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন ছিলেন। বনু তামিম দীর্ঘকাল যাবত সিংহাসনের অধিকারী ছিল। এজন্য তাদের মস্তিষ্কে বংশীয় গৌরব ও অহমিকা পুরোপুরিই বিদ্যমান ছিল। এ অহমিকাবোধই তাদেরকে পুরো ২১ বছর পর্যন্ত ইসলাম থেকে বিমুখ করে রেখেছিল। কিন্তু অবশেষে সময় এসে গেল। আরবের অন্যান্য গোত্রের মত বনু তামিমও নবী (সাঃ)-এর সামনে মাথা নত করতে বাধ্য হলো।

www.amarboi.org

মক্কা বিজয় এবং হুনাইনের যুদ্ধের পর (অষ্টম হিজরী) সকল অমুসলিম গোত্রের ওপর হক বা সত্যের ভীতি ছেয়ে গেল এবং আরবের প্রতিটি এলাকা থেকে বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধিদল ইসলাম গ্রহণের নিমিত্তে রাসূল (সাঃ)–এর নিকট উপস্থিত হতে লাগলো। নবম হিজরীতে এত প্রতিনিধি দল এলো যে, এ বছরকে "প্রতিনিধির বছর" বলা হতো। বনু তামিমও ৭০–৮০ জনের একটি প্রতিনিধি দল সে বছর মদীনা প্রেরণ করে। এ প্রতিনিধিদলে তামিম গোত্রের (বিভিন্ন শাখার) বড় বড় নেতা, অনলবর্ষী বক্তা এবং উচুমানের কবি অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। হযরত যবরকান (রাঃ) বিন বদরও এ দলের একজন সদস্য ছিলেন। বনু তামিমের প্রতিনিধি দলের মদীনা আগমনের ব্যাপারে মশহুর রাওয়ায়েত হলো যে, তারাও অন্যান্য প্রতিনিধি দলের মত আনুগত্য প্রকাশের জন্য রাসূল (সাঃ)–এর খিদমতে হাজির হলো। তবে, এটা পৃথক কথা যে, এ ব্যাপারে প্রতিনিধি দলটি কতিপয় অযৌক্তিক শর্ত আরোপ করেছিলো। কিন্তু অন্য এক বর্ণনায় এও বলা হয়েছে যে, [যা ইমাম বুখারী (রঃ) এবং হাফিজ ইবনে কাইয়েম (রঃ) বর্ণনা করেছেন] নবম হিজরীর মুহাররম মাসে হুযুর (সাঃ) বনু তামিমের শাখা বনু আম্বরকে উৎখাতের জন্য একটি বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। কেননা তারা স্বয়ং খিরাজ আদায়ে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল এবং অন্যান্য গোত্রকেও তা আদায় করতে নিষেধ করেছিল। বনু আম্বরের লোকজন ইসলামী বাহিনী দেখে পালিয়ে গেল। মুসলমানরা তাদের ৬২ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে মদীনা নিয়ে এলো। বনু তামিম এসব কয়েদীকে মুক্ত করার জন্যে আকরা বিন হাবিছের নেতৃত্বে বাছাই করা লোকদের একটি দল মদীনা প্রেরণ করলো। ঘটনা যাই হোক, সকল চরিতকারই এ ব্যাপারে একমত যে, এ দল অত্যন্ত ঠাট বাটের সাথে মদীনা এসেছিল। তাফসীরে "মুয়াহিবুর রহমানে" (মৌলবী সাইয়েদ আমীর আলী) প্রতিনিধি দলের নেতা আকরা' বিন হারিছের একটি উক্তি উদৃত করা হয়েছে। এ উক্তিতে তিনি বলেছেন, "সে সময় আমার মধ্যে জাহেলিয়াত এবং গ্রাম্যতা দোষ বিদ্যমান ছিল এবং আমি বেআদবীর সাথে রাসূল (সাঃ)–এর সামনে পৌছে চেঁচিয়ে বললাম, হে মুহাম্মাদ (সাঃ) বাইরে বেরিয়ে আমাদের কাছে এসো।"

তাদের এ বেয়াদবী রাসূল (সাঃ)–এর নিকট অসহ্য লেগেছিল। কিন্তু তিনি ছিলেন আপাদমস্তক দয়ার সাগর। বাইরে এসে, তিনি তাদের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাত করলেন। আকরা (রাঃ) বললেন, "মুহাম্মাদ (সাঃ)! খোদার কসম, আমি সেই ব্যক্তি যার প্রশংসা মানুষের ইজ্জত বৃদ্ধি করে এবং আমার ভৎর্সনা মানুষকে কালিমালিপ্ত করে।" হুযুর (সাঃ) বললেন, "এটাতো আল্লাহর কাজ"। আকরা এতেও চুপ না হয়ে বললেন, "আমরা সবচেয়ে বেশী সম্মানিত।" রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, " তোমাদের চেয়ে বেশী

www.amarboi.org

সম্মানিত ছিলেন ইউসুফ (আঃ) বিন ইয়াকুব (আঃ) ''। আকরা এবার তার প্রকৃত রূপ প্রকাশ করে বললো,''মুহাম্মাদ (সাঃ) ! আমরা তোমার ওপর ফখর করতে চাই। তোমাদের কবি এবং বাগ্মীদেরকে আমাদের কবি ও বাগ্মীদের বিরুদ্ধে মোকাবিলার অনুমতি দাও।'' ইবনে আছিরের (রঃ) বক্তব্য অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছিলেন, ''আমি অহমিকা প্রকাশ এবং কাব্যগিরির জন্য আগমন করিনি। যদি তোমরা এজন্যেই এসে থাকো তাহলে তোমাদের কাজ করো। আমরা তার জবাব দেবো।''

আকরা নিজের দলের সদস্য আতারদ বিন হাজিবকে ইঙ্গিতে বক্তৃতা করার নির্দেশ দিলেন। আতারদ একজন অনলবর্ষী বক্তা ছিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে অত্যন্ত সুন্দর ও সুললিত ভাষায় বনু তামিমের মর্যাদা, ধন-সম্পদ, উচ্চ বংশ, প্রভাব-প্রতিপত্তি, বাহাদুরী, দানশীলতা এবং মেহমানদারীর উল্লেখ করে বক্তৃতা করলেন। তার বক্তৃতা শেষ হলে হুযুর (সাঃ) হযরত ছাবিত (রাঃ) বিন কায়েস আনসারীকে আতারদের বক্তৃতার জবাব দানের নির্দেশ দিলেন। হযরত ছাবিত (রাঃ) দাঁড়িয়ে প্রথমে আল্লাহ তায়ালার হামদ বা প্রশস্তি প্রকাশ করলেন। অতঃপর রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর নবুয়াত প্রাপ্তি, তাঁর দাওয়াত, কুরআন অবতীর্ণ হওয়া এবং মুহাজির ও আনসারদের ফজিলত এমন সুন্দরভাবে এবং প্রভাবশালী ভাষায় বর্ণনা করলেন যে, সমগ্র মজলিশ নীরব হয়ে গেল।

এর পর বনু তামিমের পক্ষ থেকে যবরকান বিন বদর কাব্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলেন এবং নিজের কওমের প্রশংসায়, এক শক্তিশালী কাসিদাহ আবৃত্তি করলেন।

হাফিজ ইবনে হাজার (রঃ) "ইসাবাহ"-তে লিখেছেন যবরকানের কবিতা শুনে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, ''ইন্না মিনাল বায়ানি লা সিহরা'' অর্থাৎ কিছু কিছু বক্তৃতায় যাদু থাকে। কবিতা পাঠ শেষে যবরবরকান বসে গেলে প্রিয় নবী (সাঃ) হযরত হাসান বিন ছাবিত (রাঃ)-কে জবাব দানের নির্দেশ দিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে শক্তিশালী ও কাব্যরসে সুসমন্বিত এমন কবিতা আবৃত্তি করলেন যে, বনু তামিম গোত্রের প্রতিনিধিরা থ মেরে গেলেন এবং প্রতিনিধি দলের নেতা আকরা' বিন আবিছের মুখ দিয়ে অবলীলাক্রমে বেরিয়ে এলোঃ

''পিতার কসম। মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর বক্তা আমাদের বক্তার চেয়ে উত্তম এবং মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর কবি আমাদের কবির চেয়ে ভালো। তাদের কন্ঠস্বর আমাদের

www.amarboi.org

কণ্ঠস্বর থেকে হৃদয়গ্রাহী এবং মিষ্টি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, শুধুমাত্র এক আল্লাহই ইবাদাতের উপযুক্ত এবং মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল।

প্রতিনিধি দলের সকলেই একবাক্যে তার সাথে ঐকমত্য প্রকাশ করলেন এবং সবাই কালেমায়ে শাহাদাত পড়ে নিজেদের হাত রহমতে আলম (সাঃ)-এর পবিত্র হাতে রাখলেন। সাথে সাথে হযরত আকরার সুপারিশে হুযুর (সাঃ) বনু আম্বরের সকল কয়েদীকে মুক্ত করে দিলেন।

এ প্রতিনিধি দল মদীনা থেকে প্রত্যাবর্তন করতে লাগলো। এ সময় প্রিয় নবী (সাঃ) যবরকান (রাঃ) বিন বদরকে নিজের পক্ষ থেকে বনু সায়াদের আমীর নিযুক্ত করলেন। সম্ভবতঃ জাহেলী যুগে তার যে সম্মান ছিল ইসলাম গ্রহণের পরও রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তা বহাল রাখলেন।

বিশ্ব নবী (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) খিলাফতের আসনে সমাসীন হলেন। এ সময় সমগ্র আরবে ধর্মদ্রোহিতার আগুন প্রজ্জলিত হয়ে উঠলো। আনসার, কুরাইশ এবং বনু ছাকিফ ছাড়া আরবের এমন কোন গোত্র ছিল না যে, এ ফিতনায় প্রভাবিত হয়নি। বনু তামিমের অনেক শাখাই ধর্মদ্রোহের দাবানলে এলো এবং যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানালো। কিন্তু হযরত যবরকান (রাঃ) অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে হকের ওপর দণ্ডায়মান রলেন এবং স্ব-গোত্র বনু সায়াদকেও এ ফিতনা থেকে রক্ষা করলেন। ইবনে আছির (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি সে ঘনঘটা পূর্ণ দুর্যোগের সময়ও যথারীতি নিজের কবিলা থেকে যাকাত আদায় করে খিলাফতের দরবারে প্রেরণ করেছিলেন। খলিফাতুর রাসূল হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) তার ইখলাস এবং দৃঢ়তায় খুশী হয়ে তার মান ও মর্যাদা বহাল রেখেছিলেন।

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর খিলাফতকালেও হযরত যবরকান (রাঃ) বনু সায়াদের নেতৃত্বে সমাসীন ছিলেন। একবার তিনি যাকাতের অর্থ নিয়ে মদীনা মুনাওয়ারাহ আসছিলেন পথিমধ্যে প্রখ্যাত কবি হাতিয়ার সাথে সাক্ষাত হলো। আলোচনাকালে হাতিয়া জানালো যে, মরুর জীবনে তার নাভিশ্বাস উঠেছে। এখন সে ইরাক যাচ্ছে। সেখানকার নিয়ামতসমূহ দিয়ে উপকৃত হতে চায়। হযরত যবরকান (রাঃ) আরাম আয়েশের জীবন পছন্দ করতেন না এবং মরুর সাদাসিধে জীবনকে অগ্রাধিকার দিতেন। তিনি হাতিয়াকে ইরাক গমনে বাধা দিলেন এবং প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত তাকে তাঁর বাড়ীতে মেহমান হিসেবে অবস্থানের কথা বললেন। হাতিয়া সে সময় তাঁর কথা মেনে

www.amarboi.org

নিলেন। কিন্তু তার অন্তরে হযরত যবরকান (রাঃ) সম্পর্কে খারাপ ধারণা বদ্ধমূল হলো। সে ভাবলো যে যবরকান (রাঃ) কাব্য সম্পর্কিত তার আশা–আকাংখা ধূলিস্যাৎ করে দিয়েছে। সুতরাং সে তার সম্পর্কে ব্যঙ্গ কবিতা লিখে ফেললো। হযরত যবরকান (রাঃ) চাইলে জবাব দিতে পারতেন। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর তিনি এ ধরনের বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এজন্যে তিনি খিলাফতের দরবারে হাতিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করাটাকেই যুক্তিযুক্ত মনে করলেন। হাতিয়ার কবিতা ছিল রূপক ধরনের। বাহ্যতঃ তা বিদ্রূপাত্মক ছিল না। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) হযরত যবরকান (রাঃ)–এর অভিযোগে দোদুল্যমান অবস্থায় নিপতিত হলেন। এবং তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কবি হযরত হাসসান বিন ছাবিত (রাঃ)–এর মত চাইলেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন যে, হাতিয়ার কবিতা ব্যাঙ্গাত্মক কিনা। তিনি সিদ্ধান্ত দিলেন যে, কবিতাটি ব্যাঙ্গাত্মকই। এর পর হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) হাতিয়াকে গ্রেফতার করালেন।

হাফিজ ইবনে আবদুল বার (রঃ) "ইসতিয়াবে" লিখেছেন, কিছুদিন পর হযরত যোবায়ের (রাঃ), ইবনুল আওয়াম এবং হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) বিন আওফ হাতিয়ার মুক্তির সুপারিশ করলেন। হযরত ওমর (রাঃ) এ সব মহান সাহাবী (রাঃ)–কে খুব মান্য করতেন। তিনি তাদের সুপারিশ মেনে নিলেন এবং হাতিয়াকে ভবিষ্যতের জন্য তওবাহ করিয়ে মুক্ত করে দিলেন।

হযরত যবরকান (রাঃ) হক কথনে অত্যন্ত পারঙ্গম ছিলেন। হাফিজ ইবনে হাজার (রঃ) বর্ণনা করেছেন, আমীর মাবিয়া (রাঃ)–এর শাসনকালের নামকরা গবর্ণর যিয়াদ বিন আবিহ একবার মানুষের ওপর নির্যাতন চালালো। তিনি তার কাছে গমন করলেন এবং প্রকাশ্যে বললেন যে, তোমার নির্যাতনে জনগণ অতীষ্ঠ হয়ে উঠেছে। এ কাজ থেকে তুমি বিরত হও।

হযরত যবরকান (রাঃ)–এর মৃত্যু সন সম্পর্কে ইতিহাসবিদরা নীরব। অবশ্য আমীর মাবিয়া (রাঃ)–এর শাসনকাল পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। ইবনে আছির (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি যদি কখনো মক্কা মুয়াজ্জামা গমন করতেন তাহলে নিজের চেহারার ওপর কাপড় বেঁধে নিতেন। যাতে তাঁর অনিন্দসুন্দর চেহারার ওপর মানুষের দৃষ্টি না পড়ে।

• • •

www.amarboi.org

# হযরত জারূদ (রাঃ) বিন আমর আবদী

ষষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়ার সন্ধির পর বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (সাঃ) চার পাশের বাদশাহ এবং রইসদের নামে ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত পত্র প্রেরণ করেন। এ ধরনের একটি পত্র বাহরাইনের শাসক মানযার বিন সাওয়ার নামেও প্রেরণ করা হয়। হযরত আলী (রাঃ) বিন আবদুল্লাহ হাজরামী পত্রটি বহন করে নিয়ে যান। পত্রটির কারণে মানযার খুব প্রভাবিত হন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। তার হাতেই বিরাট সংখ্যক বাহরাইনবাসী ইসলাম কবুল করেন। আরবের মশহুর কবিলাসহ আবদুল কায়েস বাহরাইনে বসবাস করতো। এ গোত্র ছিল খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী। বাহরাইনে ইসলামের শুভ পদার্পণে গোত্রটির কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করলেও অবশিষ্টরা নিজেদের ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

অষ্টম হিজরীতে মক্কায় ইসলামের পতাকা উড্ডীন হলে ইসলামের শত্রুরা ভীত বিহ্বল হয়ে পড়ে এবং আরবের আনাচে-কানাচে থেকে বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধিদল আনুগত্য প্রকাশের জন্য রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে হাজির হতে থাকেন। ন' অথবা দশ হিজরীতে আবদুল কায়েস গোত্রের খৃষ্টানরাও একটি প্রতিনিধিদল মদীনা মুনাওয়ারাহ প্রেরণ করে। ইবনে সায়াদ (রঃ)-এর বক্তব্য অনুসারে এ দলটি ২০ সদস্য এবং হাফিজ ইবনে হাজার আসাকালানী (রঃ)-এর মত অনুযায়ী তা চল্লিশ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত ছিল। প্রতিনিধিদলটি নবী (সাঃ)-এর খিদমতে হাজির হলে দলনেতা সামনে অগ্রসর হয়ে আরজ করলো ঃ "হে মুহাম্মাদ! আমি প্রথম থেকেই ঐশী খৃষ্ট ধর্মের অনুসারী। এখন আপনার দ্বীনের জন্য নিজের দ্বীন ত্যাগ করছি। আপনি কি আমার এ ধর্ম পরিবর্তনের জন্য নাজাতের জামিন হবেন?"

প্রিয় নবী (সাঃ) ফরামালেন ঃ "হাঁ, আমি জামিন হলাম। ইসলাম তোমাদের ধর্ম থেকে উত্তম।" হুযুর (সাঃ)-এর ইরশাদ শুনে দলনেতা তৎক্ষণাৎ কালেমায়ে তাওহীদ পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে প্রতিনিধি দলের অন্যান্য সদস্যরাও ঈমান আনলেন। তাঁদের ইসলাম গ্রহণে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) খুব খুশী

www.amarboi.org

হলেন এবং তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলেন। আবদুল কায়েস এ প্রতিনিধি দলের নেতা ছিলেন হযরত জারুদ (রাঃ) বিন আমর। তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মুক্তির জামানত দিয়েছিলেন।

হযরত জারুদ বিন আমর কিতাবপন্থী সাহাবী হিসেবে পরিগণিত ছিলেন। কিতাবপন্থী সাহাবী বলতে তাদেরকেই বুঝায় যারা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ইহুদী অথবা খৃষ্টান ছিলেন। হযরত জারুদ (রাঃ)-এর প্রকৃত নাম ছিল বাশার। কুনিয়ত ছিল আবু মানযার। লকব ছিল জারুদ। এ লকব এত প্রসিদ্ধি লাভ করে যে, প্রকৃত নাম মানুষ ভুলেই যায়। চরিত গ্রন্থে তাঁর বংশনামা শুধু এতটুকুই পাওয়া যায়ঃ বাশার (জারুদ) বিন আমর বিন মুয়াল্লা আবদী।

হযরত জারুদ (রাঃ) আবদুল কায়েস গোত্রের অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং অন্যতম প্রখ্যাত নেতা ছিলেন। তিনি খ্যাতিমান বাহাদুরও ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে একবার তিনি বকর বিন ওয়ায়েল গোত্রের ওপর অতর্কিতে হামলা চালিয়ে, সকল গবাদিপশু এবং ধন-সম্পদ এমনকি সেলাইয়ের সূতা পর্যন্ত লুট করে নিয়েছিলেন। এ ঘটনা এত প্রসিদ্ধি লাভ করছিলো যে, তিনি বনু আবদুল কায়েস গোত্রের জন্য গৌরবের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কবিরা পর্যন্ত কাব্যে হযরত জারুদ (রাঃ)-এর নাম বীর হিসেবে উল্লেখ করতো।

হযরত জারুদ (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কিত উপরোল্লিখিত বর্ণনা সীরাতে ইবনে হিশাম থেকে উৎকলিত হয়েছে। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, তিন রাসূল (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হলেন, তখন হুযুর (সাঃ) বললেন ঃ 'জারুদ। তুমি এবং তোমার কওম আসতে অনেক বিলম্ব করে ফেলেছ।"

হযরত জারুদ (রাঃ) লজ্জা প্রকাশ করে আরজ করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)। এখন আমি আপনার খিদমতে হাজির হয়েছি। আমি ইঞ্জিলে আপনার গুণাবলী সম্পর্কে অধ্যয়ন করেছি। হযরত ঈসা (আঃ) আপনার আগমনের সুসংবাদ দিয়েছেন।" অতপর তিনি বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)। আপনার পবিত্র হাত সম্প্রসারিত করুন। প্রিয় নবী (সাঃ) নিজের হাত এগিয়ে দিলেন। হযরত জারুদ (রাঃ) ত্বরিত গতিতে তা ধরলেন এবং কালেমায়ে তাওহীদ পাঠ করে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিলেন। (তারিখে ইবনে আসাকির)।

www.amarboi.org

এ বর্ণনায় জানা যায় যে, হযরত জারুদ (রাঃ) লেখাপড়া জানতেন এবং ইঞ্জিলের ওপরও তাঁর দখল ছিল। কতিপয় বর্ণনা থেকে প্রকাশ পায় যে, তিনি কবিও ছিলেন। হাফিজ ইবনে হাজার (রঃ) "ইসাবাহ' গ্রন্থে লিখেছেন যে, ইসলাম গ্রহণের পর তিনি নবী (সাঃ)–এর দরবারে কবিতার কতিপয় স্তবক শ্রদ্ধার্ঘ হিসেবে পেশ করেছিলেন।

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত জারুদ (রাঃ) এবং তার সাথীরা কিছুদিনের জন্য মদীনা মুনাওয়ারাহ অবস্থান করেন। অতপর দেশে ফিরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে সফরের প্রস্তুতি নিলেন। হাফেজ ইবনে কাইয়েম (রঃ) "জাদুল মিয়াদ" গ্রন্থে লিখেছেন, যাত্রার প্রাক্কালে তিনি রাসূল (সাঃ)–এর নিকট আরজ করলেন ঃ " হে আল্লাহর রাসূল! খরচপত্রের জন্য আমাদেরকে কিছু দিন।" হুযুর (সাঃ) বললেনঃ "এখন বাইতুল মাল শূন্য।" তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! "আমাদের এলাকায় লাওয়ারিশ উট যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায়। এ সব উট মালিকানায় নেওয়া কি জায়েয? ইরশাদ হলোঃ "লাওয়ারিশ উট মালিকানায় নেয়ার অর্থই হলো দোজখের আগুন অবধারিত করে নেয়া।"

ইবনে হিশাম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, মদীনা থেকে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে হযরত জারুদ (রাঃ) রাসূল (সাঃ)–এর খিদমতে আরজ করলেন, আমাদের প্রতিনিধি দলের সওয়ারীর ব্যবস্থা করা হোক। তখনকার পরিস্থিতিতে সওয়ারীর ব্যবস্থা করা গেলো না। এতে হযরত জারুদ আরজ করলেনঃ "ইয়া রাসূলুল্লাহ! রাস্তায় আমরা অন্যের অনেক উট পাবো (অর্থাৎ মালিকহীন উট)। তা ধরে সওয়ার হওয়ার অনুমতি আছে কি?" হুযুর (সাঃ) ফরমালেন ঃ "অবশ্যই নয়। তাকে আগুন মনে কর। "মোট কথা, হযরত জারুদ (রাঃ) ইসলাম নামক নেয়ামত লাভ করে দেশে ফিরে গেলেন।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)–এর ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) খলিফা নির্বাচিত হলেন। তিনি সামগ্রিক পরিস্থিতির সম্যক পর্যালোচনা করতে পারেননি ঠিক এমনি সময়ে আরব জুড়ে ধর্ম ত্যাগীদের লেলিহান শিখা প্রজ্জলিত হয়ে উঠলো। মক্কার কুরাইশ, মদীনার মুহাজির ও আনসার এবং বনু ছাকিব ব্যতীত কোন গোত্র এমন ছিল না যে তারা এ ফিতনার প্রভাবে কম বেশী প্রভাবিত হয়নি। সিদ্দিকে আকবর (রাঃ) অত্যন্ত সাহস, দৃঢ়তা এবং ঈমানী শক্তির সাথে সেই ভয়ানক ফিতনার মুকাবিলা করেন এবং কয়েক মাসের মধ্যেই তার মূলোৎপাটন করে ছাড়েন। চরিতকাররা বলেছেন, আবদুল কায়েস গোত্রও ধর্মত্যাগের ফিতনায় জড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু হযরত জারুদ (রাঃ) শুধু সাহস ও অটলতার সাথে ইসলামের ওপর কায়েমই থাকেননি বরং গোত্রের নেতা হওয়ার কারণে তিনি নিজের গোত্রবাসীকেও ধর্মত্যাগী হওয়া থেকে ফিরিয়ে রাখার

www.amarboi.org

প্রচেষ্টা চালান। তিনি বাহরাইনের অন্যান্য লোকদেরকেও ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার নির্দেশ দিলেন। তাঁর এ প্রচেষ্টার ফলে বহু মানুষ পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে বেঁচে গেল। যারা তাঁর কথায় কান দিল না তারা মুরতাদদের সাথে যোগ দিল। পরবর্তীতে তারা শিক্ষণীয় পরিণাম ভোগ করেছিলো। খলিফাতুর রাসূল (সাঃ) হযরত আলা' (রাঃ) বিন আবদুল্লাহ হাজরামীকে এক মজবুত বাহিনী দিয়ে বাহরাইনের অভিযানে প্রেরণ করলেন। হযরত আলা বাহরাইন পৌঁছে মুরতাদদেরকে এমনভাবে উৎখাত করেলন যে, তারা আর ভবিষ্যতে মাথা উচুঁ করে দাঁড়াতে পারেনি।

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)–এর খিলাফতকালে হযরত কুদামাহ (রাঃ) বিন মাজউন বাহরাইনের গভর্ণর হয়ে এলেন। একবার কতিপয় রোমক হযরত জারুদ (রাঃ)–কে বললো যে, তারা কুদামাহ (রাঃ)–কে শরাব পান করতে দেখেছেন। হযরত জারুদ (রাঃ) নিজের গভর্ণরের এ পদস্খলন সহ্য করতে পারলেন না এবং সোজা মদীনা মুনাওয়ারা পৌঁছে হযরত ওমর (রাঃ) এর খিদমতে আরয করলেনঃ "আমীরুল মুমিনিন। কুদামাহ শরাব পান করেছে। তার ওপর শরীয়তের হদ বা শাস্তি বিধান করুন।"

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) সাক্ষ্য তলব করলেন। হযরত জারুদ (রাঃ) হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ)–এর নাম বললেন। হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)–কে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেনঃ "আমি নিজেতো শরাব পান করা অবস্থায় দেখিনি। তবে নেশার অবস্থায় বমি করতে দেখেছি।"

হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, "শুধু এ সাক্ষ্যে অপরাধ প্রতিষ্ঠিত হয় না।" আরো অনুসন্ধানের জন্য তিনি কুদামাহ (রাঃ)–কে বাহরাইন থেকে ডেকে পাঠালেন। যখন তিনি এলেন তখন হযরত জারুদ (রাঃ) তার ওপর হদ জারীর দাবী জানালেন।

হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, "তুমি তো সাক্ষী। বাদী নও। তোমার কাজ ছিল সাক্ষ্য দান। তা তুমি দিয়েছ। এখন তুমি চুপ থাকো।"

সে সময় জারুদ (রাঃ) চুপ মেরে গেলেন। কিন্তু পরের দিন হযরত কুদামাহ (রাঃ)–এর ওপর হদ জারীর জন্য পীড়াপীড়ি করলেন, সাক্ষ্য যথেষ্ট ছিল না। এজন্য হযরত ওমর (রাঃ)–এর নিকট হযরত জারুদ (রাঃ)-এর পীড়াপীড়ি অসহ্য মনে হলো এবং বললেন ঃ "জারুদ। তুমি বাদী হয়ে যাচ্ছ। প্রকৃত অবস্থা হলো যে, সাক্ষী মাত্র একজন। এতে হযরত জারুদ বললেন,ঃ "আমীরুল মু'মিনিন। আমি আপনাকে আল্লাহর কসম

www.amarboi.org

দিয়ে বলছি যে, হদজারী বা দণ্ড বিধানে বিলম্ব করবেন না।" এ পীড়াপীড়িতে হযরত ওমর (রাঃ)–এর কিছুটা সন্দেহ হলো এবং বললেনঃ "জারুদ! তুমি নিজের জবাবের ওপর লাগাম টানো। নচেৎ আমি কঠোরতা অবলম্বন করবো।" এ ভীতি প্রদর্শনে হযরত জারুদ (রাঃ) আবেগান্বিত হয়ে বললেন ঃ "আমীরুল মুমিনিন! এটা ঠিক নয় যে, আপনার চাচার পুত্র শরাব পান করবে আর উল্টো আমাকে ধমক দেবেন।"

এ সময় হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)–কে পরামর্শ দিলেন যে, আপনার যদি সন্দেহ হয় তাহলে কুদামাহ (রাঃ)–এর স্ত্রীকে ডেকে জিজ্ঞেস করুন। হযরত ওমর (রাঃ) হযরত কুদামাহ (রাঃ)–এর স্ত্রী হিন্দাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে তিনি হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ)–এর কথার সত্যতা স্বীকার করলেন। এরপর হযরত ওমর (রাঃ) কুদামাহ (রাঃ)–কে বললেন, "কুদামাহ! দণ্ডের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও।"

হযরত কুদামাহ (রাঃ) আরজ করেন ঃ আমীরুল মুমিনিন! ধরে নিলাম তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী আমি শরাব পান করেছি। তবু আমার ওপর দণ্ড বিধান করার অধিকার আপনার নেই। হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন –"তা কি করে?" হযরত কুদামাহ (রাঃ) বলেন, আল্লাহ পাক বলেছেন ঃ

"যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করছে তাদের ওপর সেসব বস্তুর কোন গুনাহ নেই যা তারা খেয়েছে। কেননা, তারা পরহেয করেছে এবং ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে। অতপর পরহেয করেছে এবং ঈমান এনেছে। অতপর পরহেয করেছে এবং নেক কাজ করেছে।" (আল মায়েদা ঃ ৯৩)

হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ঃ "তুমি ব্যাখ্যা ভুল করছো। তোমার সরাসরি হারাম বস্তু থেকে পরহেয করা উচিত ছিল।"

এরপর হযরত ওমর (রাঃ) হযরত কুদাইমা (রাঃ)–এর ওপর শরীয়তের দণ্ড জারী করলেন এবং হযরত জারুদ (রাঃ) মুতমায়েন হয়ে দেশে ফিরে গেলেন।

হাফিজ ইবনে হাজার (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, কিছুদিন পর হযরত জারুদ (রাঃ) বসারায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। সেখানে থেকেই তিনি ইরানের

www.amarboi.org

জিহাদে অংশ গ্রহণরত মুজাহিদ বাহিনীতে যোগ দেন। ভিন্ন বর্ণনানুযায়ী তিনি পারস্য অথবা নাহাওন্দের যুদ্ধে লড়াইরত অবস্থায় শাহাদাতের পিয়ালা পান করেন। তিনি মানযার নামাক এক পুত্র রেখে যান। এ পুত্রের নামনুসারে তাঁর কুনিয়ত ছিল আবু মানযার।

হযরত জারুদ (রাঃ) যদিও রাসূল (সাঃ)-এর যুগের শেষ পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তবুও ফজিলত এবং কামালিয়াতের দিক থেকে শূন্য হাত ছিলেন না। তাঁর থেকে কতিপয় হাদীস হাদীসের কিতাবসমূহে বর্তমান আছে। এসব হাদীস মুহাম্মাদ বিন সিরিন (রঃ), আবুল কামুস (রঃ), আবু মুসলিম আল-জামী (রঃ) এবং যায়েদ বিন আলী (রঃ), বর্ণনা করেছেন। সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) এর মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমর ইবনুল আস তাঁর থেকে রাওয়ায়েত করেছেন। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে এ হাদীস হযরত জারুদ (রাঃ) থেকেই বর্ণিত আছে ঃ "মুমিনের হারানো বস্তুতে যে ব্যক্তি মালিকানা স্থাপন করেছে সে নিজেকে আগুনে জালিয়ে দিয়েছে।"

চরিতকাররা হযরত জারুদ (রাঃ)-কে ইখলাস ফি দ্বীন, হক কথন, বাহাদুরী এবং স্পষ্টবাদিতার জন্য খুব প্রশংসা করেছেন।

* * *

www.amarboi.org

# হযরত মুহাম্মাদ (রাঃ) বিন তালহা (রাঃ)

চতুর্থ অথবা পঞ্চম হিজরীর কথা। জলিলুল কদর সাহাবী হযরত তালহা (রাঃ) বিন উবাইদুল্লাহ (রাঃ)-এর গৃহে (আশারায়ে মুবাশ্শিরার অন্যতম) একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ট হলো। তিনি নিজের প্রভূ ও মালিক রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নামে তার নাম রাখলেন এবং বরকত লাভের উদ্দেশ্যে কোলে করে রাসূল (সাঃ)-এর নিকট নিয়ে গেলেন। হুযুর (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তার নাম কি রাখা হয়েছে। হযরত তালহা (রাঃ) আরজ করলেন, "মুহাম্মাদ" প্রিয় নবী (সাঃ) বললেন, ঠিক আছে। তাহলে তার কুনিয়ত আমার কুনিয়তের মত আবুল কাসেম থাকলো। অতপর তিনি শিশুর মাথায় স্নেহের হাত বুলালেন এবং তার জন্য মঙ্গল কামনা করে দোয়া করলেন। তাঁর দোয়ার প্রভাবে আবুল কাসেম মুহাম্মাদ (রাঃ) বিন তালহা (রাঃ) বড় হয়ে সৎ চরিত্রের এক নমুনা হলেন। তাকওয়া এবং ইবাদাতের ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে পরিগণিত হতেন।

হযরত আবুল কাসেম মুহাম্মাদ (রাঃ) বিন তালহা (রাঃ)-এর সম্পর্ক কুরাইশের বনু তাইম গোত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল এবং তিনি সাইয়্যেদেনা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)-এর নিকটাত্মীয় ছিলেন তার বংশনামা হলোঃ মুহাম্মাদ (রাঃ) বিন তালহা (রাঃ) বিন উবাইদুল্লাহ বিন উসমান বিন আমর বিন কায়াব বিন সায়াদ বিন তাইম বিন মাররাহ বিন কায়াব।

মাররাহ বিন কায়াবের পর তাঁর নসবনামা প্রিয় নবী (সাঃ)-এর নসবের সাথে মিলে যায়। মাতার নাম ছিল হামনাহ (রাঃ) বিনতে জাহাশ। তিনি প্রখ্যাত সাহাবিয়ার অন্তর্ভুক্ত। তিনি উম্মুল মুমিনিন হযরত যয়নব (রাঃ) বিনতে জাহাশের সহোদরা এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ফুপাতো বোন ছিলেন। এদিক থেকে হযরত মুহাম্মাদ (রাঃ) বিন তালহা নবীজি (সাঃ)-এর ভাগিনা ছিলেন।

www.amarboi.org

সাহাবী পিতা এবং সাহাবিয়াহ মাতার কোলে লালিত পালিত হয়ে হযরত মুহাম্মাদ (রাঃ) বিন তালহা (রাঃ) উন্নত চরিত্রের এক উদাহরণতুল্য ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে উঠেছিলেন। তিনি এত বেশী ইবাদাত করতেন যে, মানুষের মধ্যে "সাজ্জাদ" —অতিরিক্ত সিজদাকারীর উপাধিতে মশহুর হয়ে গিয়েছিলেন। নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা বলেছেন যে, ইসলামের ইতিহাসে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যাঁকে "সাজ্জাদ" উপাধি দেয়া হয়েছিল।

হাফিজ ইবনে হাজার (রঃ) আল ইসাবাহ গ্রন্থে লিখেছেন যে, হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)–এর ভ্রাতা হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন খাত্তাবের পুত্রের নামও মুহাম্মাদ ছিল। সাইয়েদেনা হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)–এর খিলাফতকালে একবার কোন ব্যক্তি যায়েদ (রাঃ)–এর পুত্রকে ডেকে গালমন্দ দিল। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এ কথা জানতে পেরে তাকে ডেকে বললেন, তোমার নামের কারণে "মুহাম্মাদ"নামকে গালমন্দের নিশানা বানানো যায় না। আজ থেকে তোমার নাম মুহাম্মাদের পরিবর্তে আবদুর রহমান রাখা গেল।

অতপর তিনি হযরত তালহা (রাঃ)–এর পুত্রদের নিকট একটি পয়গাম প্রেরণ করলেন। পয়গামে তিনি জানালেন যে, তোমার এবং তোমার সন্তান সন্ততির মধ্যে যার যার নাম মুহাম্মাদ রাখা হয়েছে তা পরিবর্তন করা হোক। হযরত মুহাম্মাদ (রাঃ) বিন তালহা খিলাফতের দরবারে হাজির হয়ে আরজ করলেন ঃ " আমিরুল মুমিনিন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বয়ং আমার নাম "মুহাম্মাদ" পছন্দ করেছিলেন।

হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, যদি এটা সত্য হয় তবে যাও। কারণ রাসূল (সাঃ)–এর পছন্দকৃত নাম আমি পরিবর্তন করতে পারিনা।

বিশ্বনবী (সাঃ)–এর পরলোক গমনের সময় হযরত মুহাম্মাদ (রাঃ) বিন তালহা (রাঃ) অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছিলেন এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)–এর শাসনকালে তাঁর শৈশবকাল ছিল। এ জন্য তিনি এসময় বিশেষ কোন কৃতিত্ব প্রদর্শন করার সুযোগ পাননি। হযরত ওসমান জুন্নুরাইন (রাঃ)–এর খিলাফতকালে পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হন এবং একজন নিশিযাপনকারী আবেদ (সাজ্জাদ) হিসেবে খ্যাতিলাভ করেন। ইমাম হাকিম (রঃ) "মুসতারাকে" লিখেছেন তাকওয়া এবং ইবাদাতের কারণে বড় বড় সাহাবীও তাকে দিয়ে দোয়া করাতেন।

www.amarboi.org

আমীরুল মু'মিনিন হযরত ওসমান জুন্নুরাইনের (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে বিশৃংখলা দেখা দিলে বিদ্রোহীরা খিলাফত ভবন অবরোধ করলো। এ সময় হযরত মুহাম্মাদ (রাঃ) বিন তালহা (রাঃ) ও অন্যতম কুরাইশ যুবক হিসেবে ভবনের দরজায় দাঁড়িয়ে বিদ্রোহীদের বাধা দান করেন। ধ্বস্তাধ্বস্তিতে হযরত মুহাম্মাদ (রাঃ) বিন তালহা (রঃ), হযরত হাসান (রাঃ) বিন আলী (রাঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ)-এর গোলাম কাম্বর আহত হন। কিন্তু তারা বিদ্রোহীদের দরজায় প্রবেশ করতে দেননি। অবশ্য কতিপয় বিশৃংখলাকারী প্রতিবেশীর বাড়ীর প্রাচীর টপকে ভেতরে প্রবেশ করে আমীরুল মুমিনিনকে শহীদ করে ফেলে।

হযরত আলী কারামুল্লাহু ওয়াজহাহু এ হৃদয় বিদারক ঘটনা শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন এবং তৎক্ষণাৎ হযরত ওসমান শহীদ (রাঃ)-এর বাড়ী গেলেন। নিজের পুত্র হযরত হাসান ও হোসাইন (রাঃ)-কে মারলেন এবং মুহাম্মাদ (রাঃ) বিন তালহা (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ)-কে কঠোর ভাষায় ধমক দিলেন। তিনি বললেন, তোমারা এখানে থাকতে কি করে এ ঘটনা ঘটলো। তারা বললেন, আমরা কি করতে পারতাম। হন্তা বাড়ীর পশ্চাতদিক থেকে প্রাচীর টপকে ভেতরে প্রবেশ করে। দরজা দিয়ে আমরা কাউকেই প্রবেশ করতে দেইনি।

হযরত আলী (রাঃ) খলিফা নির্বাচিত হলে হযরত ওসমান (রাঃ) হত্যার কিসাস বা বদলার দাবী শক্তিশালী হয়ে ওঠলো। এ প্রসঙ্গেই উষ্ট্রের যুদ্ধের মত দুঃখজনক ঘটনা ঘটলো। এক পক্ষের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন উম্মুল মু'মিনিন হযরত আয়েশাহ সিদ্দিকাহ (রাঃ) এবং অন্যদিকে ছিলেন হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু (রাঃ)। হযরত মুহাম্মদ (রাঃ) বিন তালহা (রাঃ)-এর আন্তরিক টান ছিল হযরত আলী (রাঃ)-এর প্রতি। কিন্তু শ্রদ্ধেয় পিতা তালহা (রাঃ)-এর কারণে উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশার (রাঃ)-এর বাহিনীতে যোগ দেন। যুদ্ধের প্রারম্ভে তিনি উম্মুল মু'মিনিনকে (রাঃ) বললেনঃ 'আম্মাজান। পুত্রের জন্য কি নির্দেশ আছে? উম্মুল মু'মিনিন (রাঃ) বুঝে ফেললেন যে, সে যুদ্ধে অংশ নিতে চায় না। তিনি বললেন, "তোমার অন্তর যদি মুতমায়েন না হয় তাহলে বনি আদমের পন্থা অবলম্বন কর এবং নিজের হাত ফিরিয়ে রাখো।"

উম্মুল মুমিনিন (রাঃ)-এর কথা শুনে হযরত মুহাম্মাদ (রাঃ) তরবারী খাপে ঢোকালেন। যিরাহ খুলে মাটিতে রেখে দিলেন এবং তার ওপর দাঁড়িয়ে গেলেন। সে সময় তিনি মাথায় কালো টুপি পরেছিলেন। হযরত আলী (রাঃ) তার চিন্তা-ভাবনা এবং অক্ষমতার কথা জানতেন। তিনি নিজের বাহিনীতে ঘোষণা দিলেন যে, কালো টুপি

www.amarboi.org

পরিধানকারীর ওপর (মুহাম্মাদ) যেন কেউ হাত না তোলে কিন্তু যুদ্ধের ডামাডোলে এ পার্থক্য করা সম্ভব হয়নি অথবা অজ্ঞাতসারেই তাকে কেউ শহীদ করে ফেলে।

যুদ্ধ শেষে হযরত আলী কারমাল্লাহু ওয়াজহাহু হযরত হাসান (রাঃ) এবং হযরত আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ)-কে সাথে নিয়ে স্বপক্ষের নিহতদের অনুসন্ধানে যুদ্ধের ময়দানে গেলেন। হঠাৎ করে হযরত হাসান (রাঃ)-এর দৃষ্টি একটি লাশের ওপর পড়লো। লাশটি উবু অবস্থায় মাটির ওপর পড়েছিল। লাশটি সিধা করতেই অযাচিতভাবে তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। অতপর বললেন, আল্লাহর কসম! এটি কুরাইশ সন্তান।

হযরত আলী (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, পুত্র কি ব্যাপার? তিনি বললেন, এটা মুহাম্মাদ বিন তালহা (রাঃ)-এর লাশ। হযরত আলী (রাঃ) এ কথা শুনে খুব দুঃখিত হলেন এবং লাশের পাশে বসে পড়ে বললেন, "কাবার রবের কসম! এতো সিজদাকারী পিতার আনুগত্য করতে গিয়ে জীবন দান করছে। সে অত্যন্ত উন্নত চরিত্র এবং পবিত্র যুবক ছিল।"

হযরত হাসান (রাঃ) ও হযরত মুহাম্মাদ (রাঃ)-এর শাহাদাতে অত্যন্ত শোকাহত হলেন। ইবনে আছির (রঃ) এবং ইমাম হাকিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন, এ সময় শ্রদ্ধেয় পিতাকে সম্বোধন করে বললেন, "আমি আপনাকে এ যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার কথা বলেছিলাম। কিন্তু অমুক অমুক ব্যক্তির পরামর্শ মেনে নিলেন।"

এর জবাবে হযরত আলী (রাঃ) বললেন, যা হবার তাতো হয়েই গেছে। হায়! আমি যদি ২০ বছর আগেই মরে যেতাম।

এরপর তিনি হযরত মুহাম্মাদ (রাঃ) বিন তালহা (রাঃ)-কেও অন্যান্য লাশের সাথে বসরার সন্নিকটে দাফন করলেন।

* * *

www.amarboi.org

# হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন বুদাইল (রাঃ) খুজায়ী

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন বুদাইল (রাঃ) একজন বাহাদুর মানুষ ছিলেন। রাসূল (সাঃ) এবং খুলাফায়ে রাশেদাহ (রাঃ)-এর যুগে তিনি নজীরবিহীন বীরত্বের প্রমাণ পেশ করেন। আরবের মশহুর কবিলাহ বনু খুজায়ার সাথে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁর বংশনামা নিম্নরূপঃ

আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন বুদাইল (রাঃ) বিন ওয়ারাকা বিন আমর বিন রবিয়াহ বিন আবদুল উজ্জাহ বিন রবিয়াহ বিন জাররী বিন আমের বিন মাযিন বিন খুজায়ী।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর পিতা ওয়ারাকা বনি খাজায়ার অন্যতম নেতা ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বেও তিনি প্রিয় নবী (সাঃ)-এর সাথে সম্পর্ক রাখতেন এবং মাঝে মধ্যে তার নিকট আসা যাওয়া করতেন। তাঁর গোত্র হুদায়বিয়ার সন্ধি (৬ হিজরীর জিলকদে) কালে মুসলমানদের মিত্র হয়ে যায় এবং সন্ধির এক শর্ত অনুযায়ী মক্কার মুশরিকরা বনু খুজায়াকে কোন রকম উত্যক্ত না করা এবং তাদের বিরুদ্ধে শত্রুকে সাহায্য না করার ব্যাপারে বাধ্য ছিল। কিন্তু কয়েক মাস পরই কুরাইশের মিত্র কবিলাহ বনু বকর বনু খুজায়ায়ার ওপর হামলা করে বসে। এসময় কুরাইশ মুশরিকরা প্রকাশ্যে বনু বকরকে সাহায্য করে। এভাবে তারা কার্যতঃ সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করে।

বনু বকর গোত্র কুরাইশদের সাথে মিলিত হয়ে বনু খুজায়ার ওপর চরম নির্যাতন চালালো। বনু খুজায়া গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ)-এর নিকট পৌঁছে এ নির্যাতনের খবর পৌঁছালো। চল্লিশ সদস্য বিশিষ্ট এ প্রতিনিধি দলে বুদাইল (রাঃ) বিন ওয়ারাকা এবং তার পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ) ও ছিলেন। চরিতকাররা উল্লেখ করেছেন, প্রিয় নবী (সঃ) অষ্টম হিজরীতে যেসব কারণে মক্কায় সেনাবাহিনী প্রেরণ করেছিলেন তার মধ্যে অন্যতম কারণ ছিল বনু খুজায়া গোত্রকে সাহায্য করা। মক্কা বিজয়ের পূর্বে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) এবং তার পিতা শুধুমাত্র



www.amarboi.org

মুসলমানদের মিত্র ছিলেন। মক্কা বিজয়ের অব্যবহিত পরই ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেন।

হাফিজ ইবনে হাজার (রঃ) 'ইসাবা'তে লিখেছেন, ইসলাম গ্রহণের সময় হযরত বুদাইলের বয়স ৯৭ বছর ছিল। কিন্তু তিনি এত সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন যে, দাড়ি এবং চুল সম্পূর্ণ কালো ছিল। ইসলামের বাইয়াত গ্রহণের সময় হুযুর (সাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার বয়স কত?" তিনি আরজ করলেন, "৯৭ বছর" রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, "আল্লাহ পাক তোমার সুশ্রী এবং কালো চুলে বরকত দিন।"

মক্কা বিজয়ের পর পিতা –পুত্র উভয়েই হুনাইন, তায়েফ এবং তাবুকের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। হুনাইনের যুদ্ধের পর গনিমতের মাল ও মুশরিক কয়েদীদের তত্ত্বাবধানের জন্য প্রিয় নবী (সাঃ) হযরত বুদাইল (রাঃ)–কে নিয়োগ করেন।

দশম হিজরীতে বিদায় হজ্জে হযরত বুদাইল (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিশ্ব নবী (সাঃ)–এর সহযোগী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। পিতা–পুত্র উভয়েই যুদ্ধে অংশগ্রহণ শেষে স্বদেশে ফিরে যেতেন।

ইবনে আছির (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একবার প্রিয় নবী (সাঃ) হযরত বুদাইল (রাঃ)–কে একটি পত্র প্রেরণ করেন। তিনি এ পত্রকে জীবনের এক আরাধ্য বস্তু হিসেবে পরিগণিত করে রেখেছিলেন। নবী (সাঃ)–এর জীবনের শেষ দিকে মৃত্যু রোগে আক্রান্ত হলে ওফাতের সময় এ পবিত্র পত্র হযরত আবদুল্লাহর নিকট হস্তান্তর করার সময় ওসিয়ত করলেন যে, যতদিন পর্যন্ত এ পত্র তোমাদের নিকট থাকবে ততদিন তোমরা কল্যাণ এবং রবকত পেতে থাকবে।

প্রিয় নবী (সাঃ)–এর ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) খলিফা নির্বাচিত হলেন, এ সময় আরবের পরিবেশ গরম হয়ে উঠলো এবং ধর্মত্যাগের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। কিন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) নজির বিহীন ঈমানী শক্তি ও দৃঢ় এবং অটল হিম্মতের মাধ্যমে কয়েক মাসের মধ্যে এ ফিতনা উৎখাত করে ছাড়লেন। সে ঘনঘোর সময়েও হযরত আবদুল্লাহ বিন বুদাইল (রাঃ) অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে হকের ঝাণ্ডা উড্ডীন রাখলেন এবং নিজের গোত্রকেও সে ফিতনার আগুন থেকে বাঁচানোর পুরোপুরি প্রচেষ্টা চালালেন। তিনি বনু খুজায়ার সর্দার পুত্র সর্দারই ছিলেন না বরং তুলনাহীন বীর ছিলেন।

www.amarboi.org

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) নিজের খিলাফতের শেষ দিকে হযরত আবদুল্লাহ বিন বুদাইল (রাঃ)-কে হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রাঃ)-এর সাহায্যার্থে ইরান প্রেরণ করলেন এবং তাঁকে ইস্পাহানে অভিযানের নির্দেশ দিলেন। সে সময় হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রাঃ) কাম এবং কাশানের অভিযানে ব্যস্ত ছিলেন এবং ইস্পাহানের দিকে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পাচ্ছিলেন না। হযরত আবদুল্লাহ বিন বুদাইল (রাঃ) পৌঁছার পর তাঁর বোঝা পাতলা হয়ে গেল। ইস্পাহান ইরানের গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ ছিল এবং এর প্রতিরক্ষার্থে এক বিরাট বাহিনী সমাবেশ করে রাখা হয়েছিল। হযরত আবদুল্লাহ বিন বুদাইল (রাঃ) ইস্পাহান প্রদেশে প্রবেশ করলেন। এ সময় সর্ব প্রথম তার মুকাবিলা হয়েছিল শহর বরাজ জাদবিয়ার সাথে। সে ছিল প্রভাবশালী ইস্পাহানী সরদার ইস্তান্দারের অভিজ্ঞ সামরিক অফিসার এবং স্ববাহিনীর অগ্রগামী ভাগের নেতৃত্ব দিচ্ছিল। উভয় বাহিনী পরস্পরের মুখোমুখী হলো। এ সময় শহর বরাজ জাদবিয়া হুংকার ছেড়ে ময়দানে লাফিয়ে পড়ে বললো যদি কারো হিম্মত থাকে তাহলে আমার মুকাবিলায় এসো। হযরত আবদুল্লাহ বিন বুদাইল (রাঃ) তার হুংকার শুনে সামনে এসে পৌঁছলেন। জাদবিয়া তার ওপর কয়েকবার তরবারী চালালেন। কিন্তু তা নিষ্ফল হলো। অতপর তিনি পুরো শক্তি দিয়ে তরবারী চালিয়ে এক কোপেই তাকে ধরাশায়ী করে ফেললেন।

শহর বরাজ জাদবিয়ার নিহত হওয়ার খবর শুনে ইসতানদার হিম্মত হারা হয়ে পড়লো এবং সাধারণ শর্তেই সন্ধি করে ফেললো। এরপর হযরত আবদুল্লাহ বিন বুদাইল (রাঃ) সামনে অগ্রসর হয়ে ইস্পাহানের উপকণ্ঠ "জি" অবরোধ করলো। জিবাসী সাত তাড়াতাড়ি অস্ত্র ফেলে দিয়ে জিযিয়া প্রদানে রাজী হয়ে আনুগত্য প্রকাশ করলো।

"জী" দখলের পর হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) এবার খোদ ইস্পাহান শহর অবরোধ করলেন। সেখানকার শাসক ফাদওসফান হযরত আবদুল্লাহ বিন বুদাইল (রাঃ)-এর নিকট একটি বাণী প্রেরণ করলেন। বাণীতে বলা হলো যে, অন্য জীবনহানির কি প্রয়োজন। আমরা দু'জনে লড়াই করেই সিদ্ধান্ত নিই। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, ফাদওসফান ৩০ জন নির্বাচিত বাহাদুর সাথে নিয়ে শহর থেকে বের হয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) তার রাস্তা বন্ধ করে দেন। এসময় সে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-কে বলেছিল যে, এসো

www.amarboi.org

আমরা পরস্পরে যুদ্ধ করি। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) তার প্রস্তাব নির্দ্বিধায় মেনে নিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তার মুকাবিলায় গিয়ে দণ্ডায়মান হলেন। কাদওসকান ইরানের নামকরা লড়াকু ছিল। বিশ্বাস ছিল যে, নির্বিঘ্নে সে প্রতিপক্ষকে কাবু করতে পারবে। কিন্তু যখন মুকাবিলা শুরু হলো তখন হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) তরবারীর এমন এক আঘাত হানলেন যে কাদওসকানের ঘোড়ার জিন কেটে নীচে নেমে গেল এবং সে কোনমতে রেহাই পেল। সে টের পেল যে, আর যদি কিছু সময় লড়াই চলে তাহলে তার জীবনে আর বাঁচার উপায় থাকবে না। অতএব সে বললো, আমি তোমার মত বাহাদুরের রক্তে নিজের হাত রঞ্জিত করতে চাই না। যেসব বাসিন্দা শহর ত্যাগ করে চলে যেতে চায় এবং যারা জিযিয়া দিয়ে থাকতে চায় এ শর্তে তোমার হাতে শহর অর্পণ করতে চাই। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) এ শর্ত মঞ্জুর করলেন এবং কাদওসকান তাঁর হাতে শহর ন্যস্ত করলেন। ইস্পাহান করতলগত করার পর হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) অন্যান্য এলাকার দিকে অগ্রসর হলেন এবং কিছু দিনের মধ্যে তা জয় করে নিলেন।

হযরত ওসমান জুন্নুরাইন (রাঃ)-এর খিলাফত কালে ২৮ হিজরীতে হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ বিন বুদাইল (রাঃ)-কে কারমানের অভিযানে নিয়োগ করেন। এ সময় হযরত আবু মূসা আশা য়ারি (রাঃ) বসরার গবর্ণর ছিলেন। আল্লামা বালাজুরী (রঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত আবদুল্লাহ বিন বুদাইল (রাঃ) তিবস এবং কারিনের দু'টি মজবুত দুর্গ জয় করে নিলেন। এ দুর্গদ্বয় জয়ের ফলে খোরাসানের দিকে অগ্রসর হওয়ার প্রশ্নে তার কোন প্রতিবন্ধকতা রলো না। কিছু দিন পর হযরত আবদুল্লাহ বিন আমের (রাঃ) খোরাসান জয় করেছিলেন।

হযরত ওসমান গণি (রাঃ)-এর শাহাদাতের পর হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু (রাঃ) খলিফার আসনে সমাসীন হন। সিরিয়ার গবর্ণর আমীর মাআবিয়া (রাঃ) তাঁর খিলাফত মানলেন না এবং উভয় বুজর্গের মধ্যে ব্যাপক মতানৈক্য শুরু হয়। হাফিজ ইবনে আবদুল বার (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, এ বিবাদ হযরত আবদুল্লাহ বিন বুদাইল (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-এর শক্তিশালী সমর্থক ছিলেন এবং সিফফীন যুদ্ধ শুরুর পূর্বে হযরত আলী (রাঃ)-এর সমর্থকদের সামনে বক্তৃতা দিতে গিয়ে তিনি বললেনঃ "মাবিয়া (রাঃ) যা দাবী করছেন তার তিনি কখনই যোগ্য নন। এ দাবীতে তিনি যাঁর বিরোধিতা করছেন তিনি অবশ্যই তার যোগ্য। আল্লাহর কসম! তোমরা অবশ্যই হকের

www.amarboi.org

ওপর আছ। আল্লাহর নূর তোমাদের সাথে রয়েছে। বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে মুকাবিলায় জন্য প্রস্তুত হও। তাদের মুকাবিলায় আল্লাহ তোমাদের ওপর রহমত নাযিল করবেন।"

আপাতঃ মুলতবির পর সিফ্ফীনের যুদ্ধ যখন দ্বিতীয়বার শুরু হলো তখন হযরত আলী (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ বিন বুদাইল (রাঃ)-কে পদাতিক বাহিনীর অফিসার হিসেবে নিয়োগ করলেন। যুদ্ধ বেশ কিছু দিন অব্যাহত রলো। যুদ্ধরত উভয় পক্ষের সৈন্যরা ছোট ছোট দলে একে অপরের মুকাবিলায় আসতো এবং যুদ্ধ করে ফিরে যেতো। একদিন হযরত আবদুল্লাহ বিন বুদাইল (রাঃ) ইরাকী বাহিনীর একটি দল নিয়ে বের হলেন। সিরিয়ার পক্ষ থেকে আবু আওয়ার সুলমী একটি সিরীয় বাহিনী নিয়ে তার মুকাবিলায় এলো। দীর্ঘক্ষণ উভয় পক্ষের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ হলো। অতপর আবদুল্লাহ বিন বুদাইল (রাঃ) বীরত্বের আবেগে সিরীয় ব্যূহ ভেদ করে সেই টিলার দিকে অগ্রসর হলেন যেখানে আমীর মাবিয়া (রাঃ) তাবু টাঙিয়ে অবস্থান করছিলেন। তিনি যখন দেখলেন সিরীয় বাহিনীর যে সৈন্যই আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর সামনে পড়ছে তাকেই সে হত্যা করছে। এ সময় তিনি সাথীদেরকে বললেন, তোমাদের যদি কাজ না হয় তাহলে পাথর দিয়ে তা সম্পন্ন কর। এতে সিরীয়রা হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর ওপর পাথর বর্ষণ শুরু করলো এবং হযরত আলী (রাঃ)-এর জন্য জীবন উৎসর্গকারী শহীদ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। আমীর মাবিয়া (রাঃ) তার লাশের নিকটে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেনঃ "এ ব্যক্তি জাতির নেতা ছিল।"

* * *

www.amarboi.org

# হযরত হুয়াইতিব (রাঃ) বিন আবদুল উজ্জা

৩৫ হিজরীর ১৮ই জিল-হজ্ব তারিখে মদীনা মুনাওয়ারাতে কিয়ামত তুল্য ঘটনা ঘটে গেল। কতিপয় দুরাত্মা বিদ্রোহী রাসূল (সাঃ)-এর হেরেমের পবিত্রতা তছনাছ করে সমকালীন সময়ের মহান ও পবিত্র ব্যক্তিত্বকে অত্যন্ত নৃশংসতার সাথে শহীদ করে ফেলে। বিরাট দানশীল, ধৈর্য ও স্থৈর্যের প্রতীক এবং আরব-আজমের খলিফা ও রাসূল (সাঃ)-এর জামাতা দাইয়েনেদা হযরত ওসমান জুন্নুরাইনের লাশ নিজের ঘরে কাফন বিহীন অবস্থায় পড়ে ছিল। বিদ্রোহীরা চারদিকে খোঁত খোঁত করে ফিরছিল। এ সব দুর্ভাগ্য বর্বরাস মানুষ কুরআনের হাফেজ শহীদ খলিফার লাশ দাফনও সহ্য করতে পারছিল না। এ দুর্যোগপূর্ণ অবস্থায় দ্বিতীয় দিনের রাতে কতিপয় (অনেকের মতে সতের জন) সাহসী মুসলমান মাথায় কাফনের কাপড় বেঁধে আমীরুল মু'মিনিনের গৃহে পৌঁছে তাঁর রক্তাক্ত দেহ উঠালেন। তারপর নামাযে জানাযা আদায় করে জীবন বাজী রেখে জান্নাতুল বাকীর পেছনে হিসে কাওকাবে দাফন করলেন। এ সব বাহাদুর মুসলমানের মধ্যে শত বর্ষের অধিক বয়সের আলোকজ্জল চেহারার এক বুজর্গ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি এ ফরয কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য নিজের জীবনের পরওয়া করেন নি। এমনকি বার্ধক্যের জরাগ্রস্ততাও তাঁকে পিছিয়ে রাখতে পারেনি। এ বুজুর্গ ব্যক্তির নাম হলো আবু মুহাম্মাদ হুয়াইতিব (রাঃ) বিন আবদুল উজ্জা।

হযরত আবু মুহাম্মাদ হুয়াইতিব (রাঃ) বিন আবদুল উজ্জার সম্পর্ক কুরাইশ খান্দান আমের বিন লুব্বীর সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। তাঁর নসবনামা হলো : হুয়াইতিব (রাঃ) বিন আবদুল উজ্জা বিন আবু কায়েস বিন আবদিদ বিন নাসার বিন মালিক বিন হাসাল বিন আমের বিন লুব্বী।

হযরত হুয়াইতিব (রাঃ) নিজের গোত্রের অন্যতম নেতা ছিলেন এবং কুরাইশের প্রভাবশালী ও বিশ্বস্ত লোকের মধ্যে পরিগণিত হতেন। তিনি জাহেলী যুগে কতিপয় আঙ্গুলে গোনা ব্যক্তির অন্যতম ছিলেন যারা লেখা-পড়া জানতেন।

www.amarboi.org

রিসালাত সূর্য ফারান পর্বত চূড়ায় উদিত হওয়ার সময় হযরত হুয়াইতিব (রাঃ)-এর বয়স ৬০ বছর ছিল। তাওহীদের দাওয়াত তাঁর ওপর বিশেষ প্রভাব ফেললো এবং তিনি কয়েকবার ইসলাম গ্রহণের আকাংখা ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু প্রতিবারই বনু উমাইয়ার রইস হাকাম বিন উমাইয়া এ বলে সেই সৌভাগ্য থেকে তাঁকে বঞ্চিত রাখেন যে, এ বয়সে নতুন ধর্ম গ্রহণ তোমার মর্যাদা বিরোধী। পিতৃ পুরুষের ধর্ম ত্যাগ করে তুমি তোমার বর্তমান মর্যাদা খুইয়ে ফেল না।

নবুয়াত প্রাপ্তি থেকে বিজয় কাল পর্যন্ত হযরত হুয়াইতিব (রাঃ) কেমনভাবে কাটিয়ে ছিলেন তার বর্ণনা ইবনে সায়াদ (রঃ) এবং হাফিজ ইবনে হাজার (রঃ) স্বয়ং তাঁর ভাষ্যে এমনভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

"আমি বদরের যুদ্ধেও মুশরিকদের সাথে ছিলাম। আমি স্বচক্ষে দেখলাম যে, ফিরিশতা আসমান থেকে অবতীর্ণ হচ্ছে। আমি সে সময়ই বুঝতে পারলাম যে, সেই ব্যক্তিকে (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হেফাজত করা হয়েছে। এ সত্ত্বেও আমি যা কিছু দেখলাম তা কাউকে বলিনি। বস্তুতঃ আমরা পরাজিত হয়ে মক্কা ফিরে গেলাম। আমি মক্কায় অবস্থান করতে লাগলাম। অন্যদিকে এক দু' করে কুরাইশের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলো। হুদাইবিয়ার সন্ধির দিনেও আমি উপস্থিত ছিলাম। সন্ধি প্রশ্নে আমি বেশী তৎপরতা প্রদর্শন করেছিলাম। সন্ধির শেষ সাক্ষী ছিলাম আমি এবং আমি মনে মনে বলেছিলাম, মুহাম্মাদ (সাঃ) তাই করবেন যা কুরাইশরা পছন্দ করে না। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন কাজা ওমরাহ পালনের জন্য মক্কায় তাশরীফ আনেন তখন অনেক কুরাইশ বাইরে চলে যায়। কিন্তু আমি ও সোহায়েল বিন আমর মক্কায় এ জন্য অবস্থান করেছিলাম যে, যাতে সময় শেষ হলে মুসলমানদেরকে মক্কা ত্যাগ করার কথা বলতে পারি। সুতরাং তৃতীয় দিনেই আমি এবং সোহায়েল রাসূল (সাঃ)-এর নিকট গিয়ে বললাম যে, আপনার শর্ত পূরণ হয়েছে এখন আপনি এ শহর ত্যাগ করুন। তিনি তৎক্ষণাৎ হযরত বেলাল (রাঃ)-কে সূর্য অস্ত যাবার পূর্বেই তাঁর সাথে আগত সকল মুসলমানকে মক্কা ত্যাগের কথা জানিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।" (তাবকাতে ইবনে সায়াদ, আল-ইসাবাহ)।

অষ্টম হিজরীর রমাদ্বান মাসে বিশ্বনবী মুহাম্মাদ মুস্তফা (সাঃ) মক্কা মুয়াজ্জামাতে ইসলামের ঝাণ্ডা উড্ডীন করলেন। এ সময় হযরত হুয়াইতিব (রাঃ)-এর অবস্থা কেমন ছিল তার বর্ণনা তাঁর নিজের ভাষাতেই শুনন ঃ

www.amarboi.org

"মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন শহরে প্রবেশ করলো তখন আমি মারাত্মকভাবে ভীত হয়ে পড়লাম এবং গৃহ থেকে বের হয়ে গেলাম। নিজের পরিবার পরিজনকে বিভিন্ন সুরক্ষিত স্থানে পৌঁছে দিলাম এবং নিজে আওফের বাগানে আশ্রয় নিলাম। হঠাৎ করে দেখলাম যে, আবু যর গিফারী (রাঃ) আমার দিকে আসছেন। তার এবং আমার মধ্যে পুরনো বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু সে সময় তাকে দেখে আমি পলায়নে প্রস্তুত হলাম। তিনি ডেকে বললেন, আবু মুহাম্মাদ! থামো। আমি থেমে গেলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, পালাচ্ছো কেন? আমি বললাম, তোমাদের নবী (সাঃ) এসে গেছেন। তাঁর ভয়ে পালাচ্ছি।"

আবু যর (রাঃ) বললেন, তুমি আল্লাহ প্রদত্ত নিরাপত্তায় নিরাপদ। এ কথা শুনে আমি তাঁর নিকট গেলাম এবং সালাম করলাম। তিনি বললেন, তোমার বাড়ী চলো। আমি বললাম, বাড়ী যাওয়ার জন্য কোন রাস্তা কি আছে। খোদার কসম! আমার ধারণা, আমি বাড়ী পর্যন্ত জীবিত পৌঁছতে পারবো না। পথেই কোন মুসলমানের হাতে মারা যাবো। আর বাড়ীতে যদি পৌঁছিও তাহলে কোন মুসলমান ঢুকে মেরে ফেলবে। আমার সন্তান-সন্ততিও বিভিন্ন স্থানে রয়েছে।

আবু যর (রাঃ) বললেন, সন্তান-সন্ততিকে কোন স্থানে একত্রিত কর। তোমাকে আমি স্বয়ং বাড়ী পৌঁছে দেব। বস্তুতঃ তিনি আমাকে সাথে নিয়ে চললেন এবং উচ্চৈস্বরে এ ঘোষণা দিতে দিতে এগুতে লাগলেন যে, হুয়াইতিব নিরাপত্তা পেয়েছে। তাকে যেন কেউ হেনস্তা না করে।

আবু যর (রাঃ) আমাকে নিরাপদে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে সকল ঘটনা বর্ণনা করলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, তুমি কি জাননা যে, কতিপয় বিজ্ঞপিত অপরাধী ছাড়া সবাই নিরাপদ? আমি হুযুর (সাঃ)-এর ইরশাদের কথা শুনে সম্পূর্ণ মুতমায়েন হয়ে গেলাম এবং পরিবার-পরিজনকে বাড়ী নিয়ে এলাম। অতপর আবু যর (রাঃ) আমার নিকট এলেন এবং বললেন, কতদিন এবং আর কতদিন? কল্যাণের অনেক সুযোগ হাত ছাড়া হয়ে গেছে। এখনো সময় আছে। চলো, রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে এসো। তিনি (সাঃ) সকল মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশী উত্তম, সবচেয়ে বেশী আত্মীয়দের প্রতি রহমকারী এবং সবচেয়ে বেশী ধৈর্যশীল। তাঁর মান-মর্যাদায় তোমার মান-মর্যাদা নিহিত। আমি বললাম, আমি তোমার সাথে যেতে প্রস্তুত আছি।

www.amarboi.org

সুতরাং আমি আবু যর (রাঃ)-এর সাথে বাতহা নামক স্থানে হুযুর (সাঃ)-এর খিদমতে হাজির হলাম। তাঁর (সাঃ) নিকট হযরত আবু বকর এবং হযরত ওমর (রাঃ) ও উপস্থিত ছিলেন। আমি আবু যর (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হুযুর (সাঃ)-কে সালাম করার পদ্ধতি কি?

তিনি বললেন, আসসালামু আলাইকা, আইয়ুহান নাবিউ ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি তাঁকে (সাঃ) সালাম করলাম। তিনি (সাঃ) বললেন, হে হুয়াইতিব। ওয়া আলাইকুমস সালাম। আমি বললাম, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নাই এবং অবশ্যই আপনিই আল্লাহর রাসূল।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি তোমাকে হেদায়াত দিয়েছেন।

আমার ইসলাম গ্রহণে তিনি (সাঃ) খুব খুশী হলেন। অতপর তিনি (সাঃ) আমার নিকট কিছু অর্থ ঋণ চাইলেন আমি ৪০ হাজার দিরহাম ঋণ হিসেবে দিলাম।

ইসলাম গ্রহণের সময় হযরত হুয়াইতিব (রাঃ)-এর বয়স প্রায় ৮০ বছর ছিল। কিন্তু এ বৃদ্ধ বয়সেও তিনি হুনাইন এবং তায়েফের যুদ্ধে প্রিয় নবী (সাঃ)-এর সহযাত্রী ছিলেন। হুনাইনের গনিমতের মাল থেকে নবী করিম (সাঃ) তাঁকে একশ উট দিয়েছিলেন। তায়েফের যুদ্ধের পর হযরত হুয়াইতিব (রাঃ) মক্কা মুয়াজ্জমা থেকে মদীনা মুনাওয়ারা স্থানান্তর হন।

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) হযরত হুয়াইতিব (রাঃ)-কে মান্য করতেন। তিনি নিজের খিলাফতকালে হেরেম শরীফের সীমানা নতুন করে নির্ধারণ করতে চাইলেন এবং এ উদ্দেশ্যে সাহাবায়ে কিরামের একটি দল মনোনীত করলেন। হযরত হুয়াইতিব (রাঃ)-ও এ দলের একজন সদস্য ছিলেন। হযরত ওসমান (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দিলে হযরত হুয়াইতিব (রাঃ) এবং কতিপয় সাহাবী বিদ্রোহীদেরকে খুব করে বুঝালেন। কিন্তু তারা নিজেদের বিশৃংখলাপূর্ণ আচরণ থেকে বিরত হলো না। এমনকি আমীরুল মু'মিনিনের শাহাদাতের মত হৃদয় বিদারক ঘটনা সংঘটিত হলো। বিদ্রোহীরা এত শক্তিশালী ছিল যে, মযলুম খলিফার লাশ দাফন করার মতো হিম্মতও কারো হয়নি। অবশেষে হযরত হুয়াইতিব (রাঃ) এবং অন্য ১৬জন মুসলমান নিজেদের জীবন বাজী রেখে এ কাজ সম্পাদন করেন।

www.amarboi.org

হযরত হুয়াইতিব হক কথক এবং স্পষ্টবাদী ছিলেন। ইমাম হাকিম (রঃ) "মুসতাদাকে" লিখেছেন যে, আমীর মাবিয়ার (রাঃ) শাসনকালে মারওয়ান বিন হাকাম মদীনার গবর্ণর নিযুক্ত হন। হযরত হুয়াইতিব (রাঃ) একদিন তার কাছে গেলেন। সে ব্যঙ্গ করে বললেন, "বড় মিয়া! আপনি ইসলাম গ্রহণে এত দেরী করেছেন কেন? অনেক যুবক এ সৌভাগ্য অর্জনে আপনার থেকে অগ্রগামী হয়েছে।"

হযরত হুয়াইতিব (রাঃ) জবাব দিলেন যে, ভাই। আমি কয়েকবার ইসলাম গ্রহণের আকাংখা ব্যক্ত করেছিলাম। কিন্তু তোমার পিতা (হাকাম বিন উমাইয়াহ) আমাকে তা থেকে বঞ্চিত করেন।

মারওয়ান এ কথা শুনে চুপ মেরে গেল। কিন্তু হযরত হুয়াইতিব (রাঃ) বললেন, সম্ভবতঃ তুমি জাননা যে, তোমার পিতা ওসমান (রাঃ) বিন আফফানের ওপর ইসলাম গ্রহণের অপরাধে কি ধরনের নির্যাতন চালিয়েছিল। এতে মারওয়ান আরো লজ্জিত হলো এবং সে আর কোনদিন হযরত হুয়াইতিব (রাঃ)-কে ব্যঙ্গাত্মক কোন কথা বলেনি।

হযরত হুয়াইতিব (রাঃ) আমীর মাবিয়া (রাঃ)-এর শাসনকালে মদীনা মুনাওয়ারাতে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ছিল প্রায় সোয়াশ' বছর। হযরত হুয়াইতিব (রাঃ) থেকে কতিপয় হাদীস বর্ণিত আছে। এ সব হাদীস তিনি কতিপয় বড় বড় সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সনদে পুত্র আবু সুফিয়ান (রঃ) এবং আবদুল্লাহ (রঃ) বিন বুরায়েদাহ (রাঃ) অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।

* * *

www.amarboi.org

# হযরত আব্বাস (রাঃ) বিন মিরদাস

হযরত আবুল ফযল আব্বাস (রাঃ) বিন মিরদাস জাহেলী যুগে একজন উঁচু পর্যায়ের কবি ছিলেন। তিনি নামকরা অশ্বারোহী এবং স্বগোত্রের একজন সরদার ছিলেন। এ সত্ত্বেও তিনি মদ্যপান অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। কাব্যচর্চা, অশ্বারোহণ এবং সরদারীর আবশ্যকীয় বস্তু ছিল মদ বা শরাব। একবার লোকজন জিজ্ঞেস করলো, হে সরদার। আপনি শরাব পান করেন না কেন? অথচ শরাব চিত্তে প্রফুল্লতা আনে এবং শরীরের শক্তি বৃদ্ধি করে।

তিনি জবাবে বলেছিলেন, "আমি কওমের সরদার হয়ে আহম্মক হতে চাই না। আল্লার কসম। আমার পেটে ঐ বস্তু কখনো যেতে পারে না যা জ্ঞান ও হুঁশ থেকে মানুষকে বঞ্চিত করে।"

হযরত আব্বাস (রাঃ) বিন মিরদাস নজদের বনু সুলাইম গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। বনু সুলাইম ছিল বনু কায়েস বিন আইলানের একটি শাখা। এ গোত্রে শরাফত, বদান্যতা ও দানশীলতা এবং বীরত্বের কারণে আরবের গোত্রসমূহের মধ্যে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিল। এমনকি একবার স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এ কবিলার প্রশংসায় বলেছিলেনঃ "নিঃসন্দেহে প্রত্যেক কওমের জন্য একটি আশ্রয় স্থল থাকে। আরবদের আশ্রয়স্থল হলো কায়েস বিন আইলান।"

হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর নসবনামা হলো ঃ আব্বাস (রাঃ) বিন মিরদাস বিন আবি আমের বিন হারেছাহ বিন আবদি বিন আবাছ বিন মনসুর আস-সুলামী।

হযরত আব্বাস (রাঃ) প্রখ্যাত মারছিয়া বর্ণনাকারী সাহাবিয়াহ আল-খানছা (রাঃ) বিনতে আমরের সতালো পুত্র ছিলেন। তিনি জাহেলী এবং ইসলামের উভয় কালই পেয়েছিলেন।

www.amarboi.org

বিমাতা হযরত খানছা (রাঃ)–এর মত তিনিও কাব্যে সম মর্যাদা পেয়েছিলেন। তবে তিনি সহোদর এবং সহোদরাদের চেয়ে উঁচু মানের কবি ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর এক সহোদর সারাকাহ বিন মিরদাস এবং সহোদরা উমরাত বিনতে মিরদাস জীবিত ছিলেন। তাঁরা হযরত আব্বাস (রাঃ)–এর ইন্তেকালে শোকগাথা বা মরছিয়া বর্ণনা করেছিলেন।

ইবনে হিশাম (রাঃ) হযরত আব্বাস (রাঃ) বিন মিরদাসের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে এক আশ্চর্য ধরনের রাওয়াতে বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, হযরত আব্বাস (রাঃ) পিতার নিকট থেকে একটি মূর্তি পেয়েছিলেন। এ মূর্তির নাম ছিল জুমার। পিতার নির্দেশ মুতাবেক হযরত আব্বাস (রাঃ) সে মূর্তির পূজা করতেন। তাঁর গোত্রবাসীও এ রীতিই পালন করতো। একবার আব্বাস (রাঃ) অর্ধ রজনীতে মূর্তিটির অর্চনা করছিলেন। এ সময় তিনি যেন একটি বাণী শুনতে পেলেন। তাতে বলা হয়েছিল যে, "শেষ যুগের পয়গাম্বরের আবির্ভাব ঘটেছে এবং জুমারের ধ্বংসের সময় এসে গেছে।" দ্বিতীয়বার জনৈক ব্যক্তি তাঁকে ঘুম থেকে জাগিয়ে একই ধরনের কথা বললেন। হযরত আব্বাস (রাঃ)–এর জন্য এ সতর্কবাণী যথেষ্ট ছিল। তিনি জুমারকে আগুনে নিক্ষেপ করে তৎক্ষণাৎ মদীনা রওয়ানা হয়ে গেলেন। মদীনা পৌঁছে রাসূল (সাঃ)–এর খিদমতে উপস্থিত হলেন এবং তাঁর হাতে মুসলমান হয়ে গেলেন। সে সময় প্রিয় নবী (সাঃ) মক্কা বিজয়ের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি (সাঃ) হযরত আব্বাস (রাঃ)–৭৮৮কে স্বগোত্রে ফিরে যাওয়ার এবং গোত্রের মুসলমানদেরকে সঙ্গে নিয়ে আল–কুদাইদ নামক স্থানে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের নির্দেশ দিলেন।

হযরত আব্বাস (রাঃ) স্বগোত্রে ফিরে গেলেন এবং অত্যন্ত শক্তি ও প্রভাবশালী ভাষায় লোকদের নিকট ইসলামের দাওয়াত দিলেন। বনু সুলাইমের বেশীরভাগ লোক তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলেন এবং নিজের মূর্তিকে আগুনে জ্বালিয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন। কিন্তু হযরত আব্বাস (রাঃ)–এর স্ত্রী হযরত হাবিবাহ বিনতে জাহহাকুস সুলামী ব্যতিক্রম ধর্মী আচরণ করলেন। সে তাওহীদের দাওয়াত কবুলের পরিবর্তে হযরত আব্বাস (রাঃ)–এর ইসলাম গ্রহণে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন এবং তাঁকে অনেক ভেড়া কথা শুনিয়ে পিতার বাড়ী চলে গেলেন। হযরত আব্বাস (রাঃ) রাসূল (সাঃ)–এর সঙ্গে কৃত ওয়াদাহ পূরণ করলেন এবং মক্কা বিজয়ের সময় (অষ্টম হিজরীর রমাদান মাসে) নিজের গোত্রের ৯ শত সশস্ত্র বাহাদুর সৈন্যসহ আল–কাদিদ নামক স্থানে হুযুর (সাঃ)–এর খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং মক্কা প্রবেশে তাঁর সহযাত্রী

হলেন। এমনিভাবে তিনি সে ১০ হাজার পবিত্র জনের অন্তর্ভুক্ত হলেন যাদের ব্যাপারে হাজার হাজার বছর পূর্বে ইসতিসনা গ্রন্থে এ ভবিষ্যবাণী করা হয়েছিল :

"খোদাওন্দ সিনা থেকে এলেন। শায়ির থেকে এসে ফারান পর্বতে আবির্ভূত হলেন। তাঁর দক্ষিণ হস্তে তাদের জন্য আলোকজ্জল শরীয়ত ছিল।"

এ সময় হযরত আব্বাস (রাঃ) একটি শক্তিশালী কাসিদাহ বললেন। এ কাসিদায় বিজয়ের আনন্দ প্রকাশ ও আল্লাহর শোকর আদায় করা হয়েছিল।

মক্কা বিজয়ের পর হযরত আব্বাস (রাঃ) বিন মিরদাস হুনাইন এবং তাউসের যুদ্ধে বাহাদুরীর চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। প্রিয় নবী (সাঃ) জিয়রানা নামক স্থানে হুনাইনের গণিমতের মাল বন্টন করলেন। এ সময় তিনি হযরত আব্বাস (রাঃ) কে "মুয়াল্লাফাতুল কুলুব"দের অন্তর্ভুক্ত করলেন। মুয়াল্লাফাতুল কুলুব বলতে সে সব প্রভাবশালী আরব নও-মুসলিম সরদার ছিলেন যাদের মন জয়ের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) খাতির আতির করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ খাতির দেখে যাতে অন্যান্য লোকও ইসলামের প্রতি অগ্রসর হয়। হযরত রাফে (রাঃ) বিন খাদিজ থেকে বর্ণিত আছে যে, গণিমতের মাল থেকে প্রতি মুয়াল্লাফাতুল কুলুবকে একশ' করে উট প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু কোন কারণে হযরত আব্বাস (রাঃ) কম সংখ্যক উট পেয়েছিলেন। তিনি অন্যান্য সরদারের তুলনায় নিজের অংশ কম দেখে এক কাসিদায় অভিযোগ করলেন। হুযুর (সাঃ) এ কাসিদাহ শুনে হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুকে বললেন, "তার জবান কেটে দাও।" হযরত আলী (রাঃ) হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর হাত ধরলেন এবং বললেন, আমার সঙ্গে চলো। পথে হযরত আব্বাস (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-কে বললেন, হে আলী! আপনি কি আমার জিহ্বা কেটে ফেলবেন? তিনি বললেন, তুমি আমার সাথে এসো। আমি রাসূল (সাঃ)-এর নির্দেশ পালন করবো। মোট কথা তিনি হযরত আব্বাস (রাঃ)-কে উটের পালে নিয়ে গেলেন এবং তাকে বললেন, এ পাল থেকে নিজের পছন্দ অনুযায়ী একশ' উট বেছে নাও। তিনি একশ' উট বেছে নিলেন এবং খুব খুশী হয়ে গেলেন।

হুনাইন এবং আওতাস যুদ্ধের পর হযরত আব্বাস (রাঃ) তায়েফের যুদ্ধে প্রিয় নবী (সাঃ)-এর সঙ্গী হিসেবে যোগদান করার সৌভাগ্য লাভ করলেন। ইবনে হিশাম (রঃ) বর্ণনা করেছেন, তিনি প্রত্যেক যুদ্ধ শেষে অত্যন্ত শক্তিশালী কাসিদাহ বলতেন।

www.amarboi.org

ইবনে সায়াদ (রঃ) "তাবকাতে" লিখেছেন, উল্লিখিত যুদ্ধ ছাড়া হযরত আব্বাস (রাঃ) বিন মিরদাস অন্যান্য যুদ্ধেও শরীক হয়ে ছিলেন। লড়াইয়ের সময় আগমন করতেন এবং যুদ্ধ শেষে স্বদেশে (বনু সুলাইমের এলাকা) ফিরে যেতেন। দশম হিজরীতে বিদায় হজ্বেও তিনি হুযুর (সাঃ)-এর সহযাত্রী ছিলেন। ইবনে মাজাহ (রঃ) এবং বাইহাকী (রঃ) বিদায় হজ্ব প্রসঙ্গে হযরত আব্বাস (রাঃ) বিন মিরদাসের এ বর্ণনা উল্লেখ করেছেনঃ

"রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সন্ধ্যায় আরাফাতের ময়দানে নিজের উম্মাতের ক্ষমার জন্য দোয়া করলেন। আল্লাহ তায়ালা রাসূল (সাঃ)-এর দোয়া কবুল করে বললেন, আমি সবাইকেই ক্ষমা করে দিয়েছি। কিন্তু যালেমকে ক্ষমা করবো না এবং মযলুমের হক তার থেকে অবশ্যই আদায় করবো। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহর দরবারে আরজ করলেন, হে আল্লাহ তুমি চাইলে মযলুমকে জান্নাত দান কর এবং যালেমকে ক্ষমা করো। কিন্তু এ দোয়া আরাফার সন্ধ্যায় কবুল করা হয়নি। অতপর যখন মুজদালিফায় সকাল হলো তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পুনরায় একই দোয়া করলেন, এবং তাঁর (সাঃ) ইচ্ছা অনুযায়ী এ দোয়া কবুল করে নেয়া হলো। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা যালেমকেও ক্ষমা করে দিলেন। বর্ণনাকারী বলেছেন, দোয়া কবুলের পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হাসলেন অথবা মুচকি হাসি দিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং হযরত ওমর (রাঃ) আরজ করলেন, আমাদের মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। এটাতো হাসার সময় নয়। আপনাকে কোন্ জিনিস হাঁসিয়েছে। আল্লাহ তায়ালা আপনাকে সব সময় হাসিয়ে আসছেন। তিনি বললেন, আল্লাহর দুশমন ইবলিস যখন জানতে পেল যে, আল্লাহ পাক আমার দোয়া কবুল করেছেন এবং আমার উম্মাতকে ক্ষমা করে দিয়েছেন তখন মাথায় মাটি মেখে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে পালিয়ে গেল। তাকে এ পেরেশানী অবস্থায় দেখে আমার হাসি পেল।" (মিশকাত শরীফ)

চরিতকাররা হযরত আব্বাস (রাঃ) বিন মিরদাসের ওফাতের সাল সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানাননি। তবে এতটুকুন জানা যায় যে, তিনি হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর শাসনামলে জীবিত ছিলেন। ইবনে সায়াদ (রাঃ) বলেছেন, তিনি বসরার নিকট স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি প্রায়ই শহরে আসতেন। বসরাবাসী তাঁর নিকট থেকে হাদীস শুনতেন।

www.amarboi.org

ফজিলত এবং কামালিয়াতের দিক থেকে যদিও হযরত আব্বাস (রাঃ) বিন মিরদাস কোন বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন না তবুও তাঁর থেকে বর্ণিত কতিপয় হাদীস, হাদীসের কিতাবে পাওয়া যায়।

আল্লামা ইউসুফ বিন যাকিউল মাযি (রঃ) "তাহজিবুল কামাল" গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর সন্তান কিনানাহ (রাঃ) তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর পুত্র জুলহমাহ (রাঃ)-ও হাদীস বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি রাসূল (সাঃ)-এর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

* * *

www.amarboi.org

# হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমের

চতুর্থ হিজরীর কথা। রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের নিকট একটি নবজাতককে আনা হলো। রাসূল (সাঃ)-এর যুগে মুহাজির ও আনসারদের তৈরী নিয়ম অনুসারে নিজেদের নবজাতককে নবী (সাঃ)-এর নিকট আনতেন এবং তার কল্যাণের জন্যে দোয়া কামনা করতেন। এ শিশুকেও সে নিয়ম অনুযায়ী প্রিয় নবী (সাঃ)-এর খিদমতে আনা হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) শিশুটির ওপর স্নেহের দৃষ্টি ফেললেন। অতপর তার মুখে নিজের লালা দিয়ে তার জীবন, সুস্বাস্থ্য এবং সৌভাগ্যের দোয়া করলেন। শিশুটি রাসূল (সাঃ)-এর মুখের পবিত্র লালা মজার সাথে গিলে ফেললো। এ সময় রাসূল (সাঃ) বললেন ঃ "এই শিশু বড় হয়ে মুসাকী অর্থাৎ পিপাসার্তদের পানি পান করাবে।"

আরবে পিপাসার্তদের পানি পান করানেওয়ালাকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান এবং উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন মনে করা হতো। এ ভাগ্যবান শিশু যার মুখে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজের মুখ নিঃসৃত লালা রেখেছিলেন এবং যার ব্যাপারে পিপাসার্তদের পানি পান করানেওয়ালা হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছিলেন তিনি হলেন হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমের।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমের কুরাইশের সম্ভ্রান্ত বংশ বনু আবদি শামসের চোখের মনি ছিলেন। তাঁর পিতা আমের বিন কুরাইজ রাসূল (সাঃ)-এর ফুফু আল- বাইজা বিনতে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র ছিলেন। এ সম্পর্কে আমের বিন কুরাইজ প্রিয় নবী (সাঃ)-এর ফুফাতো ভাই এবং আবদুল্লা (রাঃ) বিন আমের তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল। এমনিভাবে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর ফুফু আরওয়া বিনতে কুরাইজ হযরত ওসমান জুন্নুরাইন (রাঃ)-এর মাতা ছিলেন। এ আত্মীয়তার সূত্রে হযরত ওসমান গনি (রাঃ) আবদুল্লাহ বিন আমেরের (রাঃ) ফুফাতো ভাই ছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর নসবনামা হলো ঃ আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমের বিন কুরাইজ বিন রবিয়াহ বিন হাবিব বিন আবদি শামস বিন আবদি মান্নাফ বিন কুসাই।

www.amarboi.org

আবদি মান্নাফে গিয়ে তাঁর বংশ ধারা রাসূল (সাঃ)-এর নসবনামার সাথে মিলে যায়। হুযুর (সাঃ)-এর পরদাদা হাশিম বিন আবদি মান্নাফ, হযরত আবদুল্লাহ বিন আমের (রাঃ)-এর উর্ধতন দাদা আবদি শামস বিন আবদি মান্নাফের সহোদর ছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমের শিশু সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকেন। রাসূল (সাঃ)-এর যুগে ও সিদ্দিকী শাসনামলে তাঁর শৈশবকাল অতিবাহিত হয়। ওমর ফারুক (রাঃ)-এর শাসনকালে তিনি ছিলেন যুবক। চরিতকাররা রিসালাতকাল এবং শাইখাইনের (আবুবকর ও ওমর) আমলে তাঁর তেমন কোন কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করেননি। অবশ্য প্রমাণাদিতে এটা বুঝা যায় যে, তাঁর শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ অত্যন্ত সুন্দরভাবে হয়েছিল। কেননা, পরবর্তীতে তিনি নিজের সামরিক এবং ব্যবস্থাপনার যোগ্যতানুসারে শুধুমাত্র এক মহান ব্যক্তি হিসেবেই পরিগণিত হননি, বরং নিজের বদান্যতা ও দানশীলতা, ব্যক্তিগত সচ্চরিত্র এবং জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য জনসাধারণের মাঝে এক বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন। সামরিক যোগ্যতা অনুসারে নির্দ্বিধায় তাঁকে প্রথম যুগের একজন মহান মুসলমান জেনারেলের কাতারে স্থান দেয়া যায়।

সাধারণ বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আবদুল্লাহ বিন আমের (রাঃ) ২৯ হিজরীতে প্রথম দৃশ্যে আসেন। এ সময় তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান জুন্নুরাইন (রাঃ) তাঁকে হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রাঃ)-এর স্থলে বসরার গবর্ণর নিয়োগ করেন। কিন্তু মাওলানা সাইয়েদ আবু জাফর নদভী "সিন্ধুর ইতিহাস" গ্রন্থে লিখেছেন যে, এর পূর্বে হযরত ওসমান (রাঃ) তাঁকে সিসতানের অভিযানে প্রেরণ করেছিলেন। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর শাসনামলেই যদিও সিসতান বিজিত হয়েছিল তবুও সিসতান প্রদেশের অংশ বিশেষ কাবুল তখনও বিজিত হয়নি।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমের সিসতান পৌঁছে সেখান থেকে কাবুলের ওপর হামলা এবং শহর অবরোধ করলেন। কাবুলবাসী শহর থেকে বের হয়ে অত্যন্ত বীরত্ব ব্যঞ্জক লড়াই করলো। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমের তাদেরকে পরাজিত করলেন এবং কাবুলে ইসলামের ঝাণ্ডা উড্ডীন করলেন। এটি ভারতবর্ষের সেই দরজা যা মুসলমানেরা তরবারীর জোরে জয়লাভ করেছিল। কিন্তু যখন আরব বাহিনী ফিরে গেল তখনই কাবুল আবার স্বাধীন হয়ে গেল।

২৯ হিজরীতে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমের বসরার গবর্ণরীর দায়িত্ব নিলেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল ২৫ বছর। এটা ছিল তাঁর সাহস ও বীরত্বের চরম উৎকর্ষকাল। সে সময় বসরা প্রদেশের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। বসরার গবর্ণরকে

সা-২/৮-

www.amarboi.org

তখন প্রাচ্য দেশসমূহের সবচেয়ে বড় শাসক হিসেবে গণ্য করা হতো। তিনি বসরা এসে নিজের শাসনাধীন এলাকাসমূহের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলেন। কাবুলসহ সমগ্র বিজিত এলাকা তখন বিদ্রোহীদের হাতে ছিল। এতে তিনি পেরেশান হলেন। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তিনি শুধু বিদ্রোহীদেরকেই অনুগত করবেন না বরং দখলকৃত এলাকা ছাড়া অন্যান্য এলাকাও ইসলামের অধীনস্ত করবেন। এ লক্ষ্যে তিনি জিহাদের আবেগে সিক্ত জীবন পণকারী মুজাহিদদের সমন্বয়ে বিভিন্ন বাহিনী গঠন করলেন এবং তাদেরকে অভিজ্ঞ অফিসারদের নেতৃত্বে বিভিন্ন এলাকা দখলের জন্য নিয়োগ করলেন। সর্ব প্রথম তিনি স্বয়ং এক শক্তিশালী বাহিনীসহ পারস্যের ওপর চড়াও হলেন এবং আসতখর, দুরাবে জারদ এবং জুর (ফিরোজাবাদ) দখল করে এ প্রদেশ বিজয়ের পূর্ণতা দান করেন। ইবনে আছির (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, যে সময় তিনি জুর দখলে ব্যস্ত ছিলেন সে সময় আসতখরবাসী বিদ্রোহ করে বসলো এবং সেখানকার মুসলমান শাসককে হত্যা করে ফেললো। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) জুর জয়ের পর আসতখরের দিকে দৃষ্টি দিলেন এবং এক ধাওয়াতেই তা দ্বিতীয়বার জয় করে বিদ্রোহীদেরকে সমুচিত শাস্তি দিলেন। এরপর তিনি কারবান এবং কেশজান শহর দখল করলেন এবং অন্য এক বাহিনী প্রেরণ করে কিরমানের বিভিন্ন এলাকা অনুগত করলেন।

সিসতানের কাবুলবাসী মুসলমানদের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) তাদের দমনের জন্যে আবদুল্লাহ বিন উমায়ের লাইসীকে সিসতানের শাসক নিয়োগ করে পাঠালেন। তিনি সেখানে পৌঁছেই কাবুলের ওপর হামলা করে বসলেন এবং বিদ্রোহীদেরকে পর্যুদস্ত করে কাবুল দখল করে নিলেন। এ সব ঘটনা ২৯ হিজরীতে ঘটেছিল।

৩০ হিজরীতে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমের প্রচণ্ড ঝড়ের বেগে খোরাসানের দিকে অগ্রসর হলেন এবং হিযাতেলাতে (EPHTHALITES) পরাজিত করে দু'তিন বছরের মধ্যে মারদ, বলখ এবং হিরাত পর্যন্ত সমস্ত এলাকা করায়ত্ব করে নিলেন। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) একদিকে নিজে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহতে ব্যস্ত ছিলেন। অন্যদিকে অধীনস্ত অফিসারদেরকে বিজয়ের জন্যে বিভিন্ন দিকে প্রেরণ করছিলেন। আহনাফ বিন কায়েসকে কোহেস্তান, ইয়াযিদ জারাশীকে রাস্তাকযাম, আসওয়াদ বিন কুলসুমকে রাস্তাক বাহাক এবং আবদুল্লাহ বিন মুয়াম্মারকে মাকরান পদানত করার জন্য নিয়োগ করেন।

www.amarboi.org

আল্লামা বালাজুরী (রঃ) বর্ণনা করেছেন, সে যুগেই হযরত ওসমান (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমেরকে পত্র লিখলেন। তিনি এ পত্রে ভারত বর্ষের অবস্থা জানার জন্য কাউকে প্রেরণের কথা বলেছিলেন। তিনি হাকিম বিন জাবালা আবদীকে প্রেরণ করলেন। সে ফিরে এলে হযরত ওসমান (রাঃ) তাঁকে সেখানকার অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন। তিনি আরজ করলেন ঃ "আমীরুল মু'মিনিন! সেখানে পানি খুব কম এবং সেখানকার মানুষ ডাকাত। স্বল্প সংখ্যক সৈন্য সেখানে গেলে তাদেরকে লুটে নেয়া হবে। আর বেশী সংখ্যক গেলে পিপাসায় শেষ হয়ে যাবে।"

এরপর হযরত ওসমান (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমেরকে নির্দেশ দিলেন যাতে তার সৈন্য ভারতবর্ষে প্রবেশ না করে।

এ বর্ণনা সন্দেহ যুক্ত মনে হয়। কেননা হযরত আবদুল্লাহ বিন আমের (রাঃ)-এর একজন জেনারেল আবদুর রহমান (রাঃ) বিন সামুরাহ বর্তমান বেলুচিস্তানে প্রবেশ করে কয়েকটি স্থান জয় করে নিয়েছিলেন। সে সময় হযরত ওসমান গনি (রাঃ)-এরই শাসনকাল ছিল। যদি হযরত ওসমান (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমের (রাঃ)-কে কোন নিষেধাজ্ঞামূলক নির্দেশ দিতেন তাহলে তিনি কখনই নিজের কোন সামরিক অফিসারকে ভারতবর্ষের সীমানায় প্রবেশের অনুমতি দিতেন না।

ইবনে আছির (রঃ) সম্পূর্ণ একই ধরনের ঘটনা হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর শাসনকালের বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন। শুধু পার্থক্য এতটুকুন যে, তাতে ভারতবর্ষে গমনকারী ব্যক্তির নাম হাকিম বিন জাবালা আবদীর পরিবর্তে সাহার আবদী বলা হয়েছে। ধারণা করা হয় যে, বিভিন্ন কারণে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) মুসলমানদেরকে ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হওয়া থেকে নিষেধ করেছিলেন।

বিভিন্ন অভিযানে নিয়োগকৃত হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমেরের সামরিক অফিসারদের সাফল্য এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সব অফিসার হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর নিকট থেকেই নির্দেশাবলী পেতেন।

হযরত ইবনে আমের (রাঃ) আবদুল্লাহ বিন উমাইর লাইছীকে সিসতান এবং আবদুর রহমান বিন উবাইসকে কারমানের শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন। তাঁরা উভয়েই সেখানে শান্তি-শৃংখলা বিধানের জন্য অত্যন্ত সুবন্দোবস্ত করেছিলেন। কিন্তু উভয়

www.amarboi.org

প্রদেশের বাসিন্দাই বিশৃংখলা প্রিয় ছিল। কোন না কোন ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি করেই রাখতো। ইবনে আমের (রাঃ) এ সব ঘটনার খবর পেয়ে নিজেই খোরাসান গেলেন। ইবনে আছির (রঃ)–এর বর্ণনা অনুযায়ী সিসতানের শাসনভার রবি বিন যিয়াদ হারছিকে অর্পণ এবং মাজাশি বিন মাসউদকে কারমানের গবর্ণর নিয়োগ করলেন।

মাজাশি (রঃ) বিন মাসউদ কারমান পৌঁছে সেখানকার গুরুত্বপূর্ণ শহর হুমাইদ দখল করলেন। তারপর বিশৃংখলাকারীদেরকে উৎখাত করে সিসতানের রাজধানী "সায়েরজানের" ওপর আধিপত্য কায়েম করলেন।সাধারণ নাগরিকদেরকে তিনি ক্ষমা করলেন। কিন্তু বিদ্রোহী ও বিশংখলা সৃষ্টিকারীদের নেতাদেরকে বহিস্কার করলেন। তারপর তিনি জিরফত দখল করলেন। অতপর কাফাসের পর্বতমালায় এক রক্তাক্ত যুদ্ধে সেখানকার জনগণকে অনুগত বানালেন।

"কাফাস" সম্পর্কে মাওলানা সাইয়েদ আবু জাফর নদভী "তারিখে সিন্ধ"–এ এ ধারণা পোষণ করেছেন যে, কাফাস দৃশ্যত কাবাচের অংশ বিশেষ। এর অর্থ হলো তারা কাবচাকের (তুরকিস্তান) বাসিন্দা ছিল এবং সেখান থেকে হিজরত করে (অথবা বিজয়ীর বেশে) কোন এক সময় ভারতবর্ষের পশ্চিমে পাহাড়ী এলাকায় এসে বসতি স্থাপন করে। সম্ভবতঃ তাদেরকেই বর্তমানে পাঠান ও বালুচ বলা হয়।

আহনাফ বিন কায়েস (রঃ) কাহসিতানের দিকে অগ্রসর হলেন। এ সময় তুর্কীরা ইবনে আমের (রাঃ)–এর খিদমতে একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে সন্ধি করলো। এক বর্ণনায় এও বলা হয়েছে যে, আহনাফ (রঃ) তরবারীর জোরে পরাজিত করে কাহসিতান দখল করে নেন।

ইয়াযিদ তারশী (রঃ) রাস্তাক জামের বিভিন্ন এলাকায় হামলা চালিয়ে বাখরজ, রাস্তাকে জাম এবং জাভিদ দখল করলেন। আসওয়াদ বিন কুলছুম (রাঃ) রাস্তাক বাহাকের ওপর হামলা করলেন। কিন্তু তিনি এ যুদ্ধে শহীদ হয়ে গেলেন। তবে তাঁর স্থলাভিষিক্ত আওহাম বিন কুলছুম (রঃ) শত্রুদের পরাজিত করে বাহাকের ওপর ইসলামের ঝাণ্ডা উড্ডীন করলেন।

উবাইদুল্লাহ বিন মুয়াম্মার (রঃ) মাকরানে কদম মজবুত করে সকল বিদ্রোহীকে উৎখাত করলেন এবং বিজয়ের পর বিজয় অব্যাহত রেখে ভারতবর্ষের সীমান্তে পৌঁছে গেলেন।

রবি বিন যিয়াদ (রঃ) সিসতান পৌঁছে যালিক দূর্গ দখল করলেন। কিন্তু যখন যালিকবাসী আনুগত্যের শপথ করলো তখন দূর্গটি তাদের নিকট প্রত্যার্পণ করা হলো।

www.amarboi.org

এরপর তিনি কয়েকটি রক্তাক্ত সংঘর্ষের পর কারকবিয়া, যাশত, নাশরোষ এবং শারওয়াষ শহর দখল করে নিলেন। পরে তিনি যারানজ অবরোধ করলেন। যারানজবাসী প্রথমে দূর্গবন্দী হয়ে খুব মুকাবিলা করলো। কিন্তু অবরোধের কঠোরতায় অস্থির হয়ে সন্ধির পয়গাম প্রেরণ করলো। রবি ক্ষমার ওয়াদা করে তাদের শাসককে ডেকে পাঠালেন। এদিকে তিনি নিজের সৈন্যদেরকে এমন পোশাক পরালেন এবং তাদের আকৃতি এমন বানালেন যে, দেখে ভীত হতে হয়। অতপর নিজে একটি লাশের পিঠের ওপর বসে পড়লেন। এবং অপর একটি লাশ বালিশ হিসেবে পেছনে রেখে দিলেন। যারানজের শাসক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য এসে এ অবস্থা দেখে ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগলো এবং কোন বাদানুবাদ বা আলোচনা ছাড়াই মুসলমানদের শর্ত মেনে শহরের দরজা খুলে দিলেন, যারানজ দখলের পর রবি সানারোজ নদী পার হয়ে "আত্তাবল রুস্তম" নামক একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে হামলা করে বসলেন। প্রথমে সেখানকার বাসিন্দারা মুকাবিলা করলো। কিন্তু যখন দেখলো যে, মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করা তাদের শক্তি ও সামর্থের বাইরে তখন অস্ত্র ফেলে দিয়ে আনুগত্য প্রকাশ করলো। মোট কথা, রবি সমগ্র সিসতানে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত করে ফিরে এলেন। এক বছর পর তিনি নিজের এক নায়েবকে সিসতানে রেখে আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমের (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য খোরাসান এলেন। তিনি সিসতান যেতেই বিদ্রোহীরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো এবং নায়েবকে সিসতান ছাড়তে বাধ্য করলো। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমের এ খবর পেয়ে এক অভিজ্ঞ জেনারেল হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) বিন সামুরাহকে নতুন করে সিসতান দখলের জন্য নিয়োগ করলেন এবং সাথে সাথে তাঁকে ইমামতের দায়িত্বও দিয়ে দিলেন। হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) সাহাবী হওয়া ছাড়াও উন্নত ধরনের সামরিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি আট হাজার জীবন উৎসর্গকারী বাহিনীসহ সিসতান প্রবেশ করলেন এবং সকল বাধা পর্যুদস্ত করে যারানজ পৌঁছে গেলেন। যারানজের ইরানী শাসক ইরান বিন রুস্তম শহরের দরজা বন্ধ করে দিল। কিন্তু অবশেষে সেখানে অবস্থানের শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেল। সে বিশলাখ দিরহাম এবং দু'হাজার গোলাম দিয়ে মুসলমানদের আনুগত্য কবুল করে নিল।

অন্য এক রাওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, যেদিন হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) যারানজের ওপর হামলা করেন, সেদিন যারানজবাসী কোন পর্বের আনন্দে মশগুল ছিল। হঠাৎ করে মুসলমানদেরকে মাথার ওপর দেখে তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো এবং কোন বাধা ছাড়াই আনুগত্য কবুল করে নিল।

www.amarboi.org

যারানজ করতলগত করার পর হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) যারানজ এবং কাশের মধ্যবর্তী এলাকাসমূহের ওপর তাওহীদের ঝাণ্ডা বুলন্দ করলেন। এ প্রসঙ্গে মাওলানা সাইয়েদ আবু জাফর নদভী নিজের লিখা পুস্তক "তারিখে সিন্ধ"–এ লিখেছেনঃ

"আবদুর রহমান (রাঃ) বিন সামুরাহ যারানজ এবং কাশের মধ্যবর্তী সকল এলাকা দখল করে নিয়েছিলেন। এ এলাকা যদিও বর্তমানে বেলুচিস্তানের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু সে যুগে তা ভারতবর্ষের অধীন ছিল। কেননা সে সময় বেলুচিস্তান নামে কোন প্রদেশ ছিল না। এমনকি মাকরান এবং সিসতানও সিন্ধুর সাথে যুক্ত ছিল। এ দিক থেকে ভারতবর্ষের মাটিতে এ প্রথম হামলা যা শুষ্ক এলাকা দিয়ে সংঘটিত হয়েছিল এবং এটিই ভারতবর্ষের প্রথম এলাকা যা মুসলমানদের অধীনে এসেছিল। আর স্বয়ং রাসূল (সাঃ)–এর একজন সাহাবী (রাঃ)–এর পবিত্র হাতে তা বিজিত হয়েছিল।

মূর্তি পূজার দেশ ভারতবর্ষে হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) বিন সামুরাহই তাওহীদের প্রদীপ প্রজ্বলনকারী মুজাহিদদের নেতা ছিলেন। তিনিই ভারতবর্ষে অন্যান্য মুসলিম বিজেতাদের (মুহাম্মাদ বিন কাসিম, শাহাবুদ্দীন ঘোরী এবং মাহমুদ গজনীর) অগ্রপথিক ছিলেন।

এরপর হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) রাখজের দিকে অগ্রসর হলেন এবং দাদনের (অথবা দাওয়া) গুরুত্বপূর্ণ শহরে পৌঁছলেন। এ শহরের সন্নিকটে এক পাহাড়ের ওপর এক বিরাট মন্দির ছিল। মন্দিরটি একটি মজবুত দূর্গাকৃতির ছিল। সেখানে যন্তর নামক দেবতার মূর্তি স্থাপিত ছিল। এ দেবতার নামানুসারেই পাহাড়টির নামকরণ করা হয়েছিল" কোহে যন্তর"। এ মন্দির মূর্তি পূজারীদের নিকট অত্যন্ত পবিত্র স্থান ছিল। তারা দূর–দূরান্ত থেকে তা দর্শনে আসতো এবং বহু মূল্যবান উপঢৌকন মূর্তির পায়ের তলায় রাখতো। দাদনবাসী পালিয়ে সে মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করলো এবং শহরের দরজা বন্ধ করে দিলো। হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) মন্দির এবং শহর অবরোধ করলেন। তিনি এত কঠোরতা অবলম্বন করলেন যে, মূর্তিপূজারীদেরকে একটি বিরাট অংক দিয়ে সন্ধি করতে বাধ্য হতে হলো। আল্লামা ইবনে আছির (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) দাদনের মন্দিরে প্রবেশ করে দেখতে পেলেন বিরাট এক খোদিত মূর্তি। তার চোখে অত্যন্ত মূল্যবান হীরা বসানো রয়েছে। হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) প্রথমে বর্শা দিয়ে মূর্তির চোখ বের করে ফেললেন। অতপর হাত ভেঙে দিলেন। এরপর তিনি সেখানকার শাসক ও অধিবাসীদেরকে সম্বোধন করে বললেনঃ

"হে মানুষেরা! এ হীরা এবং মূর্তির ভগ্ন হাত ওঠিয়ে নাও। তাতে আমার কোন প্রয়োজন নেই। আমি এ কাজ শুধু তোমাদেরকে দেখানোর জন্যে করেছি যে, মূর্তি

www.amarboi.org

কখনো উপকার অথবা ক্ষতি সাধন করতে পারে না। এ জন্যে তার ইবাদাত করার অর্থই হলো নিজকে ধ্বংস করা। হে মানুষেরা! আল্লাহই একমাত্র উপাস্য। তিনিই প্রত্যেক বস্তুর মালিক এবং তিনিই উপকার ও ক্ষতি সাধনের ক্ষমতা রাখেন। যদি তোমরা আল্লাহর ওপর ঈমান আনো তা'হলে আশা করা যায় যে, তিনি তোমাদের অন্তর খুলে দেবেন এবং তোমরা দ্বীন ইসলাম ভালোভাবো বুঝতে সক্ষম হবে।''

দাদনের পর হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) যাবল (গজনীহ) এবং বাস্‌ত জয় করলেন। অতপর যারানজ ফিরে এলেন। নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা লিখেছেন, হযরত আবদুর রহমান (রাঃ)-এর বাহিনীতে গাজা হাসান বসরী (রঃ) এবং অন্যান্য অনেক আলেম এবং ফকিহ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এ সব বুজর্গ ব্যক্তি বিজিত এলাকাসমূহে ইসলামের প্রসার ও প্রচারের কাজে ব্যাপক প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। যার ফলশ্রুতিতে বহুসংখ্যক মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমের একদিকে নিজের জেনারেলদেরকে যুদ্ধে ব্যস্ত রেখেছিলেন। অন্যদিকে স্বয়ং ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ ফি সাবিলিল্লায় মশগুল ছিলেন। বস্তুতঃ তিনি আশবান্দ, যাদাহ, বাশত, আসফারায়েন, গাওয়াফ, রাখ এবং আরইয়ান শহরসমূহ জয় করতে করতে নিশাপুরের রাজধানী আবর শহর পর্যন্ত পৌছে গেলেন এবং তা অবরোধ করলেন। শহরবাসী কয়েকমাস পর্যন্ত মুকাবিলা করলো। কিন্তু এক রাতে মুসলমানদেরকে শহরের ছোট বড় সড়কে ঘুরতে ফিরতে দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেল। এর ফলে শহরের কতিপয় রক্ষী অত্যন্ত সংগোপনে ইবনে আমের (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে জীবন রক্ষার প্রতিশ্রুতি নিয়ে শহরের একটি দরজা খুলে দিল। মুসলমানরা বাইরে অপেক্ষমান ছিল। তারা তৎক্ষণাৎ শহরে প্রবেশ করলো। শহরের শাসক সেনাবাহিনীর কয়েকটি দলসহ দূর্গে আশ্রয় নিল। কিন্তু সেও বেশীদিন অবরোধের কঠোরতা বরদাশত করতে না পেরে বার্ষিক দশ লাখ দিরহাম খিরাজ দানের প্রতিশ্রুতিতে সন্ধি করলো। এভাবে নিশাপুরের সকল প্রদেশ মুসলমানদের অধীনে এলো।

নিশাপুর দখলের পর হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমের আবদুল্লাহ বিন খাযেমকে ''নিসা''র দিকে প্রেরণ করলেন। নিসা'র শাসক তিন লাখ দিরহামের প্রতিশ্রুতিতে সন্ধি করলো। তার এ সন্ধি দেখে আবইউরের শাসকও চার লাখ দিরহাম রাজস্ব প্রদান মঞ্জুর করলো। এ থেকে ইবনে আমের (রাঃ) আবদুল্লাহ বিন খাযেমকে সারাখাস দখলের জন্য নিয়োগ করলেন। তিনি সারাখাসের ওপর হামলা চালালে সেখানকার শাসক যাদবিয়াহ মামুলি ধরনের বাঁধা দানের পর আনুগত্য স্বীকার করে নিল। সারাখাস থেকে, ইবনে খাযেম ইয়াযিদ বিন সালেমের নেতৃত্বে কিছু সৈন্য প্রেরণ করে কাইফ এবং নাবিতা শহর জয় করে নিলেন। তওসের শাসক মুসলমানদের বিজয় বন্যা নিজের দিকে ধাবিত হতে

www.amarboi.org

দেখে সশরীরে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমের (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বার্ষিক ছ'লাখ দিরহাম রাজস্ব প্রদানের ওয়াদা করলো এবং ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্যের ঘোষণা দিল।

আবদুল্লাহ বিন খাযেমকে সারাখাসের দিকে প্রেরণ করে ইবনে আমের (রাঃ) নিজেও বসে থাকলেন না। তিনি এক শক্তিশালী বাহিনীসহ হিরাতের দিকে অগ্রসর হলেন। হিরাতের শাসক মুসলমানদের অগ্রাভিযানের খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমেরের খিদমতে উপস্থিত হয়ে জিযিয়া প্রদানে রাজী হয়ে আনুগত্য ঘোষণা করলো। তাঁর দেখাদেখি মরদে শাহজাহানের শাসকও জিযিয়া প্রদানে সম্মত হলো এবং বার্ষিক ২২ লাখ দিরহাম প্রদানের আনুগত্যনামা লিখে দিল। এবার ইবনে আমের (রাঃ) আহনাফ বিন কায়েস (রঃ)-কে তাখারিস্তান প্রেরণ করলেন। তিনি কয়েকটি দুর্গ ও শহর অনুগত করার পর তাখারিস্তানের কেন্দ্রীয় শহর মারওয়াররোজ অবরোধ করলেন। শহরবাসী প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধ করলো। কিন্তু অবশেষে আনুগত্য স্বীকার করলো। ইত্যবসরে হযরত আহনাফ (রঃ) খবর পেলেন যে, বিপুল সংখ্যক শত্রু জুজজানে একত্রিত হয়েছে। তিনি হযরত আকরা (রাঃ) বিন হাবিস তামিমিকে তাদের উৎখাতের জন্য প্রেরণ করলেন। হযরত আকরা (রাঃ) শত্রু বাহিনীকে পরাজিত করে জুজজান জয় করে নিলেন। এক্ষণে হযরত আহনাফ তালকান ও ফারিয়াবের দিকে অগ্রসর হলেন এবং শহর দু'টি জয় করে বলখ পৌঁছে গেলেন। বলখবাসী মুকাবিলার সাহস না পেয়ে বার্ষিক চার লাখ দিরহাম রাজস্ব প্রদানের ওয়াদা করে সন্ধি করে নিল।

ওদিকে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমের জিহুন (OXUS) নদী পার হয়ে মা ওরাউননাহর প্রবেশ করলেন। মা ওরাউন্নাহারবাসী মুসলমানদের শক্তি সম্পর্কে পরিজ্ঞাত ছিল। তারা মুকাবিলার পরিবর্তে সন্ধির মধ্যেই কল্যাণ দেখতে পেল। বস্তুতঃ তাদের একটি প্রতিনিধি দল অসংখ্য ঘোড়া। রেশমী কাপড়, দাস-দাসী এবং বিভিন্ন ধরনের উপঢৌকনসহ হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমেরের নিকট উপস্থিত হয়ে সন্ধির দরখাস্ত করলো। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) তাদের দরখাস্ত কবুল করলেন এবং কায়েস ইবনুল হাইছামকে মা ওরাউন্নাহরে নিজের ভারপ্রাপ্ত নিয়োগ করে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করলেন।

সকল নেতৃস্থানীয় চরিতকারই হযরত ওসমান (রাঃ)-এর শাসনকালে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমেরের ব্যাপক বিজয়ের কথা বিস্তৃত আকারেই বর্ণনা করেছেন। মা ওরাউন্নাহার, ইস্পাহান, হালওয়ান, কারমান, সারাখাস, গজনী, কাবুল, হিরাত, মারদ, আসতাখার, নিশাপুর প্রভৃতি তাঁর হাতে প্রথম অথবা দ্বিতীয়বার বিজিত হয়। এমনকি মুসলমানরা বেলুচিস্তান পর্যন্ত পৌঁছে যান।

www.amarboi.org

ইবনে আমের (রাঃ)-এর বিজয়াবলীর ঘটনাসমূহ পাঠ করে জানা যায় যে, তিনি একজন সাহসী এবং বীর সেনাপতি ছিলেন এবং সে সময় সামরিক যোগ্যতায় এক নজীরবিহীন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর বিজয়সমূহের এক উল্লেখযোগ্য দিক হলো যে, তিনি যথাসম্ভব রক্তপাত এড়িয়ে গিয়েছিলেন। যেসব শহর ও এলাকার বাসিন্দারা সন্ধির আবেদন করেছিল তিনি তা কবুল করে তাদের নিরাপত্তা প্রদান করেছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমের বিজয়সমূহ সম্পন্ন করে হজ্বের মওসুমে বসরা থেকে মক্কা এসে শুকরানা হজ্ব আদায় করলেন। হজ্বের পর তিনি প্রথম মক্কায় এবং পরে মদীনায় গিয়ে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে পুরস্কার ও দানের বৃষ্টিবর্ষণ করলেন। ইবনে আছির (রঃ) বর্ণনা করেছেন, ব্যাপক বিজয়কালে প্রাপ্ত প্রভূত গণিমতের মালের বেশীরভাগই তিনি মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছিলেন। মুহাজির এবং আনসারদের মধ্যে এ দানের বিরাট প্রভাব পড়েছিল। তারা ইবনে আমের (রাঃ)-কে প্রভূত দোয়া করেছিলেন। এ কাজ শেষে তিনি নিজের রাজধানী বসরা ফিরে আসেন এবং হযরত ওসমান জুন্নুরাইনের নির্দয় শাহাদাত পর্যন্ত স্ব-দায়িত্ব পালন করেন।

"দায়েরায়ে মায়ারেফে ইসলামিয়া" গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, বিদ্রোহীরা খিলাফত ভবন অবরোধকালে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমের আমীরুল মু'মিনিনকে সাহায্য করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তা নিষ্ফল হয়। অধিকাংশ বর্ণনায় জানা যায় যে,হযরত উসমান (রাঃ)-এর মনের পবিত্রতা এমন চরম পর্যায়ে পৌছে ছিল যে, তিনি মুসলমানদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ এবং মদীনার হেরেমকে মুসলমানের রক্তে রঞ্জিত হওয়া থেকে রক্ষার জন্য নিজের গভর্ণরদের সাহায্যই তলব করেননি। নচেৎ লাখ লাখ বর্গ মাইল বিজয়কারী ও জীবন উৎসর্গকারী জেনারেলরা যদি নিজেদের বাহিনীসহ আমীরুল মু'মিনিনের সাহায্যে পৌছতেন তাহলে মুষ্টিমেয় বিশৃংখলাকারী তাদের সামনে কোনক্রমেই তিষ্টাতে পারতো না।

হযরত ওসমান গনি (রাঃ)-এর শাহাদাতের পর হযরত আলী কাররামাল্লাহ ওয়াজহাহু খলিফা নির্বাচিত হলে ওসমান (রাঃ)-এর কিসাসের প্রসঙ্গে দুঃখজনক উটের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত উম্মুল মু'মিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ)-এর সঙ্গে ছিলেন। আবু হানিফা দিনাওয়ারীর বর্ণনা অনুযায়ী তিনি আনসার বনু কায়েস এবং বনু ছাকিফের নেতৃত্ব প্রদান করেন। (আল-আখবারুত তাওয়াল।)

ইবনে আছির (রঃ) "উসুদুল গাববাহ" গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমের হযরত ওসমান (রাঃ)-এর শাহাদাতের খবর শুনে অত্যন্ত মর্মাহত হলেন।

www.amarboi.org

কেননা হযরত ওসমান (রাঃ) শুধুমাত্র হক খলিফাই ছিলেন না, বরং তাঁর নিকটতম বন্ধু ছিলেন। বস্তুতঃ তাঁর শাহাদাতের পর ব্যাপক বিশৃংখলা দেখা দিয়েছিল। তিনি বাইতুল মালের অর্থসহ বসরা থেকে মক্কা এলেন। সেখানে উম্মুল মু'মিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা, হযরত তালহা এবং হযরত যোবায়ের (রাঃ)–এর সাথে সাক্ষাত হলো। তিনি জানতে পেলেন যে, তাঁরা হযরত ওসমান (রাঃ)–এর কিসাসের নিয়তে সিরিয়া গমনের ইচ্ছা পোষণ করেন। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) তাঁদেরকে তার সঙ্গে বসরা গমনের পরামর্শ দিলেন এবং বললেন, সেখানে তাঁরা যথেষ্ট সাহায্যকারী পাবেন। সুতরাং তাঁরা তার সাথে বসরা এলেন এবং সেখানেই দুঃখজনক উষ্ট্রের যুদ্ধ সংঘটিত হলো।

হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু এবং হযরত আমীর মাবিয়া (রাঃ)–এর মধ্যে সিফফিনের যুদ্ধ শুরু হলো। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) আমীর মাবিয়াহ (রাঃ)–এর পক্ষভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধে বিশেষ কোন তৎপরতা দেখাননি। অবশ্য উভয়পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ মুলতবির চুক্তিতে অন্যান্যের মত তিনিও সাক্ষী হিসেবে নিজের নাম দস্তখত করেন।

হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর শাহাদাতের পর সাইয়েদেনা হযরত হাসান (রাঃ) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। আমীর মাবিয়া (রাঃ) তাঁর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের সময় হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমেরকে অগ্রবর্তী বাহিনীর অফিসার নিয়োগ করেন। হযরত হাসান (রাঃ) প্রথমে নিজের বাহিনীসহ মাদায়েন তাশরীফ আনেন। সেখান থেকে মুকাবিলার জন্য বের হয়ে সাবাতে তাঁবু ফেললেন। সাবাতে অবস্থানকালে তিনি নিজের সৈন্যদের মধ্যে যুদ্ধ প্রশ্নে নিষ্ক্রিয়ভাব লক্ষ্য করেন। কতিপয় খারেজী তাঁকে অপদস্ত করার চেষ্টা চালায়। এমনকি জারাহ বিন কাবিজাহ নামক হতভাগা হামলা করে তাঁর পবিত্র উরু জখম করে দেয়। ফলে সাইয়েদেনা হাসান (রাঃ) মাদায়েন ফিরে আসেন এবং জখম ভালো হওয়া পর্যন্ত কাসরে আবিয়াজে অবস্থান করেন। জখম ভালো হলে পুনরায় মুকাবিলার জন্য বের হন। এ সময় আমীর মাবিয়া (রাঃ)–ও আম্বার পৌছেছিলেন। আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমের এবং হযরত হাসান (রাঃ)–এর বাহিনী পরস্পরের মুখোমুখী হলে হযরত ইবনে আমের (রাঃ) সাইয়েদেনা হাসান (রাঃ)–এর নিকট দূত প্রেরণ করে সালাম এবং একটি বাণী প্রেরণ করলেন। বাণীতে তিনি উল্লেখ করলেন যে, তাঁর মর্যাদা শুধু আমীর মাবিয়া (রাঃ)–র অগ্রবর্তী বাহিনীর। তিনি নিজেও একটি বাহিনীসহ আম্বার পৌছেছেন। আপনার এবং আপনার সহযোগীদের কসম। যুদ্ধ মুলতবী করুন।

সাইয়েদেনা হযরত হাসান (রাঃ)–এর সাথীরা এ বাণী শুনে লড়াই থেকে পিছ পা হতে লাগলো। হযরত হাসান (রাঃ) তাদের দুর্বলতা টের পেলেন। সুতরাং তিনি পুনরায় মাদায়েন ফিরে গেলেন। তাঁর ফিরে যাওয়ার সাথে সাথে ইবনে আমের (রাঃ) অগ্রসর হয়ে মাদায়েন অবরোধ করলো। হযরত হাসান (রাঃ) প্রথম থেকেই পারস্পরিক রক্তারক্তি

www.amarboi.org

অপছন্দ করতেন। নিজের সাথীদের ভূমিকা দেখে কতিপয় শর্তে আমীর মাবিয়া (রাঃ)–এর পক্ষে খেলাফত থেকে সরে দাঁড়ালেন। ইবনে আমের (রাঃ) এ শর্তাবলী আমির মাবিয়া (রাঃ)–এর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। তিনি এ সব শর্ত মেনে নিলেন।

৪১ হিজরীতে আমীর মাবিয়া (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমেরকে দ্বিতীয়বার বসরার গভর্ণর নিয়োগ করেন। ইবনে আছির (রঃ) বর্ণনা করেছেন, আমীর মাবিয়া (রাঃ) বসরার গবর্ণর হিসেবে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইবনে আমের তাঁকে বললেন যে, বসরায় তাঁর অনেক ধন–সম্পদ রয়েছে। যদি অন্য কেউ সেখানকার গবর্ণর হয়, তাহলে সব বরবাদ হয়ে যাবে। এ কথায় আমীর মাবিয়া (রাঃ) তাঁকেই বসরার গবর্ণরীর দায়িত্ব অর্পণ করেন।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমের দ্বিতীয়বার বসরার গবর্ণর হয়ে এসে খবর পেলেন যে, কাবুল, হিরাত, বুশানজ, বলখ, বাজগিস প্রভৃতি শহর এবং এলাকা বিদ্রোহী হয়ে গেছে। তিনি বিদ্রোহীদেরকে উৎখাতের জন্য কায়েস ইবনুল হাইছামকে খোরাসানে, আবদুল্লাহ বিন খাযেমকে হিরাত এবং হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) বিন সামুরাহকে সিসতানের দিকে প্রেরণ করলেন। কায়েস ইবনুল হাইছাম বিদ্রোহীদেরকে চূর্ণ–বিচূর্ণ করতে করতে বলখ পৌঁছলেন এবং শহর দখল করে সেখানকার প্রখ্যাত অগ্নিকুণ্ড নওবাহার মিসমার করে ফেললেন। আবদুল্লাহ বিন খাযেম হিরাত, বুশানজ এবং বাজগিসের বিদ্রোহীদের ওপর যথাযথ আঘাত হেনে অনুগত বানালেন।

আবদুর রহমান (রাঃ) বিন সামরাহ এলাকার পর এলাকা জয় করতে করতে কাবুল পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন এবং শহর অবরোধ করলেন। কাবুলবাসী অত্যন্ত ফাসাদ প্রিয় ছিল। এ জন্য হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) অবরোধের সময় অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বন করলেন। একরাতে প্রাচীরের ওপর কামান দিয়ে এমন প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করলেন যে, তা ছিদ্র হয়ে গেল। তিনি উবাদ বিন হাছিনকে সৈন্যের একটি দল দিয়ে ছিদ্রটির তত্ত্ববিধানে নিয়োগ করলেন। সকালে শহরবাসীরা বাইরে বেরিয়ে প্রচণ্ড হামলা চালালো, কিন্তু পরাজিত হলো এবং মুসলমানরা শহরে প্রবেশ করলো।

এরপর হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) অগ্রসর হয়ে খাশবসত, রযান এবং খুশক শহর জয় করলেন এবং রাখজ ঘিরে ফেললেন। রাখজবাসী সামান্য মুকাবিলার পর অস্ত্র ফেলে দিলো এবং আনুগত্য কবুল করে নিলো। রাখজ দখলের পর হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) এক রক্তাক্ত যুদ্ধের পর দ্বিতীয়বার গাজনাহ দখল করলেন। অতপর তিনি কান্দাহারের ওপর ইসলামের ঝাণ্ডা উড্ডীন করলেন এবং আরেকবার কাবুলের দিকে অগ্রসর হলেন। সেখানকার বাসিন্দারা তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে নিজেদের অভ্যাস

www.amarboi.org

অনুযায়ী পুনরায় বিদ্রোহ করে বসে। কাবুলবাসী প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে মুকাবিলা করলো। মুসলমানরা তাদেরকে নিদারুনভাবে পরাজিত এবং কাবুলে নিজেদের অবস্থান দৃঢ়ভাবে মজবুত করলো।

৪৩ হিজরীতে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমের আবদুল্লাহ বিন সাওয়ার আবদীকে ভারতের উপকূলের বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী লোকদের শাস্তি প্রদানের জন্য ৪ হাজার মুজাহিদসহ প্রেরণ করলেন। তারা মাকরানে কয়েকমাস অবস্থান করলো। ইবনে আছির (রঃ) বর্ণনা করেছেন, তিনি কাইকানবাসীকে চরমভাবে পরাজিত করে গণিমতের মালসহ সোজা দামেস্ক পৌছলেন। তিনি সেখানে আমীর মাবিয়া (রাঃ)-এর খিদমতে কয়েকটি কাইকানী ঘোড়া পেশ করলেন।

৪৪ হিজরীতে ইবনে আমের (রাঃ) মুহাল্লাব বিন আবি সাফরার নেতৃত্বে একটি বাহিনী সিন্ধুর দিকে প্রেরণ করলেন, ইবনে আছির (রঃ)-এর বক্তব্য অনুযায়ী মুহাল্লাব সিন্ধুর সীমান্তে যুদ্ধ করলেন এবং শত্রুর দাঁত ভেঙ্গে দিলেন। অতপর তিনি বিজয় কেতন উড়াতে উড়াতে দেশে ফিরে গেলেন।

কতিপয় ঐতিহাসিক লিখেছেন, মুহাল্লাব বিন আবি সাফরাহ খাইবার গিরিপথে ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন। সে যুগে পেশোয়ার থেকে মুলতান পর্যন্ত সমগ্র এলাকা সিন্ধুর অন্তর্ভুক্ত ছিল। মুহাল্লাবই প্রথম আরব সেনাপতি যিনি খাইবার গিরিপথ দিয়ে ভারত অথবা সিন্ধুতে প্রবেশ করেন।

বসরায় দ্বিতীয়বার গবর্ণরীর তিন বছর অতিক্রান্ত হতেই আমীর মাবিয়া (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমেরকে পদচ্যুত করেন। উপজাতীয়দের সাথে নরম ব্যবহার করার কারণেই এটা করা হয়েছিল। আমীর মাবিয়া (রাঃ)-এ নরম ব্যবহারকে অত্যন্ত বিপদজনক মনে করতেন। সুতরাং আমীর মাবিয়া (রাঃ) ইবনে আমের (রাঃ)-এর স্থলে একজন কঠোর প্রাণ ব্যক্তিকে বসরা প্রেরণ করেছিলেন। বরখাস্তের পর হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমের বিভিন্ন মত অনুযায়ী মদীনা মুনাওয়ারাহ অথবা মক্কা মুয়াজ্জমা চলে যান এবং একাকীত্বের জীবন গ্রহণ করেন।

তার ওফাতের সাল নিয়েও মত পার্থক্য রয়েছে। কেউ কেউ ৫৭ হিজরীর কথা লিখেছেন। কেউ ৫৮ হিজরীর কথা বলেছেন। এক বর্ণনায় ৫৯ হিজরীর কথাও পাওয়া যায়।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমের সামরিক নিপুণতা দিয়েই শুধুমাত্র নিজেকে সজ্জিত করেননি বরং জনগণের সেবা ও কল্যাণের জন্যও বহু সমাজসেবামূলক কাজ

www.amarboi.org

করে গেছেন। তিনি মাতৃক্রোড়ে মুহসিনে ইনসানিয়াত বা মানবতার কল্যাণকামী রাসূলে করিম (সাঃ)-এর পবিত্র মুখের লালা চেটেছিলেন এবং নবী করিম (সাঃ) তাঁর জন্য এ ভাবায় দোয়া করেছিলেনঃ "এ শিশু (বড় হয়ে) মুসাক্কী তৃষ্ণার্তদের পানি পানকারী হবে।"

সৃষ্টির সেরা নবী করিম (সাঃ)-এর এ ভবিষ্যদ্বাণী হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমেরের জীবনে পুরোপুরিই প্রতিফলিত হয়েছিল। আল্লাহপাক তাঁর অন্তরে আরবের শুকনো মাটির বাসিন্দাদেরকে বেশী বেশী পানি সরবরাহের সীমাহীন আবেগ সৃষ্টি করেছিলেন। বস্তুতঃ এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তিনি বসরায় দু'টি নহর খোদাই করেছিলেন। এছাড়া উবুল্লাহ নহর সংস্কার করেন। আরাফাতের ময়দানে হাজীদের পানির কষ্ট হতো। তিনি সেখানে বড় বড় পুকুর এবং হাউজ বানিয়ে নহরের পানি সেখানে আনার ব্যবস্থা করেন। এ ছাড়াও তিনি বিভিন্নস্থানে বহুসংখ্যক কূপ খনন করান এবং পানিবিহীন জমিতে বিভিন্ন উপায়ে পানি সেচের ব্যবস্থা করেন। জনসেবা ও শুষ্ক জমিতে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা ছাড়াও তিনি বিভিন্নমুখী জনকল্যাণমূলক কাজ আঞ্জাম দেন। আন-নিবাজ এবং কারইয়াতাইনে বৃক্ষ রোপন করেন এবং বসরায় অনেক বাড়ী ক্রয় করে বাজার তৈরী করেন।

সরকারীভাবে জনকল্যাণমূলক কাজ ছাড়াও হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমের ব্যক্তিগতভাবেও আল্লাহর সৃষ্টজীবকে অনেক উপকার করেছিলেন। প্রকৃতিগতভাবে তিনি ছিলেন দানশীল এবং কল্যাণকামী। আল্লাহ পাক তাঁকে অফুরন্ত ধন-সম্পদ দান করেছিলেন। দু'দুবার বসরার গবর্ণর হয়েছিলেন। এ বড় পদের জন্য উপযুক্ত ভাতা ছিল। নিজের গবর্ণরীর সময় অসংখ্য বিজয়লাভ করেছিলেন। ফলে গণিমতের মালও পেতেন। ইবনে আছির (রঃ) "উসুদুল গাবাহ" গ্রন্থে লিখেছেন, মক্কা মুয়াজ্জামার উপকন্ঠে প্রচুর বাগান এবং জমি ছিল। এ ছাড়াও তিনি বিরাট অংকের অর্থ বিভিন্ন ব্যবসায়ে লাগিয়েছিলেন। এর মাধ্যমেও অর্থ সমাগম হতো। এমনিভাবে তিনি কুরাইশের নেতৃস্থানীয় সরদার হিসেবে পরিগণিত ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে যে ধরনের ধন-সম্পদ প্রদান করেছিলেন সে ধরনের প্রশস্ত অন্তরও বানিয়েছিলেন। নিজের ধন-সম্পদ নির্দ্বিধায় আল্লাহর পথে খরচ করতেন এবং হাজার হাজার গরীব, ইয়াতিম ও অভাবীকে পালন করতেন। কোন ভিক্ষুক তাঁর দরজা থেকে কখনো শূন্য হাতে ফিরে যেত না। অভাবীদেরকে দু'হাত ভরে দান করতেন।

-০-

www.amarboi.org

# হযরত আমর (রাঃ) বিন সাঈদ উমুবী

তাবুকের যুদ্ধের পর প্রিয়নবী (সাঃ)-এর এমন একজন জীবন উৎসর্গকারী ব্যক্তির প্রয়োজন অনুভূত হলো যিনি আস্থাবান ও আমানতদার হওয়ার সাথে সাথে উচ্চ পর্যায়ের ব্যবস্থাপনার যোগ্যতাতেও পরিপূর্ণ। এ নির্বাচন প্রশ্নে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো বনু উমাইয়ার আলোক প্রদীপের ওপর। তিনি প্রয়োজনীয় সকল গুণে গুনান্বিত ছিলেন। হুযুর (সাঃ) তাঁকে খায়বার, ফাদাক এবং তাবুকের রাজস্ব আদায়কারী নিয়োগ করলেন এবং দোয়াসহ মদীনা মুনাওয়ারাহ থেকে রওয়ানা করে দিলেন। এ ব্যক্তি নিজের ওপর আরোপিত দায়িত্ব অত্যন্ত সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দিতে থাকলেন। এমন কি এ অবস্থাতেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ওফাত পেলেন। তিনি এ হৃদয় বিদারক খবর শুনে বিয়োগ ব্যথায় কাতর হয়ে সব কিছু ছেড়ে মদীনা মুনাওয়ারাহ ফিরে এলেন। তখন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) খলিফার আসনে সমাসীন হয়ে ছিলেন। খলিফাতুর রাসূল (সাঃ) পুনরায় তাঁকে রাসূল (সাঃ)-এর আমলের পদের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করতে চাইলেন এবং তাঁকে বললেন, এ পদের জন্য তোমার চেয়ে যোগ্য আর কে হতে পারেন? কিন্তু তিনি ক্ষমা চাইলেন এবং বললেন, হে খলিফাতুর রাসূল! রাসূল (সাঃ)-এর পর আমি এ দায়িত্ব পালনে সক্ষম নই।

যে ব্যক্তিটির ওপর রাসূল (সাঃ)-এর অগাধ আস্থা ছিল এবং যিনি রাসূল (সাঃ)-এর ওফাতের পর কোন ধরনের পদ গ্রহণে রাজী হননি তিনি ছিলেন হযরত আমর (রাঃ) বিন সাঈদ উমুবী।

সাইয়েদেনা আবু উকবাহ আমর (রাঃ) বিন সাঈদ "আস-সাবিকুনাল আওয়ালুন" অর্থাৎ পবিত্র অগ্রবর্তী দলের একজন সদস্য ছিলেন। দ্বীনের প্রতি নিষ্ঠা এবং অন্যান্য সুন্দর গুণের বদৌলতে তিনি অত্যন্ত উঁচু মর্যাদায় সমাসীন ছিলেন। তিনি বনু উমাইয়ার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত ছিলেন। তাঁর বংশ নামা হলোঃ আমর (রাঃ) বিন সাঈদ বিন আছ বিন উমাইয়াহ বিন আবদি শামছ বিন আবদি মানাফ বিন কুসাই।

www.amarboi.org

মাতার নাম ছিল সুফিয়া। তিনি বনু মাখজুম গোত্রভুক্ত এবং হযরত খালিদ (রাঃ) বিন ওয়ালিদের ফুফু ছিলেন। হযরত আমর (রাঃ)–এর পিতা এবং দাদা কট্টর মুশরিক ছিল। কিন্তু তাঁর বড় ভাই খালিদ (রাঃ) বিন সাঈদ অত্যন্ত সুন্দর স্বভাবের মানুষ ছিলেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) হকের দাওয়াত প্রদান শুরু করলে তিনি নির্ভাবনায় তাতে সাড়া দেন। হযরত আমরও (রাঃ) সৎস্বভাবের ছিলেন। তিনি ভাইয়ের অনুসরণ করেন এবং তাঁর ইসলাম গ্রহণের কিছু দিন পরই তিনিও ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নেন। পিতা এবং বংশের অন্যান্যরা ইসলাম গ্রহণের অপরাধে তাঁদের ওপর অবর্ণনীয় নির্যাতন চালায়। কিন্তু তাওহীদের নেশার নিকট নির্যাতন হার মানলো। সে যুগে তাঁর ভাই আবান বিন সাঈদ (তখনও ঈমান আনেনি) দু'ভাইকে বিদ্রূপ করে কবিতার এক পংক্তি রচনা করে। সেই পংক্তির ভাবার্থ হলোঃ "হায়! জারবিয়ায় মৃত্যুর ঘুমে শায়িত সাঈদ বিন আছ বিল উমাইয়াহ তাকে জারবিয়ায় দাফন করা হয়েছিল। যদি দেখতো যে, আমর (রাঃ) এবং খালিদ দ্বীনকে কিভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে।"

হযরত আমর (রাঃ) বিন সাঈদও কবিতা এবং কাব্যে বুৎপত্তি রাখতেন। তিনি যখন এ বিদ্রূপাত্মক কবিতা শুনলেন তখন কবিতা দিয়েই তার জবাব দিয়েছিলেন। তাঁর কবিতার অর্থ হলোঃ "এখন সেই মৃত্যুর ঘুমে শায়িতদের উল্লেখ পরিত্যাগ কর। সে নিজের রাস্তা নিয়েছে এবং সেই হকের দিকে আগুয়ান হও যার সত্য হওয়া প্রশ্নে আর কোন দ্বিধা–দ্বন্দ্ব নেই।"

মুশরিকদের যুলুম–নির্যাতন সীমা ছাড়িয়ে গেলে নবুয়াতের ৫ম বছরে হুযুর (সাঃ) মুসলমানদেরকে হাবশার দিকে হিজরাত করার নির্দেশ দিলেন। বস্তুতঃ সে বছর একটি ছোট দল হাবশার দিকে যাত্রা করলো। পরের বছর একশ সদস্যের নারী–পুরুষের একটি বড় কাফেলা হাবশায় হিজরাত করলেন। এ কাফেলায় হযরত আমর (রাঃ) বিন সাঈদ, তাঁর স্ত্রী হযরত ফাতেমা (রাঃ) বিনতে ছাফওয়ান কিনানিয়াহ এবং সহোদর হযরত খালেদ (রাঃ) বিন সাঈদ নিজের স্ত্রীসহ শরীক ছিলেন। হযরত আমর (রাঃ) এবং হযরত খালেদ (রাঃ) পরিবারসহ তের বছর পর্যন্ত হাবশায় দেশত্যাগের মুসিবত বরদাশত করতে থাকেন। খায়বারের যুদ্ধের সময় হাবশা থেকে মদীনা আসেন। যদিও তাঁরা তাতে অংশ নিতে পারেননি, তবুও হুযুর (সাঃ) গনিমাতের মাল থেকে তাঁদেরকে অংশ প্রদান করেন।

মদীনা আগমনের পর হযরত আমর (রাঃ) বিন সাঈদ মক্কা বিজয়ের সময় রাসূল (সাঃ)–এর সহগামী ছিলেন। এরপর তিনি হুনাইন ও তায়েফের যুদ্ধে বাহাদুরী প্রদর্শন করেন। তাবুকের যুদ্ধেও তিনি অংশ গ্রহণ করেন। তাবুকের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর নবী করিম (সাঃ) তাঁকে মদীনা মুনাওয়ারার পশ্চিম এলাকার খায়বার, ফিদক এবং তাবুক

www.amarboi.org

প্রভৃতি স্থানের রাজস্ব আদায়কারী নিয়োগ করেন। রাসূল (সাঃ)–এর ইন্তেকালের পর তিনি মদীনা ফিরে যান। মদীনা প্রত্যাবর্তনের মাত্র কিছু দিন পরই রোমক বাদশাহর সাথে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল, সে যুগে সিরিয়া রোম সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। খলিফাতুর রাসূল (সাঃ) হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) সিরিয়ায় সৈন্য প্রেরণ করলেন। এ সময় হযরত আমর (রাঃ) বিন সাঈদ সিরিয়া গমনকারী মুজাহিদ বাহিনীতে একজন সাধারণ সৈনিক হিসেবে অংশ গ্রহণ করেন। দু' তিনটি যুদ্ধের পর মুসলমান এবং রোমকদের মধ্যে আজনাদাইনে এক প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘঠিত হলো। হযরত আমর (রাঃ) বিন সাঈদ এ যুদ্ধে চরম বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেন এবং কয়েকবার শত্রুব্যুহ তছনছ করে ফেলেন। এক নাজুক অবস্থায় তিনি মুসলমানদেরকে দৃঢ়তার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করলেন এবং তাঁর নিকট মুসলমানদের পদস্খলন অসহ্য ব্যাপার এ কথা বলতে বলতে বীরের মত শত্রুব্যুহে ঢুকে পড়লেন। যেই সামনে এলো তাকেই যমালয়ে পাঠালেন এবং রোমক বাহিনীর একদম মধ্যস্থলের দিকে এগিয়ে গেলেন, অবশেষে অসংখ্য রোমক এ মরদে মুজাহিদকে ঘিরে ফেললো এবং তীর, তলোয়ার ও খঞ্জরের বর্ষণ শুরু করলো। তাতে তার সমস্ত শরীর আঘাতে আঘাতে ছিদ্র হয়ে গেল। যখন তরবারী চালানর আর শক্তি রলো না তখন মাটিতে পড়ে গেলেন এবং শাহাদাতের পিয়ালা পান করে জান্নাতে পৌছে গেলেন। আল্লামা বালাজুরী (রঃ) বর্ণনা করেছেন, তাঁর শরীরে ৩০–এরও বেশী আঘাত লেগেছিল। হযরত আমর (রাঃ) বিন সাঈদ এবং তাঁর মত অন্যান্য শহীদের রক্ত বৃথা যায়নি। রোমকদের শিক্ষণীয় পরাজয় হলো এবং তারা নিজেদের হাজার হাজার লাশ ফেলে রেখে পালিয়ে গেল।

হযরত আমর (রাঃ) বিন সাঈদ ঈমানী আবেগের যে চিহ্ন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় রেখে গেছেন তা চিরকালের জন্য মুসলমানদের রক্ত উত্তপ্ত করবে।

***

# হযরত সাঈদ (রাঃ) বিন আছ

হযরত সাঈদ (রাঃ) বিন আছ ছিলেন সুখ্যাতির নভোমণ্ডলে সূর্য সমতুল্য। বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য, আল্লাহ প্রদত্ত যোগ্যতা এবং কৃতিত্ব তাঁকে এ সুখ্যাতির স্বর্ণ শিখরে আরোহণ করিয়েছিল। বনু উমাইয়ার সঙ্গে তিনি সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। তাঁর পিতা ও দাদা প্রভাবশালী ও মর্যাদাবান নেতা ছিলেন। হযরত সাঈদ (রাঃ)-এর দাদা আবু উহাইহা সাঈদ বিন আছের এমন দবদবা এবং শান শওকত ছিল যে, তিনি যে রঙের পাগড়ী পরিধান করতেন মক্কার কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি সেই রঙের পাগড়ী পরিধান করতে পারতো না। মক্কাবাসী তাকে "জুত্তাজ" (টুপি ওয়ালা) উপাধি দিয়ে রেখেছিল।

আবু উহাইহা সাঈদ বিন আছ জুত্তাজের পুত্রের মধ্যে পাঁচজন খালিদ, আমর, আবান, উবাইদাহ এবং আছ ইতিহাসখ্যাত হয়ে আছে। খালিদ, আমর আবান ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। কিন্তু উবাইদুল্লাহ এবং আছ কুফুরীর ওপরই কায়েম ছিল। এ দুজনই বদরের যুদ্ধে হযরত যোবায়ের (রাঃ) ইবনুল আওয়াম এবং হযরত আলী (রাঃ)-এর হাতে মারা যায়। হযরত সাঈদ (রাঃ) সেই বদরের যুদ্ধে নিহত আছের পুত্র ছিলেন। তাঁর নসবনামা হলোঃ সাঈদ (রাঃ) বিন আছ বিন আবু উহাইহা সাঈদ জুত্তাজ বিন আছ বিন উমাইয়াহ বিন আবদি শামছ বিন আবদি মানাফ বিন কুসাই।

আবদি মানাফে গিয়ে তাঁর বংশ ধারা রাসূল (সাঃ)-এর বংশের সঙ্গে মিশে যায়। মাতার নাম ছিল উম্মে কুলছুম। তাঁর সম্পর্ক ছিল কুরাইশ বংশের আমের বিন লুবাীর সঙ্গে। হযরত সাঈদ (রাঃ) সরাসরি নবী (সাঃ)-এর ফয়েজ পাওয়ার সুযোগ খুব কমই পেয়ে ছিলেন। তা সত্ত্বেও রাসূল (সাঃ)-এর ইন্তিকালের পর তিনি উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহ, হযরত ওমর ফারুক, হযরত ওসমান জুন্নুরাইন এবং অন্যান্য সাহাবী (রাঃ)-এর নিকট থেকে পুরোপুরি ফয়েজ হাসিল করেন এবং মর্যাদাবান সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হতে থাকেন। নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা বলেছেন, তিনি অত্যন্ত বাহাদুর, সুন্দর স্বভাব এবং বিজয়ী ব্যক্তি ছিলেন। আরবী ভাষায় ওপর তাঁর অসাধারণ দখল ছিল এবং রাসূল (সাঃ)-এর কণ্ঠ স্বরের সঙ্গে তাঁর কণ্ঠস্বরের মিল ছিল।

ইবনে আসাকির (রঃ) রাসূল (সাঃ)-এর যুগে ঘটিত হযরত সাঈদ (রাঃ) বিন আছের শৈশব কালের একটি ঘটনা হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন ওমর (রাঃ)-এর মুখে এই ভাবে বর্ণনা করেছেনঃ "এক মহিলা রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে একখানা কাপড় পেশ করে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ কাপড় খানি আরবের সবচেয়ে বুজর্গ লোককে দেয়ার নিয়ত করে রেখেছিলাম। এখন তা আপনার নিকট এনেছি। সে সময় হযরত সাঈদ (রাঃ) বিন আছ হুযুর (সাঃ)-এর নিকট দাড়িয়ে ছিলেন। তিনি মহিলাটির হাদিয়া কবুল করলেন এবং তাকে বললেন, এ কাপড় এ ছেলেটিকে দিয়ে দাও। সে রসূল (সাঃ)-এর নির্দেশ পালন করলো। এ কারণে সেই কাপড়ের নাম সাদিয়া হিসেবে মশহুর হয়ে গিয়েছিল।" এ ঘটনায় হযরত সাঈদ (রাঃ)-এর ওপর হুযুর (সাঃ)-এর অসাধারণ স্নেহের কথা প্রকাশ পায়।

হযরত সাঈদ (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর যুগে এবং হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ)-এর শাসনামলে নাবালেগ ছিলেন। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর শাসনকালে যৌবনপ্রাপ্ত হন। কিন্তু এ সময় জ্ঞান হাসিল ছাড়াও তাঁর দ্বিতীয় কোন তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়নি। ২৪ হিজরীতে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর শাহাদাতের পর হযরত ওসমান জুন্নুরাইন খিলাফতের আসনে সমাসীন হলে কুরআন পাক লিখার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেন এবং অসংখ্য নুসখা বা কপি নকল করার সিদ্ধান্ত নেন। এ কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য তিনি যেসব সাহাবী (রাঃ)-কে নিয়োগ করেছিলেন তাদের মধ্যে হযরত সাঈদ (রাঃ) বিন আছও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ২৯ হিজরীতে হযরত ওসমান (রাঃ) হযরত সাঈদ (রাঃ)-কে ওলিদ বিন উকবার স্থলে কুফার গবর্ণর নিয়োগ করেন। কুফার গবর্ণরীর সময় হযরত সাঈদ (রাঃ) কয়েকটি শানদার সামরিক সাফল্য প্রদর্শন করেন। কুফায় দায়িত্ব গ্রহণের অব্যবহিত পরই তিনি জারজান এবং তাবারিস্তানের ওপর হামলা করেন। ইবনে আছির (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত সাঈদ (রাঃ)-এর বাহিনীতে হযরত হাসান (রাঃ), হযরত হোসাইন (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) এবং কুরাইশের অনেক যুবক অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বসরার গবর্ণর হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আমের এ সামরিক অভিযানের খবর পেয়ে তাবারিস্তানের দিকে অগ্রসর হলেন। কিন্তু হযরত সাঈদ (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর পৌছার পূর্বেই তাবারিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ স্থান দাবাওন্দ তামিসা, রাদইয়ান, নামন্দ প্রভৃতি স্থান দখল করে নেন। জারজানের শাসক হযরত সাঈদ (রাঃ)-এর বিজয়সূচক হামলা মুকাবিলার সাহস পেল না এবং সে দু' লাখ দিরহাম রাজস্ব প্রদান মঞ্জুর করে আনুগত্য কবুল করে নিল। আল্লামা বালাজুরী (রঃ)-এর বর্ণনা অনুযায়ী পার্বত্য এলাকার লোকেরাও সন্ধি করে নিয়েছিল, সে সময়ই আজারবাইজানের লোকেরা বিদ্রোহ করে বসলো এবং চারদিকে বিশৃংখলা সৃষ্টি করলো।

www.amarboi.org

হযরত সাঈদ (রাঃ) এমন সামরিক কৌশল অবলম্বন করলেন যে কিছুদিনের মধ্যেই তাদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেল এবং ব্যর্থতার গ্লানি স্বীকার করে নিতে বাধ্য হলো।

হযরত সাঈদ (রাঃ) কূফার গবর্ণরীর দায়িত্ব প্রাপ্তির চার পাঁচ বছরের মধ্যেই কূফাবাসী তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে উঠলো। তাদের অসন্তুষ্টির কারণ কি ছিল? ঐতিহাসিকরা তার ব্যাখ্যা দেননি, কূফাবাসীরা তাঁর বিরুদ্ধে আমীরুল মুমিনিন হযরত ওসমান (রাঃ)-এর নিকট অভিযোগ করলো। ফলে, হযরত সাঈদ (রাঃ) ৩৪ হিজরীতে পদ থেকে পদচ্যুত হন। পদচ্যুতির ব্যাপারে দু'ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। এক বর্ণনায় বলা হয় যে, আমীরুল মুমিনিন ওসমান (রাঃ) তাঁকে বরখাস্ত করেন। দ্বিতীয় বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, আমিরুল মুমিনিন কূফাবাসীদের অভিযোগ কোন গুরুত্ব দেননি। এতে মালিকুল আশতারের নেতৃত্বে ১০ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল খলিফার নিকট হাজির হয়ে হযরত সাঈদ (রাঃ)-এর পদত্যাগ দাবী করে। হযরত সাঈদ (রাঃ)-ও সে সময় কূফা থেকে মদীনা এসেছিলেন এবং সে সময় আমিরুল মুমিনিনের নিকট উপস্থিত ছিলেন। আমিরুল মুমিনিন কূফাবাসীর অভিযোগ গুরুত্বহীন বলে আখ্যায়িত করেন এবং হযরত সাঈদ (রাঃ)-কে নিজের পদে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। মালিকুল আশতার সেখানে আর কাল বিলম্ব না করে কূফা ফিরে এলেন এবং কূফাবাসীকে হযরত সাঈদ (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে দারুণভাবে উত্তেজিত করে তুললো। ফল এই হলো যে, হযরত সাঈদ (রাঃ) যখন কূফা ফিরে যাচ্ছিলেন তখন কূফার একটি বড় দল তাঁর পথ অবরোধ করে দাঁড়ায় এবং মদীনা ফিরে যেতে বাধ্য করে। অতপর মালিকুল আশতার কূফার জামে মসজিদে এক বড় সম্মেলন ডেকে নিজের পক্ষ থেকে হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রাঃ)-কে কূফার গবর্ণর হিসেবে ঘোষণা করলো। হযরত আবু মূসা (রাঃ) প্রথমে এ দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালেন। কিন্তু সকলেই যখন আমিরুল মুমিনিন (রাঃ)-এর আনুগত্যের শপথ নিল তখন তিনি গবর্ণর হওয়ার ব্যাপারে সম্মত হলেন। হযরত ওসমান (রাঃ) এ সব ঘটনার খবর পেয়ে হযরত সাঈদ (রাঃ)-কে কূফা ফেরত পাঠানোকে ঠিক মনে করলেন না এবং হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রাঃ)-এর মনোনয়ন অনুমোদন করলেন। তারপর হযরত সাঈদ (রাঃ) মদীনাতেই অবস্থান করেন।

৩৫ হিজরীতে বিদ্রোহীরা আমিরুল মুমিনিন হযরত ওসমান জুন্নুরাইন (রাঃ)-এর বাড়ী অবরোধ করলে হযরত সাঈদ (রাঃ) বিন আছ কতিপয় নওজোয়ান সাহাবীসহ খিলাফত ভবন রক্ষায় কর্তব্য পালন করেন। এ প্রসঙ্গে বিদ্রোহীদের সঙ্গে সংঘর্ষে তিনি গুরুতরভাবে আহত হন। হযরত ওসমান (রাঃ)-এর হৃদয়-বিদারক শাহাদাতের ঘটনা সংঘটিত হলে তিনি অত্যন্ত মনোকষ্ট পান এবং ভগ্ন হৃদয়ে মক্কা গিয়ে নির্জনত্ব অবলম্বন করেন। এক বর্ণনায় আছে যে, উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহ (রাঃ) যখন

www.amarboi.org

হযরত ওসমান (রাঃ)–এর রক্তের বদলার ঝাণ্ডা উড্ডীন করলেন এবং হযরত যোবায়ের (রাঃ), হযরত তালহা ও অন্যান্য সমর্থকদের সাথে বসরার দিকে রওয়ানা দিলেন তখন হযরত সাঈদ (রাঃ)–ও তাদের সঙ্গে গেলেন। কিন্তু মাররুজ জাহারাইন অথবা জাতে ইরকের সন্নিকটে পৌঁছে তাদের থেকে পৃথক হয়ে গেলেন এবং মক্কা গিয়ে একাকীত্বকে অগ্রাধিকার দিলেন। তিনি উষ্ট্রের যুদ্ধ অথবা সিফ্‌ফিনের যুদ্ধ কোনটিতেই অংশ নেননি। হযরত আলী (রাঃ)–এর শাহাদাতের কয়েকমাস পর হযরত হাসান (রাঃ) আমীর মাবিয়া (রাঃ)–এর পক্ষে খিলাফত থেকে সরে দাঁড়ালে আমীর মাবিয়া (রাঃ) হযরত সাঈদ (রাঃ)–কে মদীনার গবর্ণর নিয়োগ করলেন। কিন্তু কিছুদিন পর তাঁকে বরখাস্ত করে তাঁর স্থলে মারওয়ান ইবনুল হাকামকে মদীনার গবর্ণর নিয়োগ করেন। (অন্য) এক রাওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত সাঈদ (রাঃ) এবং মারওয়ানের পদচ্যুতি ও নিয়োগ বিরতিসহ দু'বার কার্যকর হয়েছিল। হযরত সাঈদ (রাঃ) শেষ বয়সে মদীনা মুনাওয়ারাহ থেকে তিন মাইল দূরে ''আল–আকীকে'' স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। সেখানে তাঁর মালিকানায় অনেক জমি ছিল। "ইয়াকূত হামুবী" "মুয়াজামুল বুলদান" গ্রন্থে লিখেছেন, ''আল–আকীক'' অথবা ''আরছাতুল আকীক'' এক প্রশস্ত ময়দান। সেখানে সাধারণভাবে গৃহাদি নির্মাণের অনুমতি ছিল না। হযরত সাঈদ (রাঃ) সরকার থেকে বিশেষ অনুমোদন নিয়ে থাকার জন্য এক বিরাট বাড়ী তৈরী, কূপ খনন এবং বাগান রচনা করেছিলেন। ভিন্ন মত অনুসারে তিনি ৫৭ অথবা ৫৮ অথবা ৫৯ হিজরীতে সেই বাড়ীতেই ওফাত পান। হাফেজ জাহাবীর (রঃ) বক্তব্য অনুসারে তাঁর লাশ মদীনা আনা হয় এবং জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়।

হযরত সাঈদ (রাঃ) সাত পুত্র রেখে যান। এ সব পুত্রের নাম হলোঃ ওমর, মুহাম্মাদ, আবদুল্লাহ, ইয়াহিয়া, ওসমান, আম্বাসা এবং আবান। হাফিজ ইবনে আবদুল বার (রঃ) ''আল–ইসতিয়াবে'' লিখেছেন, হযরত সাঈদ (রাঃ)–এর আরো কয়েকজন ভাই ছিল। কিন্তু আছের বংশধারা সাঈদের পুত্রদের দিয়েই অব্যাহত থাকে।

চরিতকাররা হযরত সাঈদ (রাঃ)–এর শারাফত, বাহাদুরী, জ্ঞান ও ধৈর্য, মর্যাদা, সত্য প্রিয়তা, দানশীলতায় অত্যন্ত প্রশংসা করেছেন। হাফিজ জাহাবী (রঃ) বর্ণনা করেছেন, আমীর মাবিয়া (রাঃ) বলতেন, সাঈদ (রাঃ) বিন আছ বুদ্ধিমত্তা ও যোগ্যতার দিক থেকে খলিফা হওয়ার যোগ্য ছিলেন।

আল্লামা ইবনে আছির (রঃ) ''উসুদুল গাবাহ" গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত সাঈদ (রাঃ)–এর পিতা আছ বদরের যুদ্ধে হযরত আলী (রাঃ)–এর হাতে নিহত হয়েছিলেন। এ যুদ্ধে একই নামের আছ (বিন মুগিরাহ) তার ভাগিনা হযরত ওমর (রাঃ)–এর হাতে নিহত হয়। একই নাম হওয়ার কারণে ধোঁকা হত যে, হযরত ওমর (রাঃ) হযরত সাঈদ (রাঃ)–এর পিতা আছকে হত্যা করেছিলেন। বস্তুতঃ বনু উমাইয়ার মধ্যে প্রচণ্ড বংশীয় বিদ্বেষ

www.amarboi.org

ছিল। এ জন্য হযরত ওমর (রাঃ) ধারণা করলেন যে, সম্ভবতঃ সাঈদ (রাঃ) পিতার হত্যাকারী মনে করে মনে মনে তাঁর বিরুদ্ধে খারাপ ধারণা পোষণ করতে পারে। এ ভুল ধারণা দূর করার জন্য একদিন তিনি হযরত সাঈদ (রাঃ)-কে বললেন, "সাঈদ, বদরের যুদ্ধে আমি তোমার পিতাকে নয় বরং আমার আপন মুশরিক মামা আছকে হত্যা করেছিলাম।" হযরত সাঈদ (রাঃ) কাল বিলম্ব না করে জবাব দিয়েছিলেন, আপনি যদি আমার পিতাকেও হত্যা করতেন তাতেই কি আসতো যেতো। আপনি হকের ওপর ছিলেন। আর সে ছিল হকের শত্রু। হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর জবাবে আশ্চর্যান্বিত হলেন। হযরত সাঈদ (রাঃ)-এর দানশীলতা এবং অন্তরের প্রশস্ততার কোন সীমা পরিসীমা ছিল না, এটা সম্ভবই ছিল না যে, কোন অভাবগ্রস্ত তাঁর দরজায় এসে শূন্য হাতে ফিরে যাবে। তাঁর দানশীলতা শুধু যারা হাত পাততো তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং যেসব শরীফ অভাবগ্রস্ত মান-ইজ্জতের কারণে কারোর নিকট হাত পাততে পারতো না, তারাও তার দান থেকে উপকৃত হতো। খোঁজ করে করে তিনি এ ধরনের অভাবগ্রস্তদের নিকট পৌঁছতেন এবং তাদের অভাব পূরণ করতেন। যদি কোন অভাবগ্রস্ত এমন সময় তার নিকট আসতো যখন তার কাছে অর্থ থাকতো না, তাহলে তিনি তাকে লিখে দিতেন যে, অর্থ এলে সে যেন নিয়ে নেয়।

ইবনে আছির (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, কুফার গবর্ণরীকালে সাঈদ (রাঃ) প্রত্যেক জুমআর রাতে মসজিদের নামাযীদের মধ্যে দিনার ভর্তি থলী বন্টন করতেন। এ কাজে একজন বিশেষ গোলাম নিয়োগ করা হয়েছিল। বস্তুতঃ জুমার রাতে মসজিদে নামাযীদের অসাধারণ ভীড় হতো। আত্মীয়-স্বজনদের সাথেও তাঁর আচরণ ছিল বদান্যতাপূর্ণ। কাপড়, খাদ্য, নগদ অর্থ এবং অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য দিয়ে তিনি তাদেরকে সাহায্য করতেন। সপ্তাহে একদিন তিনি নিজের সকল ভাই-ভাতিজাকে এক সাথে নিয়ে খাবার খেতেন।

হাফিজ ইবনে আবদুল বার (রঃ) "আল-ইসতিয়াব" গ্রন্থে লিখেছেন যে, মদীনা থেকে পদচ্যুতির পর একদিন তিনি মসজিদ থেকে বের হলে এক ব্যক্তি তাঁর পিছু নিল। ব্যক্তিটি প্রকাশ্য ভাবে কোন কিছু চাইলো না। কিন্তু হযরত সাঈদ (রাঃ) বুঝতে পেলেন যে, লোকটি অভাবগ্রস্ত। তিনি নিজের গোলামকে ডেকে পাঠালেন এবং তাকে দিয়ে বিশ হাজারের স্লিপ লিখিয়ে সেই ব্যক্তিকে দিয়ে বললেন, আমি যখন ভাতা পাবো তখন এ স্লিপে লিখিত অর্থ তুমি পেয়ে যাবে। কিন্তু সে অর্থ আদায়ের সময় না আসতেই হযরত সাঈদ (রাঃ) ইন্তেকাল করলেন। সেই ব্যক্তি স্লিপটি তার পুত্র আমরকে প্রদান করলেন। তিনি অবিলম্বে স্লিপে লিখিত অর্থ আদায় করলেন।

www.amarboi.org

এধরনের বদান্যতা এবং শান-শওকতের জন্য তার ওপর ৮০ হাজারের ঋণ হয়ে যায়। মৃত্যুর পূর্বে সকল পুত্রকে ডেকে বললেন, তোমাদের মধ্যে কে আমার ওসি হতে চাও। বড় পুত্র নিজেকে পেশ করলে তিনি বললেন, আমার ওসি হতে চাইলে আমার ঋণও আদায় করতে হবে। পুত্র জিজ্ঞেস করলো, "ঋণ কত?" তিনি বললেন, " ৮০ হাজার।" পুত্র বললো, এত ঋণ কেমন করে হলো? তিনি বললেন, পুত্র! পরিষ্কার পোশাক পরিধানকারী শরীফ মানুষের অভাব দূর করার জন্য ঋণ হয়ে গেছে। এ সব লোক বাধ্য হয়ে আমার কাছে আসতো কিন্তু লজ্জায় কিছু চাইতে পারতো না। আমি চেহারা দেখেই বুঝতাম যে, তারা অভাবগ্রস্ত। তাদেরকে চাওয়ার সুযোগ না দিয়েই তাদের অভাব পূরণ করে দিতাম।

---

www.amarboi.org

# হযরত আব্বাস (রাঃ) বিন উবাদাহ আনসারী

নবুয়াত প্রাপ্তির ১০ বছর পর রাসূলে করিম (সাঃ) হকের তাবলিগের জন্য তায়েফ তাশরীফ নিয়েছিলেন। তায়েফবাসীর দুর্ভাগ্য যে, তারা শুধু তাওহীদের দাওয়াতই প্রত্যাখ্যান করেনি বরং আরবের প্রচলিত মেহমানদারীকেও উপেক্ষা করে রাসূল (সাঃ)-এর সাথে চরম দুর্ব্যবহার করেছিল। কিন্তু প্রিয় নবী (সাঃ) ছিলেন দৃঢ়তা ও অবিচলতার পাহাড়। তিনি তায়েফবাসীর আচরণে মনোকষ্ট না নিয়ে মক্কা ফিরে এসে যথারীতি সত্যের তাবলিগে ব্যস্ত হলেন। হজ্বের সময় হেরেম শরীফ জিয়ারতকারীদের নিকট গিয়ে তাওহীদের দাওয়াত প্রদান তাঁর একটি নিয়ম ছিল এবং সময় সময় বিভিন্ন গোত্রের নিকট গিয়ে তাদের সামনে দ্বীনে হক পেশ করতেন। গোত্রসমূহের নেতারা বড্ড রূঢ় জবাব দিত এবং হেরেম জিয়ারতকারীদের ওপরও তাওহীদের তেমন কোন প্রভাব পড়তো না। কিন্তু নবুয়াত প্রাপ্তির ১১ বছর পর হজ্বের মওসুমে আল্লাহ পাক এক আশ্চর্য ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি করলেন। হুযুর (সাঃ) তাবলীগ করতে করতে মিনার এমন কতিপয় তাঁবুর নিকট গিয়ে পৌঁছলেন যেখানে ইয়াছরিব থেকে আগত কতিপয় সুন্দর স্বভাবের লোক অবস্থান করছিলেন। তারা খাযরাজ গোত্রের ৬ ব্যক্তি ছিলেন। প্রিয় নবী (সাঃ) যখন তাদের নিকট গিয়ে আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদ এবং শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা শুরু করলে তারা খুব প্রভাবিত হলেন। এরপর হুযুর (সাঃ) কুরআনে হাকিমের কতিপয় আয়াত তিলাওয়াত করলেন। ফলে তাদের অন্তর সম্পূর্ণরূপে বিগলিত হয়ে গেল। তারা পরস্পরের প্রতি চাওয়া চাওয়ি করলো এবং বললো, আল্লাহর কসম! তিনি তো সেই শেষ নবী যাঁর উল্লেখ সব সময় ইয়াছরিবের ইহুদীদের মুখে লেগে থাকে। দেখ, , ইহুদীরা আবার আমাদের চেয়ে হক কবুল প্রশ্নে অগ্রগামী হয়ে না যায়। এ কথা বলে তারা সকলেই ঈমান আনলেন।

খাযরাজ গোত্রের এ ছ'পবিত্র আত্মার ইসলাম গ্রহণ যেন ইয়াছরিবে সৌভাগ্যের সূর্য উদয় ছিল। তাঁরা ইয়াছরিব ফিরে গিয়ে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে দ্বীনে হকের তাবলিগ শুরু করলেন। এমনিভাবে প্রদীপ থেকে প্রদীপ জ্বলতে লাগলো

www.amarboi.org

এবং ইয়াছরিবের সৎ স্বভাবের মানুষ ইসলামের প্রতি ঝুঁকতে লাগলো। সুতরাং পরবর্তী বছর অর্থাৎ নবুয়াত প্রাপ্তির ১২ বছর পর ১২জন মুসলমান রাসূল (সাঃ)-এর দর্শন এবং বাইয়াতের গৌরব লাভের জন্য মক্কা গেলেন। আল্লাহর এ ১২জন পবিত্র বান্দাহর মধ্যে খাযরাজ গোত্রের বনু সালেম শাখার এক সন্তান আব্বাস (রাঃ) বিন উবাদাহ বিন নাজলাহ বিন মালিক বিন আজলান বিন যায়েদ বিন গানাম বিন সালেম বিন আমর বিন আওফ বিন খাযরাজও শামিল ছিলেন। তিনি স্বগোত্রের বাহাদুর যুবক হিসেবে পরিগণিত হতেন। বীরত্ব ও বাহাদুরীর সাথে সাথে আল্লাহ তাঁকে সুন্দর স্বভাবও দান করেছিলেন। তাওহীদের আহবান কানে আসতেই চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই তিনি তাতে সাড়া দিলেন এবং পরবর্তী হজ্ব মওসুমে ইয়াছরিবের আরো ১১জন ঈমানদারের সাথে মক্কা গিয়ে রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে হাজির হলেন এবং নিম্নে বর্ণিত ছ'টি কথার ওপর হুযুর (সাঃ)-এর হাতে বাইয়াত হলেন ঃ

একঃ আমরা শিরক করবো না ; দুই ঃ আমরা চুরি করবো না; তিনঃ আমরা খারাপ কাজ করবো না; চারঃ আমরা চোগলখুরী করবো না এবং কারোর ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করবো না; পাঁচ ঃ আমরা নিজেদের কন্যাকে হত্যা করবো না; ছয়ঃ আমরা রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর সকল ভালো কথার আনুগত্য করবো। ইতিহাসে এ বাইয়াত "বাইয়াতে উকবায়ে উলা" নামে খ্যাত হয়ে আছে।

প্রত্যাবর্তনের সময় তাঁরা হুযুর (সাঃ)-এর নিকট কুরআন পাঠদান এবং দ্বীনের শিক্ষা দানের জন্য তাদেরকে একজন শিক্ষক প্রদানের দরখাস্ত করলেন। প্রিয় নবী (সাঃ) হযরত মুছয়াব (রাঃ) বিন উমায়ের (রাঃ)-কে এ দায়িত্ব অর্পণ করলেন এবং তাঁকে এ পবিত্র কাফেলার সাথে ইয়াছরিব রওয়ানা করালেন।

হযরত মুছয়াব (রাঃ) বিন উমাই (রাঃ)-এর তাবলিগি প্রচেষ্টার কারণে ইয়াছরিবের ঘরে ঘরে ইসলামের চর্চা হতে লাগলো। নবুয়াত প্রাপ্তির ১৫ বছর পর হজ্বের মওসুমে ইয়াছরিব থেকে পাঁচশ' মানুষের একটি কাফেলা হজ্বের উদ্দেশ্যে মক্কা রওয়ানা হলো। এ কাফেলাতে ৭৫ জন ঈমানদার ও (৭৩ জন পুরুষ এবং ২ জন মহিলা) শামিল ছিলেন। তাদের মধ্যে হযরত আব্বাস (রাঃ) বিন উবাদা (রাঃ)-ও ছিলেন। তাঁরা রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে রাসূলে আকরাম (সাঃ)-কে মদীনা আগমনের দাওয়াত দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। হজ্ব সমাপনের পর বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সাঃ) একটি রাত ঠিক করলেন। সে রাতে ইয়াছরিবের ঈমানদাররা নিজেদের কাফেলার মুশরিকসহ রাতের অন্ধকারে আকাবার ঘাঁটিতে

www.amarboi.org

একত্রিত হলেন। প্রিয় নবী (সাঃ)-এর চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ)ও সমভিব্যাহারে সেখানে পৌঁছলেন। হযরত আব্বাস (রাঃ) আনসারদের উদ্দেশ্য জ্ঞাত হয়ে তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"ইয়াছরিবের ভ্রাতৃগণ ! মুহাম্মাদ (সাঃ) নিজের বংশে অত্যন্ত মর্যাদাবান এবং শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর দাওয়াতের প্রতি ভিন্ন মত পোষণকারী বেশীর ভাগ মক্কাবাসীই তাঁর কঠোর শত্রু। এ সত্ত্বেও আমরা তাঁকে শত্রু থেকে মুক্ত করেছি এবং ভবিষ্যতেও পূর্ণ শক্তি দিয়ে তা করবো। তোমরা যদি নিজেদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করেত পার তাহলে কথা বলবো। খুব ভালোভাবে বুঝে নিও যে, মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর সাথে কোন চুক্তি বা প্রতিশ্রুতির অর্থ হলো ভয়ংকর মুসিবত এবং রক্তাক্ত যুদ্ধের আহ্বান জানানো। এ জন্য সব কিছু বুঝে শুনে পদক্ষেপ নেবে। নচেৎ তাঁকে নিজের ওপর ছেড়ে দাও।"

হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর বক্তৃতা শুনে হযরত বারা' বিন মা'রুর আবেগ উদ্বেলিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ

"হে আব্বাস। আমরা তোমার কথা শুনেছি। এবার আমাদের কথাও শোন। স্মরণ রেখ যে , আমরা কাপুরুষ নই। আমরা তরবারীর ছায়ায় লালিত পালিত হয়েছি।" অন্যান্য আনসার তার কথায় বাধা দিয়ে বললো, " হে আল্লাহর রাসূল। আপনিও কিছু বলুন ।"

হুযুর (সাঃ) কুরআনে হাকিমের কতিপয় আয়াত তিলাওয়াত করলেন এবং ইয়াছরিববাসীকে ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার নসিহত করলেন। অতঃপর বললেনঃ

"আমি তোমাদের নিকট থেকে এ বাইয়াত নিচ্ছি যে, তোমরা যেভাবে নিজের জীবন ও পরিবার-পরিজনকে হিফাজত করে থাকো তেমনি আমাকেও হিফাজত বা রক্ষা এবং দ্বীনের সম্প্রসারণে সহযোগিতা করবে।"

হযরত রাবা' (রাঃ) বিন মা'রুর তাঁর পবিত্র হাত ধরলেন এবং বললেন ঃ

www.amarboi.org

"হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কসম, আমরা আপন জীবন, সম্পদ এবং সন্তানসহ আপনার হিফাজত ও সাহায্য করবো।"

হযরত আবুল হাছিম (রাঃ) বিন তিহান এ সময় তার কথায় বাধা দিয়ে বললেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল ! বর্তমানে আমরা ইহুদীদের সাথে চুক্তিবদ্ধ আছি। আপনার হাতে বাইয়াতের পর তা বাতিল হয়ে যাবে। ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব পেয়ে আপনি আমাদেরকে যেন পরিত্যাগ না করেন।"

হুযুর (সাঃ) মুচকি হেসে বললেনঃ

"বরং আমার রক্ত তোমাদের রক্ত এবং আমার জিম্মা ও তোমাদের জিম্মা বরাবর। আমি তোমাদের মধ্য থেকে এবং তোমরা আমার থেকে। তোমরা যার সাথে লড়াই করবে আমিও তার সাথে লড়াই করবো এবং যার সাথে তোমরা সন্ধি করবে আমিও তার সাথে সন্ধি করবো।"

হুযুর (সাঃ)-এর ইরশাদ শুনে ইয়াছরাবের সকল ঈমানদার ব্যক্তি বাইয়াতের জন্য অগ্রসর হলেন। এ সময় হযরত আব্বাস (রাঃ) বিন উবাদাহ সাহাবীদেরকে সম্বোধন করে বললেনঃ

"বন্ধুগণ ! ভালোভাবে বুঝে নাও যে, তোমরা কোন্ বস্তুর বাইয়াত নিচ্ছ। এ বাইয়াত আরব এবং আজমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার নামান্তর। খুব ভালোভাবে জেনে নাও যে, তোমাদের ওপর এমন সময়ও আসতে পারে যে, আমাদের শরীকরা কতল হয়ে যেতে পারে। আমাদের সম্পদ বরবাদ হয়ে যেতে পারে। আমাদের মান-সম্ভ্রম নষ্ট হতে পারে। সে সময় আপদ-বিপদে ঘাবড়ে গিয়ে তোমরা রাসূল (সাঃ)-কে যেন পরিত্যাগ করে না বস।"

সকল আনসার এক বাক্যে বললো ঃ "হাঁ হাঁ, আমরা সকল বিপদ দেখেও বাইয়াত করছি।"

তারপর প্রিয়নবী (সাঃ) আনসারদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

www.amarboi.org

"আল্লাহর প্রসঙ্গে আমি বলছি যে, তোমরা তার ইবাদাত কর এবং কাউকেই তার সাথে শরীক করো না। নিজের ও সাথীদের জন্য এটা চাই যে, আমাদেরকে আশ্রয় দাও এবং যেভাবে নিজের জীবনকে রক্ষা করো সেভাবে আমাদেরকেও রক্ষা করবে।"

প্রশ্ন হলো ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যদি এ সকল কাজ করি তাহলে প্রতিদানে আমরা কি পাবো।" হুযুর (সাঃ) বললেন ঃ "জান্নাত।"

এ কথা শুনে আনসারদের অন্তর ঈমান ও ইয়াকিনের আলোয় প্রজ্বলিত হয়ে উঠলো এবং তারা বললো ঃ " তাহলে আপনি যা কিছু চান, তার জন্যই আমরা প্রস্তুত রয়েছি।"

এরপর একের পর এক তারা হুযুর (সাঃ)-এর হাতে বাইয়াত হলেন। ইতিহাসে এ বাইয়াতকে বাইয়াতে উকাবায়ে ছানিয়া, বাইয়াতে উকাবায়ে কবিরাহ এবং বাইয়াতে লাইলাতুল উকাবা নামে খ্যাত হয়ে আছে। আর ইসলামের ইতিহাসে এটা মাইল স্টোনের মর্যাদা রাখে। বস্তুতঃ এটা আরব এবং আজম, জ্বীন ও ইনসানের সাথে লড়াইয়ের বাইয়াত ছিল। এ সময় আরবের মাটির প্রতিটি কণা হকের ঝাণ্ডাবাহীদের রক্ত পিপাসু ছিল এবং আরবের কোন কাবিলাই হক পন্থীদের সাহায্যের ঘোষণা দানের সাহস রাখতো না। সেই ঘন ঘোর দুর্দিনে ইয়াছরিবের এ সব পবিত্র মানুষ উঠে দাঁড়ালেন এবং কালেমায়ে হক বুলন্দ করার জন্য জীবন, সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিকে মক্কার রাসূল (সাঃ)-এর পবিত্র পদধূলী প্রদানেরও আকাংখা ব্যক্ত করলেন। সে পবিত্র রাতে প্রিয় নবী (সাঃ)-এর সাথে তাঁরা যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিলেন তা বাস্তবেও কার্যকর করে দেখিয়েছিলেন। কত শুভ ও সুন্দর ছিলেন সে সকল ব্যক্তিত্ব যাঁরা জীবনবাজী রেখে এ বাইয়াত করেছিলেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিষ্ঠা এবং সততার সে বাইয়াত বা ওয়াদা পূরণ করেছিলেন।

চরিতকাররা বলেছেন, যখন এ বাইয়াত সম্পন্ন হলো তখন হযরত আব্বাস (রাঃ) বিন উবাদাহ দাঁড়িয়ে অত্যন্ত আবেগের সাথে বললেন, " হে আল্লাহর রাসূল! আপনি চাইলে আগামী সকালেই আমি হকের শত্রুদেরকে তরবারীর স্বাদ গ্রহণ করাতে পারি।" হুযুর (সাঃ) বললেন, "না, এখনো সে নির্দেশ আসেনি।"

www.amarboi.org

বাইয়াত উকাবায়ে কবিরার পর হযরত আব্বাস (রাঃ) বিন উবাদাহ এবং তার দু'তিন জন সাথী মক্কাতেই স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান। (অন্য এক বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ইয়াছরিব ফিরে যান এবং সেখান থেকে মক্কা আগমন করেন। তারপর মক্কার হক পন্থীদের সাথেই অবস্থান করেন) হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সাঃ) মুসলামানদেরকে মদীনায় হিজরাতের অনুমতি প্রদান করলে তিনিও তাদের সাথে হিজরাত করে মদীনা গমন করেন। এ জন্য তাঁকে মুহাজিরী আনসার বলা হয়।

হযরত রাসূলে করিম (সাঃ) মক্কা থেকে হিজরতের পর কিছুদিন কুবাতে অবস্থান করেছিলেন। তারপর তিনি যথার্থ ইয়াছরিবে (মদীনা) শুভ পদার্পণ করেন। মদীনার আনসাররা তাঁকে এক ঐতিহাসিক সমর্ধনা প্রদান করেন। এ সমর্ধনার উদাহরণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। প্রিয় নবী (সাঃ) বনু সালেমের মহল্লা অতিক্রম করছিলেন। এ সময় বনু সালেমের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে হযরত আব্বাস (রাঃ) বিন উবাদাহ এবং হযরত উতবান (রাঃ) বিন মালিক অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। তারা তাঁকে গরীব খানায় অবস্থানের জন্যও মিনতি জানান। কিন্তু এ সৌভাগ্য আল্লাহ পাক হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ)-এর তকদীরে লিখে রেখেছিলেন। এ জন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের আবেগের প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক এবং দোয়া করতে করতে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন।

কয়েক মাস পর প্রিয় নবী (সাঃ) মুহাজির এবং আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করেন। তখন হযরত আব্বাস (রাঃ) বিন উবাদাহকে জলিলুর কদর মুহাজির সাহাবী হযরত ওসমান (রাঃ) বিন মাজউনের দীনিভাই বানিয়ে দিলেন।

দ্বিতীয় হিজরীর রামাদান মাসে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হযরত আব্বাস (রাঃ) বিন উবাদাহ কোন বিশেষ কারণ বশতঃ তাতে অংশ নিতে পারেনি। এর ক্ষতিপূরণ হিসেবে তিনি পরবর্তী বছর ওহুদের যুদ্ধে অংশ নিয়ে মাথায় কাফন বেঁধে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন। এক বর্ণনা অনুযায়ী মক্কার মুশরিক সুফিয়ান বিন আবদি শামস তাকে শহীদ করে।

হাফিজ ইবনে হাজার (রঃ) "আল-ইসাবাহ" গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত আব্বাস (রাঃ) বিন উবাদাহ শাহাদাতের পূর্বে কিছু দিন আসহাবে সুফ্ফার দলেও ছিলেন।

www.amarboi.org

# হযরত হারাম (রাঃ) বিন মিলহান আনসারী

বিশ্ব নেতা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সাঃ) মক্কার মাটিকে বিদায় জানিয়ে মদীনা মুনাওয়ারা হতে শুভ পদার্পণ করলেন। এ সময় কতিপয় আনসারী সাহাবী (রাঃ) অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে রাসূল (সাঃ)-এর নিকট থেকে কুরআন করিমের তালিম হাসিল করেন এবং একইভাবে তা অন্যদেরকেও তালিম দেন। কুরআন হাকিমের প্রতি অসাধারণ ভালোবাসা পোষণকারী এ সব সাহাবীর মধ্যে মদীনা মুনাওয়ারাহ'র হারাম (রাঃ) বিন মিলহান নামক একজন যুবকও ছিলেন। আনসারের সম্ভ্রান্ততম বংশ বনু নাজ্জারের সাথে তিনি সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। তাঁর নসবনামা নিম্নরূপ ঃ

হারাম (রাঃ) বিন মিনহান বিন খালিদ বিন যায়েদ বিন হারাম বিন জুনদুব বিন আমের বিন গানাম বিন আদি বিন নাজ্জার বিন ছালাবা বিন আমর বিন খাযরাজ।

হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) এবং হযরত উম্মে হারাম (রাঃ) অত্যন্ত জলিলুল কদর সাহাবিয়াহ ছিলেন। তাঁরা উভয়েই হারাম (রাঃ) বিন মিলহানের সহোদরা ছিলেন। অনেক দূরের আত্মীয়তার সূত্রে তাঁরা রাসূল (সাঃ)-এর খালা হতেন। এ সম্পর্কে হযরত হারাম (রাঃ)-ও রাসূল (সাঃ)-এর মামু হতেন।

হযরত হারাম (রাঃ) বিন মিলহান অগ্রবর্তী আনসার সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত। তিনি নবী (সাঃ)-এর হিজরাতের পূর্বেই সহোদরাদের সাথে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। রহমতে আলম (সাঃ) মদনীতে তাশরীফ আনার পর অন্যান্য আনসার ভাইদের সাথে তিনিও তাঁকে অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে স্বাগতঃ জানিয়েছিলেন এবং দিবা-নিশি নবুয়্যাতের প্রস্রবণ থেকে ফয়েজপ্রাপ্ত হতে থাকেন। এমনকি অল্প সময়ের মধ্যেই কুরআন-সুন্নাহর আলেম হয়ে গেলেন। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, তিনি বেশীর ভাগ সময়

www.amarboi.org

কুরআন পড়তেন এবং রাতে কুরআনের দরস পেশ করতেন। এভাবে তিনি "ক্বারী" উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন।

হযরত হারাম (রাঃ) অত্যন্ত একনিষ্ঠ মুসলমান ছিলেন এবং তাঁর ঈমানী আবেগের কোন সীমা–পরিসীমা ছিল না। রাতে দরসে কুরআন শেষে আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল হয়ে যেতেন এবং সকাল পর্যন্ত নামায পড়তেন। দিনে মাসজিদে নববী এবং আসহাবে সুফফার খিদমত আবশ্যক করে নিয়েছিলেন। সহিহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, তিনি মসজিদে নববীতে পানি ভরে রাখতেন। অতঃপর জঙ্গলে গিয়ে কাঠ সংগ্রহ করে আনতেন এবং তা বিক্রি করে আসহাবে সুফ্ফা ও অন্যান্য অভাবগ্রস্ত মুসলামানদের খানা–পিনার ব্যবস্থা করতেন। উন্নত চরিত্র এবং নিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি রাসূল (সাঃ)–এর নৈকট্য লাভ করেছিলেন।

দ্বিতীয় হিজরীর রমাদান মাসে হক এবং বাতিলের প্রথম সংঘর্ষ ঘটে বদরের প্রান্তরে। হযরত হারাম (রাঃ) বদরী সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি জীবন বাজী রেখে লড়াই করেন। কতিপয় বর্ণনায় বর্ণিত আছে যে, পরবর্তী বছর ওহোদের যুদ্ধেও তিনি অংশ নিয়েছিলেন এবং বাহাদুরীর চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন।

চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে বনু কালাবের সরদার আবু বারা' আমের বিন মালিক নজদ থেকে মদীনা মুনাওয়ারা এসে রাসূল (সাঃ)–এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে কতিপয় ব্যক্তিকে তার সাথে তার কওমের নিকট ইসলামের দাওয়াত দানের জন্য প্রেরণের আবেদন জানালো। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তার আবেদন কবুল প্রশ্নে দ্বিধা প্রকাশ করলেন। কেননা কিছু দিন পূর্বে বনু আমেরের সরদার আমের বিন তোফায়েল এক চিঠিতে হুমকি প্রদান করে যে, মুহাম্মাদ (সাঃ) যেন তাকে স্থলাভিষিক্ত বানায় অথবা নরম জমিনে সে শাসন করুক এবং কঠিন জমিনে আমের শাসন করবে। নচেৎ সে হাজার হাজার যোদ্ধাসহ মদীনার ওপর হামলা করবে। এ আমের আবু বারার ভ্রাতৃষ্পুত্র ছিল। আবু বারা' বারবার নিশ্চয়তা প্রদান করে বললো যে, যেসব মুসলমান তার সাথে যাবে সে তাদের নিরাপত্তার জামিন হবে।

সহিহ বুখারীতে হযরত আনাস (রাঃ) বিন মালিক থেকে বর্ণিত আছে যে, প্রিয় নবী (সাঃ) (আবু বারা'র নিশ্চয়তার ভিত্তিতে) ৭০ জন সাহাবীকে হযরত হারাম (রাঃ) বিন মিলহানের নেতৃত্বে নজদ প্রেরণ করেছিলেন। তাদের বেশী সংখ্যকই

www.amarboi.org

ছিলেন আনসার এবং আসহাবে সুফ্ফার সদস্য। তাঁরা কুরআনে করিমের হাফেজ এবং কারী উপাধিতে মশহুর ছিলেন। হুযুর (সাঃ) আমের বিন তোফায়েলের নামে একটি পত্রও সেই দলের হাতে প্রদান করলেন। এ সব সাহাবী মদীনা থেকে বিদায় গ্রহণ করে বি'রে মাউনা নামক স্থানে এসে থেমে গেলেন। স্থানটি ছিল মক্কা মুয়াজ্জমা এবং আসফানের মধ্যে। ওয়াকেদী বর্ণনা করেছেন যে, এটা বনি সুলাইমের একটি পুকুর ছিল। আর তা ছিল বনি আমের ও বনু সুলাইমের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত।

হযরত হারাম (রাঃ) বিন মিলহান বিশ্বনবী (সাঃ)-এর পত্র নিয়ে আমের বিন তোফায়েলের নিকট গেলেন। সেই হতভাগা রাসূল (সাঃ)-এর পত্র পর্যন্ত না পড়ে এবং আরবদের প্রচলিত মেহমানদারীকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এক ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করলো। সে ব্যক্তি পিছন দিক থেকে এসে হযরত হারাম (রাঃ)-কে বর্শা মারলো। এ বর্শা তাঁর শরীরের এপার ওপার হয়ে বেরিয়ে গেল। হযরত হারাম (রাঃ) আঁজলা ভরে রক্ত উঠিয়ে নিজের চেহারা এবং মাথায় ছিটিয়ে দিয়ে বললেন, "কাবার রবের কসম! আমি সফল হয়েছি।" এ কথা বলেই তিনি মাটিতে ঢলে পড়লেন এবং মাথায় শাহাদাতের মুকুট পরিধান করে জান্নাতবাসী হয়ে গেলেন।

ওয়াকেদী বর্ণনা করেছেন যে, হযরত হারাম (রাঃ) বিন মিলহানের ওপর বর্শা নিক্ষেপকারীর নাম ছিল জাব্বার বিন সালমা কিলাসবী। পরে জাব্বার লোকদের নিকট হযরত হারামের "আমি সফল হয়েছি" এ কথার অর্থ জিজ্ঞেস করেছিল। তারা বলেছিল যে, এর অর্থ হলো "আমি বেহেশত লাভে সক্ষম হয়েছি।" জব্বার এ কথা শুনে বললো, "খোদার কসম! সে সত্য কথা বলেছে।" এরপর সে ইসলাম গ্রহণ করে।

হযরত হারাম (রাঃ) -এর শাহাদাতের পর আমের বিন তোফায়েল বনু আমের গোত্রকে বললো, অন্যান্য মুসলমানের সাথেও এ ধরনের ব্যবহারই কর। কিন্তু তারা আবু বারা'র আশ্রয়ের কারণে তাতে আপত্তি করলো। ফলে আমের চারপাশের কতিপয় গোত্র যেমন বনু সুলাইম, রায়াল এবং জাকওয়ান প্রভৃতিকে একত্রিত করে মুসলমানদের ওপর হামলা করে বসলো।

অন্য এক রাওয়ায়েত অনুযায়ী মুসলমানরা হযরত হারাম (রাঃ)-এর শাহাদাতের খবর শুনে ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেলেন। আমের বিন তোফায়েল এবং তার

www.amarboi.org

অসংখ্য সাথী মুষ্টিমেয় মুসলমানদের ঘিরে ফেললো এবং দু'জন ছাড়া অবশিষ্ট সকলকে এক এক করে শহীদ করে ফেললো। এ দু'জনের মধ্যে একজন ছিলেন্ হযরত কা'ব (রাঃ) বিন যায়েদ আনসারী। তিনি গুরুতররূপে আহত হয়েছিলেন। মৃত মনে করে কাফেররা তাকে ফেলে গিয়েছিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন হযরত আমর (রাঃ) বিন উমাইয়া জুমরী। নজদীরা তাঁকে গ্রেফতার করেছিল। পরে সুযোগ পেয়ে তিনি পালিয়ে এসেছিলেন। অবশ্য অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, আমের বিন তোফায়েলের মাতা মানত পূরা করার জন্য তাকে মুক্ত করে দিয়েছিল।

হযরত আমর (রাঃ) বিন উমাইয়া মদীনা পৌঁছে এ লোমহর্ষক ঘটনার কথা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে অবহিত করলেন। এ খবর পেয়ে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। সাধারণত তিনি কারোর জন্য বদ দোয়া করতেন না। কিন্তু বিরে মাউনার দুঃখজনক শাহাদতের ঘটনায় তিনি খুব শোকাভীভূত হয়েছিলেন। সহীহ বুখারীর বর্ণনা মুতাবেক রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একমাস পর্যন্ত হতভাগা হন্তাদের জন্য বদ দোয়া করেছিলেন। প্রিয় নবী (সাঃ) হযরত হারাম (রাঃ) বিন মিলহানকে চিরকাল স্মরণ রেখেছিলেন। তিনি কখনো কখনো বলতেন, উম্মে হারাম (রাঃ) এবং উম্মে সুলাইম (রাঃ)-এর জন্য আমার খুব দুঃখ হয়। তাদের ভাই জুলুম হয়ে শাহাদাত বরণ করেছিলো।

– X –

www.amarboi.org

# হযরত হাসিলুল ইয়ামান (রাঃ)

চরিতকারেরা হযরত হাসিলুল ইয়ামান (রাঃ)-এর নাম তিন ভাবে লিখেছেন। তা হলো ঃ হুসাইল, হাসিল এবং হাসল। তাঁর কুনিয়াত ছিল আবু হুজাইফা। সকল চরিতকারই তাঁর কুনিয়াত প্রশ্নে ঐকমত্য পোষণ করেন। হযরত আবু হুজাইফা হাসিল (রাঃ)-এর সম্পর্ক ছিল গাতফানের আবাস বংশের সাথে। নসবনামা হলো ঃ হাসিল (রাঃ) বিন জাবের বিন আমর বিন রবিয়াহ বিন ফারুদাহ বিন হারিছ বিন মাযিন বিন কাত্তিয়াহ বিন আবাস।

হাফিজ ইবনে আবদুল বার (রঃ) "আল-ইসতিয়াব গ্রন্থে লিখেছেন যে, হাসিল (রাঃ)-এর দাদার নাম ছিল ইয়ামান। এ জন্য তিনিও ইয়ামান উপাধিতে মশহুর হন। তাঁর সুখ্যাতিরও কারণ আছে। তিনি স্বগোত্রের এক ব্যক্তিকে হত্যা করে পালিয়ে মদীনা চলে এসেছিলেন। এখানে তিনি বনি আবদিল আশহালের সাথে বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং সেই বংশের এক মহিলা রুবাব (রাঃ) বিনতে কাবের বিন আদি বিন আবদিল আশহাল-এর সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। বস্তুতঃ তিনি ইয়েমেনী ছিলেন। এ জন্য তাঁর মিত্র তাঁকে আল-ইয়ামান বলা শুরু করে।

হযরত হাসিল (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কিত দু'ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। এক বর্ণনায় বর্ণিত আছে যে, তিনি পুত্র হযরত হুজাইফার সাথে নবী (সাঃ)-এর হিজরাতের পূর্বে ঈমান এনেছিলেন। ইবনে আছির (রাঃ)-এর মত অনুযায়ী হযরত হুজাইফা (রাঃ) হিজরাতের পূর্বে মক্কা পৌঁছেন এবং প্রিয় নবী (সাঃ)-এর সাথে হিজরাতের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, হযরত হাসিল (রাঃ), স্ত্রী রুবাব (রাঃ) বিনতে কা'ব এবং দু'পুত্র হুজাইফা (রাঃ) ও সাফওয়ান (রাঃ) হিজরাতের [ অর্থাৎ হুযুর (সাঃ)-এর মদীনায় শুভ পদার্পণের সাথে সাথে] পর ইসলাম গ্রহণ করেন।



www.amarboi.org

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, বদরের যুদ্ধের সময় হযরত হাসিল (রাঃ) পুত্র হুজাইফা (রাঃ)-কে সাথে নিয়ে যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য বের হলেন। দুর্ঘটনাবশতঃ রাস্তায় কুরাইশ মুশরিকদের হাতে পড়ে গেলেন। তারা বললো, তোমরা সম্ভবতঃ মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর নিকট গমন করছো। আমরা তোমাদেরকে কোন মতেই যেতে দেব না। হযরত হাসিল (রাঃ) বললেনঃ আমরা মদীনা যাচ্ছি। তাতে তোমাদের আপত্তির কি থাকতে পারে? মুশরিকরা বললো, ঠিক আছে। তাহলে যুদ্ধে অংশ নেবে না। এ ব্যাপারে কসম খাও। উভয়েই অনিচ্ছাকৃতভাবেই যুদ্ধে অংশ না নেয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন। ফলে কাফিররা তাদেরকে মুক্ত করে দিল। মুক্তির পর নবীজী (সাঃ)-এর দরবারে হাজির হয়ে সকল ঘটনা খুলে বললেন। হুযুর (সাঃ) বললেন, নিজের প্রতিশ্রুতির ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকো এবং বাড়ী ফিরে যাও। রইলো বিজয় ও সাহায্যের ব্যাপার। তা আল্লাহর হাতে রয়েছে। আমরা আল্লাহর নিকটই তা কামনা করবো।

ওহোদের যুদ্ধের সময় হযরত হাসিল (রাঃ) পুত্র হুজাইফা (রাঃ)-কে সাথে নিয়ে মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য বের হলেন। হুযুর (সাঃ) হযরত হাসিল (রাঃ)-কে দুর্বল দেখে অন্য আরেকজন বয়স্ক বুজর্গ হযরত ছাবিত (রাঃ) বিন ওয়াকশের সাথে মহিলা ও শিশুদের নিকট এক উঁচু টিলার ওপর অথবা দুর্গে বসিয়ে দিলেন। হাফিজ ইবনে আবদুল বার (রাঃ) "ইসাবাহ" গ্রন্থে লিখেছেন, হুযুর (সাঃ) উভয়কেই মহিলা এবং শিশুদের হিফাজতের জন্য নিয়োগ করেছিলেন। যুদ্ধ শুরু হলে জিহাদী আবেগ উভয় বুজর্গকে অস্থির করে ফেললো। একে অপরকে বললো। "তোমার পিতার মৃত্যু হোক।" আমরা এখানে কেন হাতের ওপর হাত রেখে বসে থাকবো। আজ না মরি, কাল তো মরতেই হবে। চলো, আল্লাহর পথে লড়াই করি। আল্লাহ পাক শাহাদাতের নিয়ামত নসিব করতে পারেন। সুতরাং উভয় বুজর্গ তরবারী হাতে নিয়ে লড়াইয়ের ময়দানে এসে দাঁড়লেন। মুশরিকরা হযরত ছাবিত (রাঃ) বিন ওয়াকশকে শহীদ করে ফেললো। মুসলমানরা হযরত হাসিল (রাঃ)-কে চিনতে না পেরে তার ওপর তরবারী চালিয়ে দিল। হযরত হুজাইফা (রাঃ) চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, "ইনি আমার পিতা, ইনি আমার পিতা।" কিন্তু যুদ্ধের ডামাডোলে কেউ তার কথা শুনতে পেল না এবং হযরত হাসিল (রাঃ) মুসলমানদের হাতে শাহাদাতের পিয়ালা পান করে জান্নাতুল ফিরদাউসে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

হযরত হুজাইফা (রাঃ) পিতার শাহাদাতে খুব মনোকষ্ট পেলেন। কিন্তু তিনি ধৈর্য ধারণ করলেন এবং ইয়াগফিরুল্লাহু লাকুম বলে চুপ মেরে গেলেন। প্রিয় নবী

www.amarboi.org

(সাঃ) এ ঘটনার কথা জানতে পেরে হযরত হুজাইফা (রাঃ)-কে ডেকে অত্যন্ত দুঃখ করলেন এবং হাসিল (রাঃ) শহীদের দিয়ত আদায় করলেন। কিন্তু হযরত আবু হুজাইফা (রাঃ) এ দিয়তের অর্থ গ্রহণ সহ্য করতে পারলেন না এবং তিনি তা মিসকিনদের মধ্যে সাদকাহ করে দিলেন। নবী করিম (সাঃ) তাঁর এ আবেগের প্রশংসাকরলেন।

এক বর্ণনায় আছে যে,হুযুর (সাঃ) এ ঘটনা শুনে বললেন, হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তি উভয়েই জিহাদের ছওয়াব পাবেন।

হাফিজ ইবনে হাজার (রঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত রুবাব (রাঃ) বিনতে কা'বের ঔরষে হযরত হাসিল (রাঃ)-এর পাঁচ সন্তান জন্ম নিয়েছিল। হুজাইফা (রাঃ), সা'দ, সাফওয়ান (রাঃ), মাদলাজ এবং লাইলা তাদের মধ্যে শুধু হযরত হুজাইফা এবং হযরত সাফওয়ান (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য হয়েছিল। হযরত হুজাইফা (রাঃ) নবী (সাঃ)-এর নৈকট্য লাভ করতে পেরেছিলেন এবং তিনি সাহিবিস সির অর্থাৎ রাসূল (সাঃ)-এর গোপনীয়তা রক্ষাকারী হিসেবে খ্যাত হয়েছিলেন। তিনি বড় বড় সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হতেন।

০ ০ ০

www.amarboi.org

# হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন যায়েদ আনসারী

হযরত আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন যায়েদ বিন আছেম এমন জলিলুলকদর মাতার কোলে লালিত-পালিত হয়েছিলেন, যিনি রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি ছিলেন নিবেদিতা চিত্ত। তিনি হকের জন্য জীবন, সন্তান, এবং সম্পদ কুরাবানীর আবেগের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এ মহিলার নাম ছিল নসিবাহ (রাঃ) বিনতে কা'ব। ইতিহাসে তিনি উম্মে আম্মারাহ কুনিয়াতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর ভাইয়ের নাম ছিল হাবিব (রাঃ) বিন যায়েদ বিন আছেম।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন যায়েদ খাযরাজের সম্ভ্রান্ত শাখা বনু নাজ্জারের পাদ প্রদীপ ছিলেন। তাঁর নসবনামা হলো ঃ আবদুল্লাহ (রাঃ) যায়েদ বিন আছেম বিন কাব বিন আমর বিন আওফ মাবজুল বিন আমর গানাম বিন আযুন বিন নাজ্জার বিন ছালাবাহ বিন আমর বিন খাযরাজ।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর পিতা যায়েদ বিন কাব আছেম ইসলামের যুগ পাননি। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর শৈশব অবস্থাতেই মারা যান। তাঁর মাতা হযরত উম্মে আম্মারাহ অত্যন্ত সৎ স্বভাবসম্পন্ন মহিলা ছিলেন। তিনি আনসারদের অগ্রবর্তী দলের মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকেন। বাইয়াতে উকাবায়ে উলা অর্থাৎ প্রথম বাইয়াতে উকাবার পর হযরত মাছয়াব (রাঃ) বিন উমাইর ইয়াছরাবে ইসলামের তাবলিগ শুরু করলে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। নবুয়াত প্রাপ্তির ১৩ বছরে মদীনা থেকে ৭৫ ব্যক্তির একটি দল মক্কা গিয়ে লাইলাতুল উকাবাতে রাসূল (সাঃ)-এর হাতে বাইয়াত করলেন এবং প্রিয় নবী (সাঃ)-কে ইয়াছরিব গমনের দাওয়াত প্রদান করেন। তিনি এ দলের অন্যতম সদস্যা ছিলেন।

কতিপয় রাওয়ায়েতে আছে যে, হযরত উম্মে আম্মারাহ পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ) এবং হযরত হাবিব (রাঃ) তাঁর সাথেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। অন্য রাওয়াতে আছে, হযুর (সাঃ) যখন মক্কা থেকে হিজরাত করে মদীনা তাশরীফ আনেন তখন তারা ইসলাম

www.amarboi.org

গ্রহণ করেন। এ সব বর্ণনার সামঞ্জস্য বিধান এভাবে করা যায় যে, নবী (সাঃ)-এর হিজরাতের পূর্বেই তিনি মাতার সাথে মুসলমান হন। কিন্তু হিজরাতের পর রাসূল (সাঃ)-এর হাতে বাইয়াত করেন।

বদরের যুদ্ধে (দ্বিতীয় হিজরীর রামাদান মাস) হযরত আবদুল্লাহর অংশগ্রহণ প্রশ্নে মতভেদ রয়েছে। কতিপয় চরিতকার বলেছেন যে, তিনি বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। আবার অনেকে বলেছেন যে, সে সময় তার বয়স ১৫ বছরের কম ছিল। এ জন্য তাতে অংশ নিতে পারেননি। অবশ্য বদরের যুদ্ধের পর রাসূল (সাঃ)-এর যুগে সংঘটিত অন্যান্য সকল যুদ্ধেই তার অংশ গ্রহণ প্রশ্নে চরিতকাররা একমত পোষণ করেন।

আল্লামা ইবনে সায়াদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন, ওহোদের যুদ্ধে (তৃতীয় হিজরী) হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন যায়েদ-এর মাতা হযরত উম্মে আম্মারাহ (রাঃ) এবং ভ্রাতা হাবিব (রাঃ) সহ অংশ নিয়েছিলেন এবং অত্যন্ত বাহাদুরীর সাথে লড়াই করেন। তার মাতা এ যুদ্ধে এমন নজিরবিহীন বাহাদুরী এবং দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছিলেন যে, ওহোদের মহিলা লকবে খ্যাত হয়ে গিয়েছিলেন। হঠাৎ করে তখন হুযুর (সাঃ)-এর নিকট হাতে গোনা মাত্র কয়েকজন জীবন উৎসর্গকারী ছিলেন। এর পূর্বে হযরত উম্মে আম্মারাহ (রাঃ) অন্যান্য মহিলার সাথে মশকে পানি ভরে মুজাহিদদেরকে পান করাচ্ছিলেন এবং আহতদের শুশ্রূষা করছিলেন। যখন তাঁরা রাসূল (সাঃ)-কে বিপদাপন্ন দেখলেন তখন মশক ফেলে দিয়ে তরবারী এবং ঢাল হাতে তুলে নিলেন এবং প্রিয় নবী (সাঃ)-এর নিকট পৌঁছে কাফেরদের সামনে বুক পেতে দিলেন। কাফেররা বারবার হুযুর (সাঃ)-এর দিকে এগিয়ে আসছিল। এ সময় হযরত উম্মে আম্মারাহ (রাঃ) অন্যান্য সাহাবীদের সাথে মিলে তীর ও তরবারী দিয়ে বাধা দিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে এক মুশরিক তাকে লক্ষ্য করে তার মাথার ওপর তরবারীর আঘাত হানলো। তিনি ঢাল দিয়ে আঘাত ফিরিয়ে দিলেন এবং তার ঘোড়ার পায়ের ওপর এমন আঘাত হানলেন যে, ঘোড়া ও তার আরোহী মাটির ওপর পতিত হচ্ছিল।

প্রিয় নবী (সাঃ) এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করছিলেন। তিনি হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-কে ডেকে বললেন ঃ

"আবদুল্লাহ! তোমার মাতাকে সাহায্য কর।" রাসূল (সাঃ)-এর ডাক শুনে তিনি তৎক্ষণাৎ এগিয়ে এলেন এবং তরবারীর এক আঘাতে হামলাকারী মুশরিককে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলেন। ঠিক সে সময় অপর আরেক জন মুশরিক

www.amarboi.org

দ্রুত এসে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)–এর বাম বাহু জখম করে চলে গেল, হযরত উম্মে আম্মারাহ (রাঃ) নিজের হাতে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)–এর জখম বাঁধলেন এবং বললেনঃ "পুত্র যাও! যতক্ষণ দম আছে অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাস নিতে পার ততক্ষণ লড়াই কর।"

হুযুর (সাঃ) তাঁর জীবন উৎসর্গের আবেগ দেখে বললেনঃ "হে উম্মে আম্মারাহ! তুমি যে সাহসের পরিচয় দিয়েছ তা আর কার মধ্যে হবে।"

ইত্যবসরে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)–কে আহতকারী মুশরিক ফিরে পুনরায় হামলা করে বসলো। হুযুর (সাঃ) উম্মে আম্মারাহ (রাঃ)–কে বললেন ঃ "উম্মে আম্মারাহ! ঠেকাও! ঠেকাও! এটি সেই দুর্ভাগা যে আবদুল্লাহ (রাঃ)–কে আহত করছিল।" হযরত উম্মে আম্মারাহ ফিরে তরবারীর এমন আঘাত হানলেন যে, সে দু'টুকরো হয়ে পড়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এ দৃশ্য দেখে মুচকি হাসলেন এবং বললেনঃ উম্মে আম্মারাহ ! তুমি নিজের পুত্রের খুব প্রতিশোধ নিয়েছ।"

মোট কথা, উম্মে আম্মারাহ শেষ পর্যন্ত লড়াই অব্যাহত রেখেছিলেন এবং আহত হয়েছিলেন। এক বর্ণনায় আছে যে, তাঁর শরীরের ১২টি স্থানে ক্ষত হয়েছিল। যুদ্ধের পর হুযুর (সাঃ) স্বয়ং তাঁর ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছিলেন এবং কয়েকজন বাহাদুর সাহাবীদের নাম নিয়ে বলেছিলেন ঃ "আল্লাহর কসম! আজ উম্মে আম্মারাহ তাদের সবার চেয়ে বেশী বাহাদুরী দেখিয়েছে।"

অন্য আরো বর্ণনায় আছে যে, হুযুর (সাঃ) বলতেন, ওহোদের দিন ডাইনে বামে যেদিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করতাম শুধু উম্মে আম্মারাই পরিদৃষ্ট হতো।

ওহোদের যুদ্ধের পর হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন যায়েদ খন্দকের যুদ্ধেও বাহাদুরী প্রদর্শন করেন। ৬ষ্ঠ হিজরীতে তিনি হুদাইবিয়াতে বাইয়াতে রেদওয়ানে অংশগ্রহণের মহান মর্যাদা হাসিল করেছিলেন। এমনিভাবে তিনি "আসহাবুশ শাজারাহ'র সেই পবিত্র দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন যাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক প্রকাশ্য ভাষায় নিজের সন্তুষ্টির সুসংবাদ দিয়েছিলেন। এরপর তিনি মা–সহ খায়বারের যুদ্ধে অংশ নেন। অতপর সপ্তম হিজরীতে মা–সহ উমরাতুল

www.amarboi.org

কাজাতে হুযুর (সাঃ)-এর সাথী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। ৮ম হিজরীতে তিনি সেই দশ হাজার পবিত্র দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ পান যারা মক্কা বিজয়ের সময় রাসূল (সাঃ)-এর সহযোগী ছিলেন।

সেই বছরই তিনি হুনাইনের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। এ যুদ্ধেও তাঁর মাতা সাথে ছিলেন। বিশ্বনবী মুহাম্মাদ মুস্তফা (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) খেলাফতের আসনে সমাসীন হন। এ সময় হঠাৎ করে সমগ্র আরবে ধর্মত্যাগের আগুন প্রজ্জলিত হয়ে ওঠে। ধর্মত্যাগীদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল নজদ কবিলার বনু হানিফার সরদার মুসাইলামাহ কাজ্জাব। সে নবুয়াতের দাবী করে ৪০ হাজার লোককে নিজের ঝাণ্ডা তলে একত্রিত করে ফেললো। সে সময় হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর ভ্রাতা হযরত হাবিব (রাঃ) বিন যায়েদ আম্মান থেকে মদীনা আসছিলেন। তিনি যালেম মুসাইলামার হাতে ধৃত হলেন। সে তাকে ধর্মত্যাগে বাধ্য করলো। কিন্তু তিনি পরিষ্কার অস্বীকৃতি জানালেন। মুসাইলামা তার শরীরে এক এক অঙ্গ কর্তন করে ফেললো। তবু তিনি শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত বলতে থাকলেনঃ "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল।"

তাঁর এ নির্যাতনমূলক শাহাদাতের খবর শুনে হযরত উম্মে আম্মারাহ এবং হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) খুবই মনোকষ্ট পেলেন। কিন্তু হাবিব (রাঃ)-এর অটলতায় আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করেলেন। তাঁরা মুসাইলামার নিকট থেকে এ যুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণের ওয়াদাও করলেন।

এ ঘটনার কিছু দিন পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) হযরত খালিদ (রাঃ) বিন ওয়ালিদকে মুসাইলামাকে উৎখাতের জন্যে নিয়োগ করলেন। এ সময় হযরত উম্মে আম্মারাহ (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) উভয়েই হযরত খালিদ (রাঃ)-এর বাহিনীতে সামিল হয়ে গেলেন। মুসাইলামা যুদ্ধের ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল। সে ৪০ হাজার যোদ্ধাকে মুসলমানদের মুকাবিলায় এনে দাঁড় করিয়ে দিল। আকরাবা (ইয়ামামা) নামক স্থানে মুরতাদ এবং হক পন্থীদের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ শুরু হলো। কখনো মুসলমানরা পেছনে হটে যেতে লাগলো। আবার কখনো তারা মুরতাদদেরকে পেছনে হটিয়ে দিলো। হযরত খালিদ (রাঃ) বিন ওয়ালিদ যুদ্ধের এরূপ দেখলেন। তিনি মুসলমানদের সকল গোত্রকে পৃথক করে প্রত্যেক গোত্রকে স্ব স্ব ঝাণ্ডার তলে কাজ করার নির্দেশ দিলেন। এ কৌশলের যথেষ্ট ফল দিলো। প্রত্যেক গোত্র বাহাদুরী এবং দৃঢ়তার ক্ষেত্রে একে

অপরকে ডিঙিয়ে যেতে চাইলো। ফলে মুরতাদরা অস্থির হয়ে পড়লো। মুসাইলামা নিজের বাহিনীর মধ্যে পরাজয়ের লক্ষণ দেখতে পেয়ে শিষ্যদেরকে ডেকে বললো জীবন বাঁচাতে চাইলে পালাও। হযরত উম্মে আম্মারাহ (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) প্রথম থেকেই মুসাইলামার নিকট পৌঁছার চেষ্টা করছিলেন। এক্ষণে তাঁরা সে সুযোগ পেলেন। উম্মে আম্মারাহ (রাঃ) আঘাতের পর আঘাত খেতে খেতে নিজের বর্শা দিয়ে রাস্তা তৈরী করতে করতে তার দিকে অগ্রসর হলেন। এতে তিনি শরীরে ১১টি আঘাত পেয়েছিলেন। মুসাইলামার নিকট পৌঁছে তিনি বর্শা দিয়ে তার ওপর হামলা করতে চাইছিলেন। দু'টি অস্ত্র এক সাথে তার ওপর নিপতিত হলে দ্বিখণ্ডিত হয়ে সে ঘোড়ার নীচে পড়ে গেল। উম্মে আম্মারাহ (রাঃ) দৃষ্টি উঠিয়ে দেখলেন যে, তাঁর পাশে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) দাঁড়িয়ে আছেন এবং নিকটেই হযরত ওয়াহশী (রাঃ) দাঁড়িয়ে ছিলেন। ওয়াহশী (রাঃ) নিজের অস্ত্র মুসাইলামার ওপর নিক্ষেপ করেছিলেন এবং সে সময় হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) তার ওপর তরবারী চালিয়েছিলেন। হযরত উম্মে আম্মারাহ (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) উভয়েই হযরত হাবিব (রাঃ)-এর হত্যাকারী ও মুসলমানদের ঘোরতর শত্রুর মৃত্যুতে কৃতজ্ঞতার সিজদা আদায় করলেন। হযরত খালিদ (রাঃ) অত্যন্ত দ্রুত হযরত উম্মে আম্মারাহ (রাঃ)-এর চিকিৎসা করালেন এবং তার এ সকল ক্ষতস্থান ভালো হয়ে গেলো।

এ ঘটনার পর হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন যায়েদ দীর্ঘ জীবন পেয়েছিলেন। কিন্তু খুলাফায়ে রাশেদীন (রাঃ) আমীরে মাবিয়ার (রাঃ) খিলাফতকালে তাঁর তৎপরতা সম্পর্কে চরিতগ্রন্থগুলো নীরব। ৬৩ হিজরীতে মদীনাবাসীরা ইয়াযিদের বাইয়াত ছিন্ন করে হযরত আবদুল্লাহ বিন হানজালাকে আমীর বানিয়ে নেয়ার পর তিনি জনসমক্ষে আবির্ভূত হলেন। ইয়াযিদ মদীনাবাসীর কর্মপন্থা সম্পর্কে অবহিত হয়ে তাদেরকে অনুগত বানানোর জন্য একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করলো। হযরত আবদুল্লাহ বিন হানজালাহ (রাঃ) সে বাহিনীর সাথে মোকাবিলা করার জন্য শহরবাসীর নিকট থেকে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত যুদ্ধের বাইয়াত গ্রহণ শুরু করলেন। আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন যায়েদকে বাইয়াত গ্রহণের কথা বলা হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, বাইয়াতের শর্ত কি? জবাব দেয়া হলো যে,'মৃত্যু'। তিনি বললেন, রাসূল (সাঃ)-এর পর এ শর্তে আমি কারো হাতে বাইয়াত করতে পারি না।

www.amarboi.org

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন হানজালাহ (রাঃ)-এর হাতে মৃত্যুর বাইয়াত না করা সত্ত্বেও ইয়াযিদের শাসনে খুব অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং তার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করা জিহাদের মর্যাদার সমতুল্য মনে করতেন। সুতরাং নিজের দু'পুত্র খাল্লাদ এবং আলীকে সাথে নিয়ে অন্যান্য মদীনাবাসীর মত ইয়াযিদী বাহিনীকে রুখে দাঁড়ালেন এবং অত্যন্ত বাহাদুরীর সাথে লড়াই করতে করতে দু'পুত্রসহ শহীদ হয়ে গেলেন। সে সময় তাঁর বয়স প্রায় ৭৫ বছর।

জ্ঞান ও ফজিলতের দিক থেকে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন যায়েদ এক বিশেষ মর্যাদায় সমাসীন ছিলেন। হাদীসের কিতাবসমূহে তাঁর থেকে বর্ণিত বেশ কিছু হাদীস রয়েছে। তাঁর হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে রয়েছেন উবাদ বিন তামিম (রাঃ), সাঈদ (রাঃ) বিন মুসাইয়িব (রাঃ), ইয়াহিয়া বিন আম্মারাহ (রাঃ), উবাদাহ বিন হাবিব (রাঃ) এবং ওয়াসে বিন হাইয়ান (রাঃ)।

মুসনাদের আহমদ বিন হাম্বলের এক বর্ণনায় জানা যায় যে, বিশ্বনবী (সাঃ) হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন যায়েদকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং তার বাড়ী যেতেন। একবার প্রিয়নবী (সাঃ) তার বাড়ী গেলেন তিনি পানি আনলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ওযু করলেন। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর ওযু করার পদ্ধতি স্মরণ করে নিলেন। বস্তুতঃ এক যামানা পর লোকেরা হুযুর (সাঃ)-এর ওযু করার পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর নিকট জিজ্ঞেস করলে তিনি স্বয়ং তাদের সামনে ওযু করে বলে দিলেন যে, হুযুর (সাঃ) এ পদ্ধতিতে ওযু করতেন।

###

www.amarboi.org

# হযরত ছুরাকাহ (রাঃ) বিন আমর আনসারী

সাইয়্যেদেনা হযরত ছুরাকাহ (রাঃ) বিন আমর আনসারী অত্যন্ত মর্যদাবান সাহাবী ছিলেন। তিনি একদিকে রাসূল (সাঃ)-এর যুগে সকল ধরনের মর্যাদা পেয়েছিলেন। অন্যদিকে শাহাদাতের সৌভাগ্যও লাভ করেছিলেন। আনসারের সম্ভ্রান্ত বংশ বনু নাজ্জারের সাথে তিনি সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। তাঁর নসবনামা হলোঃ ছুরাকাহ বিন আমর বিন আতিতাহ বিন খানছা বিন মাবজুল বিন আমর বিন গানাম বিন মালিক বিন নাজ্জার।

ছুরাকাহ (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণকাল সম্পর্কে চরিতকারবা নির্দিষ্ট করে কিছু বলেননি। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যে, নবী (সাঃ)-এর হিজরতের কিছু পূর্বে অথবা তাৎক্ষণিক পরেই ঈমান আনার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। যুদ্ধসমূহ শুরু হলে হযরত ছুরাকাহ (রাঃ) সর্বপ্রথম বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তারপর তিনি ওহোদ এবং পরিখার যুদ্ধে বাহাদুরী প্রদর্শন করেন।

ষষ্ঠ হিজরীর জিলকদ মাসে বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ওমরাহ আদায়ের জন্য মদীনা মুনাওয়ারাহ থেকে মক্কা মুয়াজ্জামার দিকে রওয়ানা হলেন। এ সময় মুহাজির ও আনসারদের ১৪'শ সাহাবী তাঁর সহযাত্রী ছিলেন। হযরত ছুরাকাহ (রাঃ)-ও এ ১৪শ'র একজন ছিলেন। কুরাইশরা মুসলমানদের রওয়ানার কথা জানতে পেরে একদম তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো। মুসলমানরা যাতে মক্কায় প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য মাথায় কাফন বেধেঁ প্রস্তুত হলো। প্রিয় নবী (সাঃ) মক্কার কাফেরদের ইচ্ছার কথা জানতে পেরে রাস্তা পরিবর্তন করে হুদাইবিয়া নামক স্থানে তাঁবু টাঙ্গালেন। সেখান থেকে তিনি একজন দূতকে কুরাইশদের নিকট এ বাণীসহ প্রেরণ করলেন যে, আমরা শুধু ওমরাহ পালনের জন্য এসেছি। যুদ্ধ করা উদ্দেশ্য নয়। এটাই ঠিক হবে যে, কুরাইশরা আমাদের সাথে কিছুদিনের জন্য সন্ধি করে নিক। কুরাইশরা উরওয়া (রাঃ) বিন মাসউদ ছাকাফীকে (সে সময় পর্যন্ত ঈমান আনেন নি) দূত হিসেবে মুসলমানদের নিকট প্রেরণ করলো। রাসূল (সাঃ)-এর সাথে আলাপ-আলোচনা শেষে সে মক্কা ফিরে গিয়ে কুরাইশদের সাথে মুসলমানদের সন্ধি করে দেয়ার প্রস্তাব দিল। কিন্তু কুরাইশরা তার

www.amarboi.org

কথা শুনলো না। নবী করিম (সাঃ) পুনরায় আরেকজন দূতকে কুরাইশদের কাছে প্রেরণ করলেন। কুরাইশরা তার সাথে দূর্ব্যবহার করলো। এক রাওয়ায়েত অনুযায়ী তার ওপর হামলা করে বসলো। কিন্তু তিনি বেঁচে গেলেন। এক্ষণে হুযুর (সাঃ) হযরত ওসমান গনি (রাঃ)-কে দূত বানিয়ে প্রেরণ করলেন। তিনি একজন বন্ধুর সহযোগিতায় মক্কায় গেলেন। কিন্তু কুরাইশরা তাকে মক্কায় আটকে ফেললো। ওদিকে মুসলমানদের মধ্যে আবেগের তুফান সৃষ্টি হলো। প্রিয় নবী (সাঃ) বললেন, যদি এ খবর সঠিক হয় তাহলে আমরা ওসমান (রাঃ)-এর রক্তের বদলা না নেয়া পর্যন্ত এ স্থান ত্যাগ করবো না। এ কথা বলে তিনি (সাঃ) একটি বাবলা বৃক্ষের নীচে বসে পড়লেন এবং সেখানে উপস্থিত সাহাবীদের জীবন কুরবানীর বাইয়াত গ্রহণ করেন। এর নাম বাইয়াতে রেদওয়ান। অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টির বাইয়াত। কেননা এ বাইয়াতকারীদের ব্যাপারে আল্লাহ পাক এ ভাষায় নিজের সন্তুষ্টির কথা প্রকাশ করেছেনঃ "অবশ্যই আল্লাহ খুশী হয়েছিলেন ঈমান আনয়নকারীদের ওপর। যখন তারা তোমার হাতে এ বৃক্ষের নীচে বাইয়াত করছিল।"

হযরত ছুরাকাহ (রাঃ) বিন আমরও সেই সৌভাগ্যবান সাহাবীর অন্যতম ছিলেন যারা বাইয়াতে রেদওয়ানে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করেছিলেন।

পরে জানা গেল যে, হযরত ওসমান (রাঃ)-এর শাহাদাতের খবর সঠিক ছিল না। কিন্তু মুসলমানদের উৎসাহ উদ্দীপনা এবং হকের প্রতি আবেগের প্রভাবে কুরাইশরা হিম্মত হারা হয়ে পড়লো। ফলে তারা কতিপয় শর্তে মুসলমানদের সাথে সন্ধি করে নিল। এ শর্তাবলীর মধ্যে একটি শর্ত এ ছিল যে, মুসলমানরা এ বছর ফিরে যাবে এবং আগামী বছর এসে ওমরাহ করবে (কিন্তু এতে মক্কায় শুধুমাত্র তিনদিন অবস্থান করতে পারবে।)

সপ্তম হিজরীতে প্রিয় নবী (সাঃ) সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ)-এর এক বিরাট দলসহ মক্কা তাশরীফ আনলেন এবং অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে কাজা ওমরাহ আদায় করলেন। এ সময়ও হযরত ছুরাকাহ (রাঃ) বিন আমর হুযুরের (সাঃ)-এর সাথী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।

হুদাইবিয়ার সন্ধির পর বিশ্বনবী (সাঃ) আশে-পাশের রঈস এবং বাদশাদের নিকট ইসলামের দাওয়াতনামা সম্বলিত পত্র প্রেরণ করলেন। একটি পত্র তিনি বসরার শাসক শুরাহবিল বিন আমরের নামেও লিখলেন এবং হারেছ (রাঃ) বিন উমাইর ইজদীকে এ পত্রসহ শুরাহবিলের নিকট পাঠালেন। এ যালেম হযরত হারিছ (রাঃ)-কে শহীদ করে

ফেললো। হুযুর (সাঃ) হযরত হারেছ (রাঃ)–এর বদলা নেয়ার জন্য তিন হাজার মুজাহিদ সমন্বয়ে গঠিত এক বাহিনী হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন হারেছার নেতৃত্বে প্রেরণ করেলন। এ বাহিনীতে হযরত ছুরাকাহ বিন আমরও যোগ দিয়েছিলেন। ওদিকে শুরাহবিলের সাহায্যার্থে রোমের কাইসার এক বিরাট বাহিনী প্রেরণ করলো। মুসলমান এবং খৃষ্টানরা মুতা নামক স্থানে পরস্পর মুখোমুখি হলো। উভয় বাহিনীর অনুপাত ছিল ১ঃ ৪০। কিন্তু মুসলমানেরা আল্লাহর ওপর ভরসা করে শত্রুর ভীতিপ্রদ শক্তিকে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেললো। সেনাপতি হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন হারেছা অত্যন্ত বাহাদুরীর সাথে লড়াই করে শহীদ হয়ে গেলেন। তারপর হযরত জাফর (রাঃ) বিন আবি তালিব ঝাণ্ডা ধরলেন। তিনিও শহীদ হয়ে গেলেন। অতপর হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন রাওয়াহা আনসারী নেতৃত্ব হাতে নিলেন। তিনিও শাহাদাতের পিয়ালা পান করলেন। এ সময় হযরত খালিদ (রাঃ) বিন ওয়ালিদ মুসলমানদের কমাণ্ড হাতে নিলেন এবং চরম বীরত্বের সাথে লড়াই করে মুসলমানদেরকে শত্রুর পঙ্গপালের কবল থেকে মুক্ত করে আনলেন। হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন হারেছা হযরত জাফর (রাঃ) বিন আবি তালিব এবং হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন রাওয়াহা ব্যতীত অন্য আর যেসব বীর এ যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন হযরত ছুরাকাহ (রাঃ)–ও তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।

###

www.amarboi.org

# হযরত যিয়াদ (রাঃ) বিন লবিদ আনসারী

প্রিয় নবী (সাঃ) –এর নবুয়াত প্রাপ্তির ১৩ বছর পর মদীনা মুনাওয়ারাহ্ থেকে ৭৫ জন পবিত্র ব্যক্তিত্ব মক্কা গমন করেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে মদীনা আগমনের দাওয়াত দেন। এ সব ব্যক্তিত্ব রাসূল (সাঃ)-কে শুধু দাওয়াতই দেননি এবং নিজের জীবন, সম্পদ এবং সন্তান রক্ষার মত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এ পবিত্র আত্মার ব্যক্তিবর্গের মধ্যে হযরত যিয়াদ (রাঃ) বিন লবিদ আনসারী অন্যতম ছিলেন। সময়টি ছিল ঘনঘোর দুর্যোগপূর্ণ সময়। আরবের প্রতিটি অণু-পরমাণু মানবতার শুভাকাংখী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং তাঁর অনুসারীদের খুন পিপাসু ছিল। তাঁকে মদীনায় আহবান শুধু মক্কাবাসীদেরই নয় সমগ্র আরবই যুদ্ধের ময়দানে ডাকার শামিল ছিল। কিন্তু আল্লাহকেই এ সকল পবিত্র বান্দাহ সব কিছু হক পথে নিয়োজিত করলো। তাঁরা কোন ভয়েও ভীত হলো না এবং কোন মুসিবতকেও পরওয়া করলেন না। লাইলাতুল উকাবার বাইয়াত তাদেরকে এমন মহান মর্যদায় অভিষিক্ত করছিল যে কিয়ামত পর্যন্ত তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। হযরত যিয়াদ (রাঃ)-এর সম্পর্ক ছিল খাযরাজ গোত্রের শাখা "বনু রিয়াজার" সাথে। তাঁর বংশনামা হলো, যিয়াদ (রাঃ) বিন লবিদ ছায়ালাবা বিন সিনান বিন আমের বিন উমাইয়াহ বিন রিয়াজাহ্ বিন আমের বিন যারিক বিন আবদি হারিছা বিন মালিক বিন গাজাব বিন জাশাম বিন খাযরাজ।

হযরত যিয়াদ (রাঃ) বিন লবিদ বংশের অন্যতম অফুরন্ত প্রাণ সম্পন্ন মানুষ ছিলেন। আল্লাহ্ তায়ালাহ তাঁকে সুন্দর স্বভাব দান করছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টাতেই আওস এবং খাযরাজ গোত্রের অনেক পবিত্র আত্মার মানুষ দাওয়াতে হকের প্রতি সাড়া দিয়েছিলেন। হযরত যিয়াদ (রাঃ) বিন লবিদও এ দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এভাবে তিনি আনসাদের অগ্রবর্তী দলের সদস্য হন। নবুয়াত প্রাপ্তির ১৩ বছর পর তিনি বাইয়াতে উকাবায়ে কবিরায় অংশ গ্রহণের মহান সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। এ বাইয়াতের পর যখন মদীনায় মুহাজিরদের আগমন শুরু হলো তখন হযরত যিয়াদ (রাঃ) মদীনার অন্য তিন সম্মানিত ব্যক্তি হযরত জাকওয়ান (রাঃ) বিন আবদি কায়েস, হযরত আব্বাস (রাঃ) বিন উবাদাহ নাজলাহ ও হযরত উকবাহ (রাঃ) বিন ওয়াহাবের সাথে মক্কা পৌছেন এবং

www.amarboi.org

কিছুদিন পর অনেক মক্কী সাহাবী (রাঃ)-এর সাথে ফিরে আসেন। এ ভিত্তিতে সকল সাহাবী মুহাজিরী আনসারী উপাধিতে খ্যাত হয়েছিলেন।

মক্কা থেকে হিজরাতের পর বিশ্ব নবী (সাঃ) কিছু দিন কূবায় অবস্থান করেন। অতপর বিশ্বনবী (সাঃ) একটি নির্দিষ্ট দিনে মদীনায় প্রবেশ করেন। অতপর তিনি (সাঃ) একটি নির্দিষ্ট দিনে মদীনায় প্রবেশ করেন। মদীনার ইতিহাসে দিনটি সবচেয়ে স্মরণীয় দিন ছিল। মদীনার আনসাররা প্রাণভরা উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে রাসূল (সাঃ)-কে স্বাগত জানালে- এবং প্রকৃত অর্থে নিজেদের মন-প্রাণকে রাসূল (সাঃ)-এর নিকট সঁপে দিলেন। হুযুর (সাঃ) বনু বিয়াজার মহল্লা অতিক্রম করছিলেন। এ সময় হযরত যিয়াদ (রাঃ) বিন ফরদ মুবারকবাদ জ্ঞাপন এবং অবস্থানের জন্য নিজের বাড়ী পেশ করলেন। কিন্তু ভাগ্য নিয়ন্তা এ সম্মানের জন্য হযরত আবু আইউব আনসারী (রাঃ)-এর গৃহ নির্বাচিত করে রেখেছিলেন। এ জন্য হুযুর (সাঃ) তাঁকে বললেন, "আমার উটনীকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দাও। সে হুকুমের দাস। আল্লাহর তরফ থেকে নিজেই মনযিল তালাশ করে নেবে।"

রাসূলে করিম (সাঃ) মদীনায় স্থায়ীভাবে অবস্থানের পর হযরত যিয়াদ (রাঃ) বিন লবিদ প্রায় সময়ই নবীজি (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত থাকতেন এবং খুব করে ফয়েজ লাভ করতেন। এভাবে তিনি সম্মানিত সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হতে থাকলেন। তিরমিজী শরীফে বর্ণিত আছে যে, একবার প্রিয় নবী (সাঃ) তাকে বললেন, এখন ইলম উঠে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। হযরত যিয়াদ (রাঃ) নবী (সাঃ)-এর এত সান্নিধ্য অর্জন করছিলেন যে, তিনি নির্দ্বিধায় কথাবার্তা বলতেন। তিনি আরজ করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! এখনতো ইলম মানুষের শিরা-উপশিরায় পৌঁছে গেছে। তা উঠে যাওয়ার সময় আবার কি করে এলো? হুযুর (সাঃ) তাঁর এ বক্তব্যকে কম বুদ্ধির কথা বলে মনে করলেন এবং কিছুটা কঠিন ভাষায় বললেনঃ

"হে যিয়াদ! তোমার মাতা তোমার ওপর ক্রন্দন করুক। আমি তোমাকে খুব বিজ্ঞ মানুষ মনে করতাম। তোমার কি দৃষ্টিগোচর হয় না যে, ইহুদী এবং খৃষ্টানরা তাওরাত এবং ইঞ্জিল অধ্যয়ন করে থাকে। কিন্তু তা থেকে কোন ফায়দা গ্রহণ করে না।

হযরত যিয়াদ (রাঃ) এ কথায় কেঁপে উঠলেন এবং আরজ করলেন, ঃ হে আল্লাহ রাসূল ! অবশ্যই আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আপনি সঠিক কথা বলেছেন।

www.amarboi.org

আল্লাহর পথে জিহাদে যিয়াদ (রাঃ)-এর খুব আগ্রহ ছিল। তিনি বদর ওহুদ, খন্দক এবং রাসূল (সাঃ)-এর যুগে সংঘটিত অন্যান্য যুদ্ধেও হুযুর (সাঃ)-এর সাথী হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন।

নবম হিজরীর মুহাররাম মাসে রাসূলে করিম (সাঃ) ছাদকা এবং যাকাত আদায়ের জন্য পৃথক পৃথক আদায়কারী নিয়োগ করলেন। এ সময় হযরত যিয়াদ (রাঃ) বিন যবিদকে হাজরা মাওতের আদায়কারী হিসেবে নিয়োগ করলেন এবং সে সাথে সেখানকার রাজস্ব আদায়কারী হিসেবে নিয়োগ পেলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) শুধু সে ব্যক্তিকেই কোন পদ দিতেন যে সে পদের আকাংখা করতো না এবং সে দায়িত্ব সুন্দরভাবে পালনের যোগ্য হতেন। হুযুর (সাঃ)-এর নির্ধারিত এ মাপকাঠির আলোকে হযরত যিয়াদ (রাঃ)-এর ব্যক্তিত্ব এবং যোগ্যতা সহজেই অনুমান করা যায়।

রাসূল (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর ধর্মত্যাগের এক হিড়িক পড়ে গেল। এ সময় ইয়েমেনের এক বিরাট সংখ্যক মানুষ ফিতনার শিকার হলো। এবং যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানালো। খলিফাতুর রাসূল (সাঃ) হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) হযরত মুহাজির (রাঃ) বিন উমাইয়াকে নাজরান, কুন্দাহ এবং হাজরে মাওতের মুরতাদদের উৎখাতের কাজে নিয়োজিত করলেন। হযরত যিয়াদ (রাঃ)-কেও সহযোগিতা করার জন্য পত্র লিখলেন। হযরত মুহাজির (রাঃ) বিন উমাইয়া নাজরান এবং ছালায়র মুরতাদদের উৎখাত করে কুন্দাইর দিকে অগ্রসর হলেন। মারবি ও হাজরা মাওতের মধ্যবর্তী স্থানে পৌছার পর হযরত যিয়াদ (রাঃ) পত্র পেলেন। পত্র খুব তাড়াতাড়ি কুন্দাহার ওপর হামলার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। এ পত্র পেয়েই হযরত মুহাজির (রাঃ) দ্রুত অগ্রসর হয়ে হযরত যিয়াদ (রাঃ)-এর নিকট পৌঁছলেন। কুন্দাহতে চারটি দূর্গ ছিল। এ সকল দূর্গকে মাহজার বলা হতো। কুন্দাহবাসীর সরদার অথবা বাদশা আশয়াছ বিন কায়েস যবরকান দূর্গে থাকতো। হযরত মুহাজির (রাঃ) ও হযরত যিয়াদ (রাঃ) যবরকানের ওপর হামলা করলেন। মুরতাদরা হামলা বরদাশত করতে না পেরে পালিয়ে নাজির নামক দূর্গে গিয়ে আশ্রয় নিল। হযরত মুহাজির (রাঃ) এবং হযরত যিয়াদ অত্যন্ত কঠোরভাবে দূর্গটি অবরোধ করলেন। এ অবরোধে আশয়াছের নাভিশ্বাস উঠলো। উপায়ান্তর না দেখে সে হযরত যিয়াদ (রাঃ)-কে পয়গাম পাঠিয়ে বললো যে, এত লোককে নিরাপত্তা দিলে সে দূর্গ তার হাতে ন্যস্ত করবে। হযরত যিয়াদ (রাঃ) এ প্রস্তাব মেনে নিলেন এবং চুক্তি লিখিতভাবে আনার জন্য আশয়াছকে বলে পাঠালেন। সে চুক্তি লিপিবদ্ধ করে আনলো। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হযরত যিয়াদ (রাঃ) তাতে সিল মোহর লাগিয়ে দিলেন। এরপর আশয়াছ দূর্গের দরজা খুলে দিল। মুরতাদদের একটি দল

www.amarboi.org

মুসলমানদের মুকাবিলা করলো। কিন্তু তাদের বেশীর ভাগই মারা গেল। এবং অবশিষ্টদের মুসলমানরা গ্রেফতার করলো। চুক্তিনামা দেখা হলো। কিন্তু তাতে আশয়াছ বিন কায়েছের নাম ছিল না। ঘাবড়ে গিয়ে নিজের নাম লিখতে ভুলে গিয়েছিল। এ জন্য তাকেও অন্যান্য কয়েদীর সাথে মদীনা পাঠিয়ে দেয়া হলো। সেখানে সে তওবাহ করে। দ্বিতীয়বার ইসলাম গ্রহণ করে। অন্য এক বর্ণনা অনুযায়ী হযরত যিয়াদ (রাঃ) রক্তাক্ত যুদ্ধের মাধ্যমে মুরতাদদের ওপর বিজয় লাভ করেছিলেন এবং আশয়াছ বিন কায়েসকে গ্রেফতার করে আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)-এর নিকট পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। যা হোক, হযরত যিয়াদ (রাঃ) মুরতাদের উৎখাতের ব্যাপারে কোন শৈথিল্য প্রদর্শন করেননি। সিদ্দিকে আকবর (রাঃ)-এর পর হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-ও নিজের শাসনকালে হযরত যিয়াদ (রাঃ)-কে হাজরে মাওতের ইমারাতের দায়িত্বে নিয়োজিত রাখেন। এ পদ থেকে পদচ্যুতির পর তিনি কুফা অথবা সিরিয়ায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং সেখানেই ৪১ হিজরীতে ওফাত পান।

হযরত যিয়াদ (রাঃ) বিন লবিদ থেকে কতিপয় হাদীস বর্ণিত আছে। এ সকল হাদীস আওফ বিন মালিক, সামিল বিন আবিল জায়াদান (রঃ) এবং জোবায়ের বিন নুফায়ের (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

* * *

www.amarboi.org

# হযরত হাস্‌সান (রাঃ) বিন সাবিত আনসারী

জাহেলী যুগে আরবরা ছিল উম্মি। উম্মি হওয়া সত্ত্বেও তাদের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল। এ সব বৈশিষ্ট্যের কারণে অনেক জাতির ওপর তাদের প্রাধান্য ছিল। আরব জাতি ছিল মূর্খ, অভদ্র এবং অশিষ্ট। কিন্তু ভাষার অলংকরণ এবং বাকপটুতার দিক দিয়ে এ জাতি ছিল অদ্বিতীয়। সম্ভাষণ ও কাব্যের ক্ষেত্রে তাদের গৌরব ছিল শীর্ষে। এ কারণেই তারা অন্য জাতিকে আজাম বা বোবা হিসেবে আখ্যায়িত করতো। প্রত্যেক গোত্রের কবি স্বগোত্রের মর্যাদা ও প্রশংসার নিশান বরদার- ধাওবাহী ছিলেন। তারা শক্তিশালী বর্ণনার মধ্য দিয়ে যাকে চেতো মর্যাদায় তুঙ্গে তুলতো এবং যাকে চেতো দুর্নামের ভাগাড়ে নিপতিত করতো। পসন্দ-অপসন্দ ছাড়াও কবিকূল নিজেদের কাব্যকে জাতীয় ও রাজনৈতিক প্রয়োজনেও ব্যবহার করতেন। গোত্রসমূহের মান-সম্মান ও সম্ভ্রম এবং শাসকদের ইজ্জত তাদের হাতেই ছিল। এ জন্যেই বড় বড় সরদার তাদের সামনে নিশ্চুপ এবং শাসকরাও তাদের ভয়ে ভীত থাকতেন। যখন তারা কারোর প্রশংসা অথবা বিদ্রূপে কবিতা রচনা করতো তখন তা বিদ্যুৎ বেগে সারা আরবে ছড়িয়ে পড়তো এবং তা নির্বিশেষে সকলের মুখে মুখে ফিরতো। আরবদের এ চরিত্র এবং বিরান ভূমির মধ্যে মুহাম্মাদে আরাবী (সাঃ) আবির্ভূত হলেন। তাঁর তাওহীদের দাওয়াতের জবাব মক্কার মুশরিকরা যেভাবে দিয়েছিল তারই ফলশ্রুতিতে তিনি নিজের ঘর-বাড়ী এবং প্রিয় স্বদেশ ভূমিকে পরিত্যাগ করে মদীনা মুনাওয়ারাহ গমন করেন। তাতেও মুশরিকদের অন্তর ঠাণ্ডা হলো না। তাদের কবিরা বিশ্বনবী (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীদের বিদ্রূপে কবিতা রচনা করে সমগ্র আরবে ছড়াতে শুরু করলো। এ কবিতাবলী কয়েকদিনের মধ্যেই হাজার হাজার মাইল দূর পর্যন্ত পৌঁছে যেত। মক্কা থেকে মদীনার দূরত্ব ছিলতো মাত্র তিনশ' মাইল। মুসলমানদের নিকট যখন এ সব কবিতা পৌঁছতে লাগলো তখন তাঁরা অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। তাঁরা হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুকে মক্কার কবিদের বিদ্রূপের জবাব দানের জন্যে অনুরোধ জানালেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যদি অনুমতি দেন



www.amarboi.org

তাহলে তিনি তা করতে পারেন। তাঁর জবাব শুনে সাহাবারা (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর নিকট আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। মুশরিক কবিরা আপনার এবং আপনার জন্য জীবন উৎসর্গকারীদের বিদ্রূপ করে কবিতা রচনা করছে এবং তা সমগ্র আরবে প্রচার করছে। আপনি নির্দেশ দিলে হযরত আলী (রাঃ) এ অশ্লীল কথনের জবাব দিতে পারে।"

নবী করিম (সাঃ) বললেন ঃ "আলী এ কাজের উপযুক্ত নয়।"

অতপর তিনি আনসারদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেনঃ "যাঁরা তলোয়ার দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন, তাঁরা কি ভাষা দিয়ে এ বিদ্রূপের বাধা দিতে পারেন না?"

হুযুর (সাঃ)-এর এ ইরশাদ শুনে বয়স্ক একজন আনসার সাহাবী উঠে দাঁড়ালেন এবং নিজের জিহবা বের করে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে দেখালেন। অতপর অত্যন্ত উৎসাহের সাথে আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! এ কাজের জন্যে আমি হাজির। আল্লাহর কসম! রিসালাতের শত্রুদের কথার জবাবে বসরা, সিরিয়া এবং ইয়েমেনে আমার নিকট অন্য কোন কথাই প্রিয় নয়।"

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ "আমি যে বংশ থেকে স্বয়ং উদ্ভূত সে বংশের লোকদের বিদ্রূপ তুমি কিভাবে করবে।"

তিনি আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর সত্য রাসূল! তাদের মধ্য থেকে আপনাকে এ ভাবে পৃথক করবো যেভাবে আটার স্তূপ থেকে চুল বের করা হয়।"

নবী করিম (সাঃ) ঐ ব্যক্তির দিকে সুদৃষ্টিতে চাইলেন এবং তাঁর ওপর মুশরিকদের বিদ্রূপের জবাব দানের দায়িত্ব অর্পণ করলেন। অতপর দেখা গেল যে, সে ব্যক্তি নিজের শক্তিশালী কথা দিয়ে একদিকে মুশরিক কবিদের জবান বন্ধ করে দিয়েছেন, অন্যদিকে প্রিয় নবী (সাঃ)-এর প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা করে নিজের সকল শক্তি নিঃশেষ করে দিয়েছেন। এ সাহাবী যিনি নবী (সাঃ)-এর দরবারে সবচেয়ে বড় কবি হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তিনি ছিলেন হযরত হাস্সান (রাঃ) বিন সাবিত আনসারী।

www.amarboi.org

খাযরাজ গোত্রের প্রসিদ্ধ শাখা বনু নাজ্জারের সাথে সাইয়েদেনা হযরত হাস্সান (রাঃ) বিন সাবিতের সম্পর্ক ছিল। তাঁর বংশ তালিকা নিম্নরূপ ঃ

হাসসান (রাঃ) বিন সাবিত বিন মানযার বিন হারাম বিন আমর বিন যায়েদ মানাত বিন আদি বিন আমর বিন মালিক বিন নাজ্জার বিন সায়ালাবা বিন আমর বিন খাযরাজ।

তাঁর মশহুর উপাধি ছিল আবুল ওয়ালি। আসমাউর রিজাল গ্রন্থসমূহে তাঁর উপাধি হিসেবে আবুল হিছাম এবং আবু আবদুর রহমানও পাওয়া যায়। 'রাসূলুল্লাহ (সাঃ)–এর কবি' ছিল তাঁর পদবী। মায়ের নাম ছিল ফারিয়াহ বিনতে খালেদ। তিনি খাযরাজ বংশের বনু সায়েদাহর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন এবং খাযরাজ নেতা হযরত সায়াদ (রাঃ) বিন উবাদাহ'র ফুফার কন্যা ছিলেন। বংশ তালিকা হলো ঃ ফারিয়াহ (রাঃ) বিনতে খালেদ বিন খানিস বিন লাওজান বিন আবদুদ বিন যায়েদ বিন ছায়ালাবা বিন খাযরাজ বিন কায়াব বিন সায়েদাহ। তাঁরও ইসলাম গ্রহণ এবং সাহাবীয়াহ হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল।

কাব্য এবং কবির সাথে সম্পর্কযুক্ত বংশে হযরত হাস্সান (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দীর্ঘায়ু লাভ প্রশ্নেও বংশটির খ্যাতি ছিল। হযরত হাস্সান (রাঃ)–এর পরদাদা হারাম বিন আমরের ১২০ বছর বয়স হয়েছিল। তাঁর দাদা মানযারের বয়সও ১২০ বছর ছিল। পিতা সাবিতও ১২০ বছর জীবিত ছিলেন। স্বয়ং হযরত হাস্সান (রাঃ)–ও এ আয়ুই পেয়েছিলেন। মাবরাদ নাহুবী বর্ণনা করেছেন, হযরত হাসসান (রাঃ)–এর বংশের কয়েক পুরুষই কবি ছিল। তাঁর পরদাদা, দাদা, পিতা, পুত্র এবং নাতিও কবি ছিলেন। তাঁর কবিত্বের কথা বলতে গেলে–তিনি ছিলেন সমকালীন যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। কাব্যের প্রখ্যাত সমালোচক আবু ওবায়দাহ (রাঃ) বলেছেন, তিনটি বৈশিষ্ট্য হযরত হাসসান (রাঃ)কেঅন্যান্য কবি থেকে পৃথক করেছে ঃ

১. জাহেলী যুগে তিনি খাযরাজের [মদীনাবাসী] কবি ছিলেন।
২. রাসূলের যুগে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)–এর কবি ছিলেন।
৩. ইসলাম প্রচারের যুগে তিনি সমগ্র ইয়েমেনের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন।

আবু ওবায়দাহ (রাঃ) বলেছেন, সর্বসম্মত মত হলো মরু প্রান্তরের বাসিন্দার মধ্যে মদীনাবাসী, অতপর আবদুল কায়েস এবং তারপর বনু ছাকিফের কাব্য উত্তম। আর মদীনাবাসীর সবচেয়ে বড় কবি হলেন হাস্সান (রাঃ)।

www.amarboi.org

হযরত হাস্সান (রাঃ)–এর পিতা ও পিতামহ স্বগোত্রের সরদার ছিলেন। মসজিদে নববীর পশ্চিম দিকে বাবুর রাহমাতের সামনে অবস্থিত কাস্রে দূর্গে তাঁদের বাসস্থান ছিল।

হযরত হাস্সান (রাঃ) হিজরাতে নববী (সাঃ)–এর ৬০/৬৫ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং নবী (সাঃ)–এর হিজরাতের সময় ৬০/৬৫ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি জীবনের যতটুকু অংশ জাহেলী যুগে কাটিয়েছিলেন প্রায় ততটুকুই ইসলাম গ্রহণের পর জীবিত ছিলেন। ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণের পূর্বে তিনি সমগ্র আরবে নিজের কবিত্বের ভিত্তি মজবুত করেছিলেন এবং আরবের প্রতিটি শিশুও তাঁকে শক্তিশালী কবি হিসেবে জানতো।

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হযরত হাসসান (রাঃ)–এর দিন–রাত কেমন ভাবে কাটতো? বিভিন্ন ঐতিহাসিকের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, আপাদমস্তক তিনি কাব্যে বিভোর থাকতেন, আওস এবং খাযরাজের পারস্পরিক যুদ্ধে তিনি নিজের গোত্রের প্রশংসায় শক্তিশালী কবিতা রচনা করতেন এবং তাদেরকে প্রতিশোধমূলক তৎপরতায় উদ্বুদ্ধ করতেন। লড়াই থেকে ফুসরত পেলে হায়রাহ ও গাসসানের বাদশাহর দরবারে চলে যেতেন এবং তাদের প্রশংসায় শক্তিশালী কাসিদাহ রচনা করে পুরস্কার লাভ করতেন। গাস্সানের বাদশাহর প্রশংসায় রচিত তাঁর কবিতাঃ

> তিনি এমন দানশীল যে, তাঁর কাছে সব সময় মেহমানের আগমন ঘটে। তাঁর কুকুর অচেনা লোকের আগমনে ঘেউ ঘেউ করে না। [অর্থ হলো, তাঁর কাছে এত অধিক সংখ্যক মেহমানের আগমন ঘটে যে, তাঁর কুকুর তা মেনে নিয়েছে এবং অতে ঘেউ ঘেউ করে না] এবং স্বয়ং তিনি কাউকে জিজ্ঞেসও করেন না যে, সে কে, কোথা থেকে এসেছে এবং কেনই বা এসেছে। এ গৌরাঙ্গ চেহারার অভিজাত ব্যক্তিটি পেছনের লোকদের মধ্যে লম্বা নাক বিশিষ্ট।

আরববাসী রাজা–বাদশাহদের প্রশংসাকে অত্যন্ত নীচুমানের কাজ মনে করতো। শুধুমাত্র বড় বড় পুরস্কারের আশায়ই হযরত হাস্সান (রাঃ) গাসসানের বাদশাহ অথবা জাফনার বংশধরদের প্রশংসা করতেন না বরং তাঁরা তাঁর পিতামহের কুলের ছিলেন বলেই তাঁদের প্রশস্তি গাইতেন। তাঁদের প্রশস্তিকে তিনি নিজের গোত্রের প্রশস্তি মনে করতেন। নিজের গোত্রের প্রশস্তি এবং পিতা ও পিতামহের ব্যাপারে গৌরব করা প্রত্যেক আরব কবিই নিজের হক বলে ধারণা করতেন। হযরত হাসসান (রাঃ)–এর গোত্র খাযরাজ 'ইজদের' একটি শাখা ছিল। বংশনামার বিশেষজ্ঞদের নিকট 'ইজদ' বনু কাহতানভুক্ত। তাদের প্রকৃত দেশ ছিল ইয়েমেন। হযরত হাস্সান (রাঃ)–এর নসবনামা

www.amarboi.org

একদিকে গাসাসিনাহ্ অথবা আলে জাফনা পর্যন্ত পৌছে থাকে। তাঁরা সিরিয়ার গাস্সানী শাসক ছিলেন। অন্যদিকে লাখমিইয়ীন বংশের সাথে তাঁর বংশের সম্পর্ক ছিল। তাঁরা আরবের ইরাকের হিরার বাদশাহ ছিলেন। কেননা তাঁদের সবার পূর্বপুরুষ ছিলেন আমার মজিকিয়া বিন আমের বিন মাবুলসামা। আমর মজিকিয়ার এক পুত্র জাফনা সিরিয়ার প্রথম বাদশা ছিলেন। তাঁর বংশের কম-বেশী ১৯ জন বাদশাহ হয়েছিলেন। তাঁর নামের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার কারণেই গাসাসিনাহকে জাফনার বংশধরও বলা হয়। হযরত হাস্সান (রাঃ) আলে জাফনার প্রশস্তি অত্যন্ত জোরালো ভাষায় বর্ণনা করতেনঃ

"জাফনার সন্তান-সন্ততি নিজের পিতা ইবনে মাবিয়ার কবরের চারপাশে থাকে। যিনি অত্যন্ত দানশীল ও উদার ছিলেন।
এর অর্থ হলো জাফনার বংশধারা আরবের অন্যান্য গোত্রের মত যাযাবর নয়। বরং তারা বাদশাহর গোত্র এবং নিবিড়ভাবে নিজের পিতার কবরের চার পাশে অবস্থান করে। তাদের আবাসস্থল সবুজের সমারোহে ভরপুর। মরুভূমির মাটি তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।"

নিজের বংশের শরাফতের ওপর হযরত হাস্সান (রাঃ)-এর বড় গৌরব ছিল। একবার জনৈক কবি তাঁর সামনে নিজের বাপ-দাদার প্রশংসায় কবিতার কতিপয় চরণ পড়লেন। এ কবিতায় অন্যের বংশের প্রাধান্য দেয়া হয়েছিল। হযরত হাস্সান (রাঃ) তার জবাবে বললেনঃ

"তুমি কি জান না যে, আমরা আমর বিন আমরের বংশধর। আমাদের এমন এক বংশীয় গৌরব রয়েছে যা প্রত্যেক মর্যাদাবান লোকের চেয়েও বেশী মর্যাদাশালী। আমাদের বংশের শিকড় জমিনের একদম তলদেশে প্রোথিত। অতপর তা থেকে এমন শাখাসমূহ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে যা প্রত্যেক সিতারার মুকাবিলা করে থাকে। আমাদের মধ্যে অব্যাহতভাবে বাদশাহ এবং যুবরাজ জন্মগ্রহণ করে থাকে। আমরা যেন পূর্বদিকে উদিত প্রজ্জ্বলিত তারকা। এ তারকামণ্ডলীর কোন একটি যখন অদৃশ্য হয় তখন অন্য একটি দৃশ্যমান হয় এবং তা বিশ্বে অব্যাহতভাবে আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরণ করতে থাকে।

বর্তমান যুগের কিছু বিশেষজ্ঞ খাযরাজ এবং আওসকে [আনসারী] নাবত বিন ইসমাইলের বংশধর হিসেবে প্রমাণিত করেছেন। [অর্থাৎ কাহতানী নয় বরং আদনানী]। কিন্তু হযরত হাস্সান (রাঃ)-এর যুগে তাঁদেরকে কাহতানীই মনে করা হতো।

www.amarboi.org

জাহেলী যুগে হযরত হাস্‌সান (রাঃ) ও অন্যান্য কবির মত মদাসক্ত ছিলেন। একবার তিনি সিরিয়া গেলেন। সেখানে বনি বকর বিন ওয়ালের প্রখ্যাত কবি আ'শার সাথে সাক্ষাৎ হলো। দু'জনে মিলে এক মদের দোকানে গেলেন ঘুমিয়ে পড়লেন এবং খুব পিললেন। এরপর হাস্‌সান (রাঃ) সেখানেই ঘুমিয়ে পড়লেন। চোখ খুলে আশা'কে মদের দোকানদারকে বলতে শুনলেন, 'তার ঋণ করার প্রয়োজন হতো না, কিন্তু তার কাছে অর্থ নেই।' এ কথা শুনেই তিনি চক্ষু বন্ধ করলেন এবং দৃশ্যতঃ শুয়ে রইলেন। ইত্যবসরে আ'শার চোখ বুঁজে এলো। যখন দেখলেন যে, সে ঘুমিয়ে গেছে তখন তিনি চুপি চুপি উঠলেন এবং দোকানে যত মদ ছিল সব কিনে নিলেন ও তা মাটিতে ঢালতে লাগলেন। এ মদ গড়িয়ে গড়িয়ে আ'শার গায়ের নীচে পৌছলো। তার কাপড় ভিজে গেল। আ'শা চমকে ঘুম থেকে জাগলো। হাস্‌সান (রাঃ)–কে সরাবের নহর বহানো দেখে বুঝে ফেললেন যে, তিনি তার কথা শুনে ফেলেছেন। অনেক তোবামোদ ও ওজর আপত্তি পেশ করলো। হযরত হাস্‌সান (রাঃ) আরো উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন এবং নিজের দৃঢ়চিত্ততা ও উঁচু মর্যাদা সম্পর্কে অত্যন্ত শক্তিশালী কবিতা প্রকাশ্যতঃ আশা'কে শুনিয়ে দিলেন। সে একদম নিশ্চুপ হয়ে গেল। [ ইসলাম গ্রহণের পর হযরত হাস্‌সান কখনো মদ স্পর্শ পর্যন্ত করেননি ]।

একবার উকাজের বাজারে নাবিগাহ জবিয়ানির সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তৎকালীন যুগে তিনি প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। সে সময় তিনি হযরত খানসা (রাঃ)–এর কবিতা শুনছিলেন। খানসা (রাঃ) সে যুগে নজীর বিহীন মহিলা কবি ছিলেন এবং মর্সিয়া রচনায় বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তিনি চলে গেলে হযরত হাস্‌সান (রাঃ) নাবিগাহকে নিজের কবিতা শুনাতে শুরু করলেন। তাঁর কবিতা শুনে নাবিগার মুখ দিয়ে অযাচিতভাবে বেরিয়ে এলঃ ইন্নাকা লা শায়েরুন ( নিঃসন্দেহে তুমি কবি )।

অন্য এক বর্ণনা মতে তিনি এ বাক্য ব্যবহার করেছিলেন, 'তুমি কবি এবং আগে আগত বনি সুলাইমের বোন গোনসা (রাঃ) মর্সিয়া রচনাকারী।'

একদিন রাস্তার মাথায় বসে কয়েকজন বন্ধুকে নিজের কবিতা শুনাচ্ছিলেন। এ সময় জাহেলী যুগের নামকরা কবি হাতিয়াহ সেখান দিয়ে গমন করছিলেন। তিনিও দাড়িয়ে তাঁর কবিতা শুনতে লাগলেন। হাস্‌সান (রাঃ) তাঁকে চিনতেন না। ভাবলেন কোন গ্রাম্য গোঁয়ার। বললেন, এ বন্ধু কি শুনছিস? তিনি বলেন, 'এতে কোন অসুবিধেতো দেখছিনে।'

এ জবাব তিনি এত বেপরোয়াভাবে দিয়েছিলেন যে, হযরত হাস্‌সান (রাঃ) আরো অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন এবং বললেন, 'তোর পদবী কি?'

www.amarboi.org

তিনি বললেন, 'আবু লামিকাহ'।

হাস্সান বললেন, 'মহিলার নামে নিজের কুনিয়ত রেখেছিস। এর চেয়ে জিল্লতীর বিষয় আর কি হতে পারে।'

এরপর জিজ্ঞেস করলেন, 'তোর নাম কি?'

তিনি বললেন, 'হাতিয়াহ।'

নাম শুনে চিনতে পারলেন এবং চমকে উঠলেন, কিন্তু জাহেলী যুগের ঢংয়ে বললেন, 'তাহলে আপনি যেতে পারেন। খোদা হাফেজ।

তিনি চুপচাপ চলে গেলেন।

এ হাতিয়াহ হযরত হাস্সান (রাঃ)–এর পূর্ণ কবিত্বের স্বীকৃতি প্রদানকারী ছিলেন। তিনি তাঁকে 'আশআরুল আরব' [আরবের সবচেয়ে বড় কবি] বলতেন।

সংক্ষিপ্ত কথা হলো জাহেলী যুগেই হযরত হাস্সান [রাঃ] বিন সাবিত আরবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে পরিগণিত হন। কিন্তু জাহেলী যুগের কবিত্ব তাঁর গৌরবের বিষয় নয়। বরং ইসলাম গ্রহণের পর তিনি যে কাব্য রচনা করেন তা-ই হকপন্থীদের অন্তরের আওয়াজ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

হযরত হাস্সান (রাঃ) বিন সাবিত কবিতা ও সাহিত্যের পরিভাষায় উভয় যুগের কবি। অর্থাৎ তিনি এমন কবি যিনি জাহেলী যুগও পেয়েছেন আবার ইসলামের যুগও। ইসলাম গ্রহণের সময় বার্ধক্য এসে পড়েছিল। কিন্তু অন্যভাবে তাঁর কবিত্ব যৌবনপ্রাপ্ত হয়। এখন তিনি জাহেলী যুগের মৌলিকতা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে ওঠেন। রাসূল (সাঃ)–এর যুগে মুখ দিয়ে জিহাদই হলো হযরত হাস্সান (রাঃ)–এর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। একদিকে তিনি হকের শত্রু মুশরিক কবিদের অশ্লীল কথনের এমন দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিয়েছিলেন যে, তারা নীরব হয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে বিশ্বনেতা হযরত রাসূলুল্লা (সাঃ)–এর প্রশংসায় এমন উদ্দীপনা ও নিষ্ঠাপূর্ণ বাক্য রচনা করেন যে, সৃষ্টির প্রতিটি অণু পরমাণু উদ্বেলিত হয়ে ওঠে এবং সকল পূত-পবিত্র আত্মা তার ওপর সুখ্যাতির পুষ্পবৃষ্টি বর্ষণ করেন।

হাফেয ইবনে হাজর আসকালানী (রাঃ) 'তাহজীবুত তাহজীব' গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)–এর একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। এ বর্ণনায় বলা হয়েছে

www.amarboi.org

যে, 'হযরত হাসসান (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)–এর সাথে থেকে নিজের নফ্‌স এবং জবান দিয়ে জিহাদ করেছেন।'

এ বর্ণনায় স্পষ্ট হয় যে, হযরত হাস্‌সান (রাঃ) রাসূল (সাঃ) কৃত যুদ্ধসমূহে শরীক হয়ে তরবারী দিয়ে জিহাদও করেছেন। কিন্তু নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা এ মতের বিরুদ্ধাচারণ করেছেন। তাঁরা বলেন, হযরত হাস্‌সান (রাঃ) প্রকৃতিগতভাবে ( অন্তরের দিক দিয়ে ) দুর্বল ছিলেন। এ জন্যে কোন যুদ্ধে শরীক হয়ে তরবারী দিয়ে যুদ্ধ করতে পারেননি। বাস্তবিকই তিনি যদি যুদ্ধ মসূহে নিজের তরবারীর নিপুণতা না দেখিয়ে থাকেন তাহলে সেটা ছিল তার অক্ষমতা। এটা তাঁর বুজদিলী নয়। এটাই আমাদের মত। ইসলাম গ্রহণের সময় তাঁর বয়স ৬০ বছরের বেশী ছিল। দৃষ্টিশক্তিও ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। অবশেষে অন্ধই হয়ে গিয়েছিলেন। এ জন্যে আমাদেরকে সুধারণা পোষণ করতে হবে। আমাদেরকে মনে করতে হবে যে, তিনি বার্ধক্য এবং ক্ষীণ দৃষ্টির কারণে যুদ্ধে বাস্তবত অংশ গ্রহণে অক্ষম ছিলেন। এর ক্ষতিপূরণ তিনি ন্যায়ের প্রতি সমর্থন, হক পন্থীদের সুরক্ষা এবং রাসূল (সাঃ) প্রশস্তির মাধ্যমে করেছিলেন। অন্য কথায় হযরত হাস্‌সান (রাঃ) নবী (সাঃ)–এর যুগের যুদ্ধ সমূহে অবশ্যই শরীক হয়েছিলেন। কিন্তু তাতে তরবারী ধারণের পরিবর্তে ভাষার তরবারী দিয়ে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

ইবনে আসির (রাঃ) আহযাব যুদ্ধ প্রসঙ্গে (৫ হিজরী) হযরত হাস্‌সান (রাঃ)–এর ব্যাপারে এক হৃদয়গ্রাহী ঘটনার অবতারণা করেছেন। এ যুদ্ধে সমগ্র আরবের মুশরিক ও ইহুদী ঐক্যবদ্ধ হয়ে মদীনা মুনাওয়ারার ওপর হামলা করে বসে এবং বিশেষ করে মদীনার অভ্যন্তরস্থ ইহুদী বনি কোরায়জাহ গোত্র বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্যে এক পায়ে দাঁড়িয়েছিল। মুসলমানদের জন্যে এটা ছিল এক অগ্নি পরীক্ষা। কিন্তু আল্লাহর এ পবিত্র বান্দাদের দৃঢ়তা ও স্থিরতা এক মুহূর্তের জন্যেও এদিক ওদিক হয়নি–টলেনি। তারা কুফর ও শির্‌কের এ ভয়াবহ সংঘর্ষে আপাদমস্তক ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এ সময় হুযুর (সাঃ) মুসলমান মহিলা এবং শিশুদেরকে বনি কোরায়জাহর কপট ইহুদীদের হাত থেকে রক্ষার জন্যে ফারে' দুর্গে স্থানান্তর করলেন। এ দুর্গ ছিল হযরত হাস্‌সান (রাঃ)–এর খানদানের আবাসগৃহ। তিনি সতর্কতা হিসেবে মহিলা ও শিশুদের দেখাশুনার জন্যে হযরত হাস্‌সান (রাঃ)–কে দুর্গে রেখেছিলেন। কেননা ইহুদী বনি কোরায়জাহ এবং ফারে' দুর্গের মধ্যবর্তী স্থানে মুসলমানদের কোন বাহিনী ছিল না। সে ভয়াবহ সময়ে একদিন এক ইহুদী দুর্গের দিকে এলো এবং দুর্গে অবস্থানরত মানুষের খোঁজ খবর নিতে লাগলো। হুযুর (সাঃ)–এর ফুফু হযরত সুফিয়াহ (রাঃ) বিনতে আবদুল মুত্তালিবও এ যুদ্ধে ছিলেন। তিনি ইহুদীটিকে গোয়েন্দা তৎপরতায় লিপ্ত দেখলেন এবং হযরত হাস্‌সান (রাঃ)–কে বাইরে গিয়ে তাকে হত্যা করার কথা বললেন। হযরত হাস্‌সান (রাঃ) বললেন, আবদুল মুত্তালিবের কন্যা!

www.amarboi.org

আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করুন। আপনি অবগত আছেন যে, আমি এ ইহুদীর সাথে লড়াইয়ের যোগ্য নই।

হযরত সুফিয়াহ (রাঃ অত্যন্ত বাহাদুর মহিলা ছিলেন। তিনি হযরত হাস্সান (রাঃ)-এর জবাব শুনে নিজেই উঠে দাঁড়ালেন। তাঁবুর একটি খুটি উঠিয়ে নিলেন এবং বাইরে বেরিয়ে সে ইহুদীর মাথায় এমন জোরে আঘাত হানলেন যে, সে সেখানেই অক্কা পেলো। ফিরে এসে হযরত হাস্সান (রাঃ)-কে বললেন, এখন গিয়ে ইহুদীর মাথা কেটে ফেলুন এবং তার সরঞ্জাম নিয়ে আসুন।

হযরত হাস্সান (রাঃ) বললেন, 'হে আবদুল মুত্তালিবের কন্যা! তার সরঞ্জামের আমার কি প্রয়োজন? ( অথবা আমার তা লাভের খায়েস নেই )।

বনু মুসতালিকের যুদ্ধ (৫ম হিজরী) থেকে ফেরার পথে ইফকের দুঃখজনক ঘটনা ঘটলো। মুনাফিকরা উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহ (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে তোহমত বা মিথ্যা অপবাদ দিল।

মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সলুল এ ঘটনায় সবার অগ্রনায়ী ছিল। এ সময় হযরত হাস্সান (রাঃ)-এর কিছুটা পদস্খলন হয়। তিনি দু'একজন মুসলমানের সাথে মুনাফিকদের প্রতারণার জালে আবদ্ধ হন এবং তাদের কথার সাথে সুর মেলান। আল্লাহ তায়ালা উম্মুল মুমিনীন (রাঃ)-এর পবিত্রতা সম্পর্কিত ঘোষণা দানের পর নবী করীম (সাঃ) প্রতারিত মুসলমানদের ওপর কুরআন নির্দেশিত শাস্তির বিধান কার্যকর করেন। দণ্ডপ্রাপ্তদের মধ্যে হযরত হাস্সান (রাঃ)-ও ছিলেন। মুনাফিকরা উম্মুল মুমিনীনের সাথে একজন অত্যন্ত মুখলিস ও পবিত্র সাহাবী হযরত সাফওয়ান (রাঃ) বিন মুয়াত্তালকেও জড়িত করে। তিনি এ অপবাদের জন্যে আবেগের বশবর্তী হয়ে হযরত হাস্সান (রাঃ)-এর ওপর তরবারী চালিয়ে দিয়েছিলেন।

ইবনে আসীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন, এ ঘটনার পর হযরত হাসসান (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দরবারে হযরত সাফওয়ান (রাঃ) বিন মুয়াত্তালের বিরুদ্ধে শিকায়েত করলেন। প্রিয়নবী (সাঃ) তার কিসাসে হযরত হাস্সান (রাঃ)-কে খেজুরের একটি বাগান প্রদান করালেন এবং তিনি সেখানে আবাসস্থল তৈরী করেছিলেন। কিন্তু সহীহ বুখারীর এক রাওয়ায়েতে দেখা যায় যে, যখন হযরত হাস্সান (রাঃ)-এর এক নিকটাত্মীয় হযরত আবু তালহা আনসারী (রাঃ) ( বনু নাজ্জারের একজন নেতা ) নিজের মূল্যবান সম্পত্তি

বিরহা সাদকাহ করে। রাসূল (সাঃ)–এর নির্দেশ মতে। আত্মীয়–স্বজনের মধ্যে বন্টন করেন তখন এ বাগান তাঁর অংশে পড়ে।

যদিও ইফ্‌কের ঘটনায় হযরত হাস্‌সান (রাঃ)–এর পদস্খলন হয়েছিল এবং হযরত আয়েশা (রাঃ) তাতে প্রকৃতিগতভাবে দুঃখ পেয়েছিলেন। তবুও তিনি হযরত হাস্‌সান (রাঃ)–কে দণ্ড কার্যকর হওয়ায় পর ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। যদি কেউ তাঁর সামনে হযরত হাস্‌সান (রাঃ)–কে খারাপ বলতো তাহলে তিনি তাকে নিষেধ করতেন এবং বলতেন, সে রসূলুল্লাহ (সাঃ)–এর তরফ থেকে মুশরিকদের জবাব দিত।

প্রিয় নবী (সাঃ) হযরত হাস্‌সান (রাঃ) বিন সাবিতকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পন করেন। তিনি এ দায়িত্ব অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সুন্দর এবং আবেগ–উদ্দীপনার সাথে পালন করতেন। এ কারণে তিনি রাসূল (সাঃ)–এর প্রশংসার পাত্র হন। তিনি রাসূল (সাঃ)–এর নিকট অত্যন্ত মর্যাদাবানও ছিলেন। হুযুর (সাঃ)–এর নির্দেশে মসজিদে নববীতে তাঁর জন্য মিম্বার দাঁড় করানো হতো। এ মিম্বারে দাঁড়িয়ে অথবা বসে তিনি কাফিরদের অপবাদের জবাব দিতেন। আবার অনেক সময় প্রিয় নবী (সাঃ)–এর প্রশংসায় কবিতা পড়ে শুনাতেন। বিশ্বনবী (সাঃ) বলতেন, হাস্‌সান (রাঃ)–এর ব্যঙ্গ কবিতা অন্ধকারে তীরের মত কাফেরদের ওপর কার্যকর হতো। একবার হুযুর (সাঃ) হযরত হাস্‌সান (রাঃ)–কে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ 'হে হাস্‌সান! আমার তরফ থেকে জবাব দাও।' সে সাথে দোয়া করলেন–'হে আল্লাহ! পবিত্র আত্মার তরফ থেকে তাকে সাহায্য কর।'

আরেকবার ইরশাদ হলোঃ 'হে হাস্‌সান! মুশরিকদের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গাত্মক কবিতা পড়। জিবরাঈল ( আঃ ) তোমার সাথে রয়েছেন।'

বস্তুত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বহুবার হযরত হাস্‌সান (রাঃ)–এর কাব্যের প্রশংসা, দোয়া করেছেন এবং মুশরিক কবিদের অশ্লীল কথনের জবাব দানের নির্দেশ দিয়েছিলেন। প্রায় সকল যুদ্ধেই এবং গুরুত্বপূর্ণ সময়ে হযরত হাস্‌সান (রাঃ) হকপন্থীদের পক্ষে এবং মুশরিকদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত উদ্দীপনাময় কবিতা রচনা করেন। এ সকল কবিতা রাসূলুল্লা (সাঃ)–কে খুশী করতো এবং হকের শত্রুদের কলিজা ছিদ্র করে ছাড়তো। তিনি ফখর করে বলেছেনঃ

> "আমার জবান কর্তনকারী তরবারীর মত শক্তিশালী এবং এতে আয়েব বা দোষণীয় কিছু নেই। আমার কাব্য সমুদ্র এত স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার যে, তাতে কোন কিছু নিক্ষেপ করলে ময়লাযুক্ত হয় না। [ অর্থাৎ কোন সমালোচকের সমালোচনা তাতে কোন ত্রুটি খুঁজে পায় না।]"

www.amarboi.org

এক রাওয়ায়েতে আছে, একবার কোন মুশরিকের ব্যঙ্গের জবাবে তিনি এ কবিতা বলেনঃ

"তুমি মুহাম্মাদ (সাঃ)–কে গালাগাল করেছ। আমি তাঁর তরফ থেকে এর জবাব দিয়েছি এবং এর পুরস্কার আল্লাহর নিকট রয়েছে। এবং আমাদের মধ্যে আল্লাহর আমীন জিবরাইল আছেন। তাঁর আত্মা পবিত্র এবং তাঁর কোন সমকক্ষ নেই।"

প্রিয়নবী (সাঃ) এ কথা শুনে বললেনঃ 'জাযাকাল্লাহু আলাল্লাহিল জান্নাতা' [ হাঁ আল্লাহর নিকট তোমার পুরস্কার বেহেশ্‌ত ]।

প্রকৃতপক্ষে এ কবিতা সে কাসিদার অন্তর্ভুক্ত যা হযরত হাস্‌সান (রাঃ) মক্কা বিজয়ের মুহূর্তে বলেছিলেন। অন্য কোন সময়েও সম্ভবতঃ তিনি এ কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। বদর, ওহোদ এবং পরিখার যুদ্ধে তিনি অত্যন্ত তেজস্বী ভাষায় কবিতা রচনা করেন। এমনিভাবে ইসলামের মশহুর দুশমন ইহুদী কবি কা'ব বিন আশরাফ নিহত হলে তিনি অত্যন্ত আবেগময় ভবায় খুশী প্রকাশ করেছিলেন।

নবম হিজরীতে বনু তামিমের প্রতিনিধিদল মদীনা মুনাওয়ারা আগমন করে এবং মুসলমানদের সামনে নিজেদের অহমিকা প্রকাশ করে। তাদের কবি যবরকান (রাঃ) বিন বদর ( সে সময় পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেননি) নিজের কওমের প্রশংসায় স্বরচিত অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের কবিতা আবৃত্তি করেন।

প্রিয়নবী (সাঃ) হযরত হাস্‌সান (রাঃ)–কে নির্দেশ দিলেন যে, ওঠো এবং যবরকানের জবাব দাও। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে উপস্থিতভাবে এত উচ্চাঙ্গের কবিতা বললেন যে, বনু তামিম সর্দার আকরা (রাঃ) বিন হাবেস বলে উঠলেনঃ "মুহাম্মাদ–পিতার কসম! তোমাদের কবি আমাদের কবির চেয়ে ভালো।"

প্রিয় নবী (সাঃ) হযরত হাস্‌সান (রাঃ)–এর প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল ছিলেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির ( ৬ হিজরীর জেলকদ ) পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত হাতিব (রাঃ) বিন আবি বালতা'কে মিসরের গবর্ণর মাকুকাসের নিকট ইসলামের মুবাল্লিগ হিসেবে প্রেরণ করলেন। মাকুকাস ইসলাম গ্রহণ করেননি তবে হযরত হাতিব (রাঃ)–এর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। মিসর ত্যাগ করার প্রাক্কালে মাকুকাস প্রিয় নবী (সাঃ)–এর জন্য অনেক তোহফা এবং হাদিয়া তাঁর নিকট প্রদান করেন। এ তোহফার মধ্যে মারিয়া (রাঃ) এবং শিরিন (রাঃ) নাম্নী দু'জন কিবতী সহোদরা ছিলেন। দু'সহোদরা হযরত হাতিবের তাবলীগের ফলে ইসলাম গ্রহণ করেন। মদীনা প্রত্যাবর্তন করে হযরত হাতিব (রাঃ) তাদেরকে রাসূল (রাঃ)–এর খিদমতে পেশ করলেন। এ সময় হুযুর (সাঃ) হযরত

www.amarboi.org

মারিয়া (রাঃ)-কে নিজের গৃহে জায়গা দিলেন এবং হযরত শিরীন (রাঃ)-কে হযরত হাস্সান (রাঃ)-এর মালিকানায় অর্পণ করলেন। এভাবে হযরত হাস্সান (রাঃ) প্রিয় নবী (সাঃ)-এর শ্যালিকার স্বামী হয়ে গেলেন। হযরত শিরীন (রাঃ)-এর পেটে হযরত হাস্সান (রাঃ)-এর পুত্র আবদুর রহমান (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন। তিনিও একজন কবি হিসেবে স্বীকৃতি পান। আবদুর রহমান (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পুত্র হযরত ইবরাহিম (রাঃ)-এর আপন খালাত ভাই ছিলেন।

হযরত হাস্সান (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাতের পরও দীর্ঘদিন বেঁচে ছিলেন। এ সময়ে তিনি কখনো কখনো মসজিদে নববীতে বসে মানুষকে নিজের কবিতা শুনাতেন। একবার হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর শাসনামলে এমনিভাবে কবিতা পড়ছিলেন। আমিরুল মুমিনীন (রাঃ) তা দেখলেন, মসজিদে কবিতা পড়তে নিষেধ করলেন। হযরত হাস্সান (রাঃ) ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন, আপনার চেয়েও উত্তম ব্যক্তিত্বের সামনে মসজিদে নববীতে বসে কবিতা পাঠ করেছি। এ জন্যে আমাকে কেউ এ কাজ থেকে বিরত রাখতে পারবে না। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) তাঁর এ জবাব শুনে চুপ হয়ে গেলেন।

জাহেলী যুগের শেষ গাস্সানী শাসক জাবালা বিন আইহাম হযরত হাস্সান (রাঃ)-এর প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত ছিলেন। হযরত হাস্সান (রাঃ) তাঁর প্রশংসায় অত্যন্ত শক্তিশালী কাসিদাহ রচনা করতেন এবং তিনিও তাঁকে প্রচুর দক্ষিণা দিতেন। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর শাসনামলে জাবালা অত্যন্ত শান-শওকতের সাথে মদীনা আগমন করেন এবং আমিরুল মুমিনীনের হাতে ইসলামগ্রহণ করেন। কিন্তু বাদশাহীর ঠাট ও অহংকার তাঁর মনজ থেকে তখনও দূর হয়নি। কা'বা শরীফ তাওয়াফের সময় তাঁর জুব্বার ওপর এক বদ্দুর পা পড়ে। জাবালা অগ্নিশর্মা হয়ে তার মুখের ওপর এমন জোরে এক থাপ্পড় মারেন যে তাতে তার নাক জখম হয়ে যায়। বদ্দুটি এ ব্যাপারে খলিফার দরবারে অভিযোগ দায়ের করলো। আমিরুল মুমিনীন জাবালাকে নির্দেশ দিলেন, হয় বদ্দুকে সম্মত করাও, না হয় শরীয়ত মুতাবিক সে তোমার মুখের ওপর থাপ্পড় মেরে নিজের বদলা নেবে।

জাবালা এক রাতের সময় চাইলেন। আমিরুল মুমিনীন সময় মঞ্জুর করলেন। জাবালা সে রাতেই মদীনা মুনাওয়ারা থেকে পালিয়ে গেলেন এবং মুরতাদ হয়ে রোমের বাদশাহ হারকেলের নিকট কাসতানতুনিয়া চলে গেলেন। কিছু দিন পর হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) জাসামা বিন মাসাহিক কিনানীকে ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত পত্রসহ হারকেলের নিকট কাসতানতুনিয়া প্রেরণ করলেন। হারকেল ইসলামের দাওয়াত কবুল না করলেও কাসিদকে অত্যন্ত খাতির যত্ন করলো। জাসামা ফিরে আসছিলেন। এ সময় হারকেল

তাঁকে বললো তোমার একজন আরব ভাই এখানে আছে। তার নাম জাবালা বিন আইহাম। তার সাথে দেখা করে যাও। জাসামা তার সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। একজন বাদশাহর যে ঠাট-বাট তাই তিনি আবলোকন করলেন। জাবালা জাসামাকে খুব সম্মান ও তাজিম করলেন। তাঁর সামনে খাবার পেশ করলেন এবং কতিপয় অপ্সরা সদৃশ বাঁদীকে গান গেয়ে তাঁকে খুশী করার নির্দেশ দিলেন। তারা অত্যন্ত সুললিত কণ্ঠে বনু গাস্সানের প্রশস্তিমূলক একটি কাসিদাহ গাইলো। এ কাসিদাহর প্রথম চরণের অর্থ নিম্নরূপঃ

"কতই না ভালো ছিল সে সব লোক যাদের সাথে আমি বালাখানায় একত্রিত হয়েছিলাম।"

এ কবিতায় জাবালা এবং তার বংশের ইজ্জত ও উদার অন্তরের প্রশংসা করা হয়েছিল। কবিতা শুনে জাবালা অযাচিত ভাবে হাসতে শুরু করলেন এবং জাসামাকে জিজ্ঞেস করলেন 'এ কবিতা কার তা কি তুমি জানো?' তিনি বললেন 'না'। জাবালা বললেন, এটা হাস্সান বিন সাবিতের কবিতা। এরপর তাকে কাঁদিয়ে দেয়ার মত গান গাওয়ার জন্যে নির্দেশ দিলেন। তারা গাইলোঃ

"মায়ান নামক স্থানে তাবুকের সেদিকে এবং জামান উপত্যকায় এ গৃহ কার? যা বিরান হয়ে পড়ে রয়েছে।"

এটা কোন কবিতা ছিল না। বরং বনি গাস্সানের বাদশাহের বিরাট বালাখানার মর্সিয়া ছিল। এ মর্সিয়া শুনে জাবালার চক্ষু দিয়ে সমুদ্রের জলধারা নেমে এলো এবং জাসামাকে জিজ্ঞেস করলেন, জানো এ কবিতা কার? তিনি বললেন, না। জাবালা বললো, এটাও হাস্সান বিন সাবিতেরই কবিতা। অতপর তিনি হযরত হাস্সান (রাঃ) বিরচিত কতিপয় কবিতা নিজেই আবৃত্তি করলেন। এর মধ্যে একটি কবিতা নিম্নরূপঃ

"হায়! আমার মা যদি আমার জন্ম না দিত এবং হায়! ওমর (রাঃ) আমাকে যা বলেছিল তা যদি মেনে নিতাম।"

এ কবিতা থেকে অনুভব করা যায় যে, জাবালা মুরতাদ হওয়ার কারণে অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছিলেন। আলাপ-আলোচনার সময় তিনি অত্যন্ত আদব এবং তাজিমের সাথে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নাম উচ্চারণ করছিলেন। কিন্তু কাসতানতুনিয়ায় প্রাপ্ত আরাম-আয়েশ পরিত্যাগ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। এ জন্যে দ্বিতীয়বার তিনি আর ইসলাম গ্রহণ করতে পারেননি। কবিতা পাঠ করে তিনি কিছুক্ষণ বিষ্ণুণ রইলেন এবং জাসামাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হাস্সান (রাঃ) বিন সাবিত কি জীবিত আছেন?'

www.amarboi.org

জাসামা বললেন, 'হ্যাঁ', তিনি জীবিত আছেন। কিন্তু বৃদ্ধ ও অন্ধ হয়ে গেছেন।'

জাবালা তৎক্ষণাৎ পাঁচশ' দিনার এবং পাঁচ সেট রাজ পোশাক আনিয়ে তার হাওয়ালা করলেন এবং বললেন, হাসসানকে আমার সালাম বলবেন। আর এ দিনার ও পোশাক আমার তরফ থেকে তাকে দেবেন।

জাসামা মদিনা প্রত্যাবর্তন করে আমিরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর নিকট এ ঘটনা বিবৃত করলেন। হযরত ওমর (রাঃ) হযরত হাস্‌সান (রাঃ)-কে ডেকে পাঠালেন। তিনি এসে সালাম দিয়েই বললেন, 'আমিরুল মু'মিনীন! আমি এখানে আলে জাফনার রুহ সমূহের খোশবু উপলব্ধি করছি।'

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) বললেন, 'আল্লাহ সেই মাধ্যমে আপনাকে সাহায্য করেছেন।' অতপর তাঁকে জাবালা প্রেরিত দিনার ও পোশাক প্রত্যর্পন করলেন।

অপর এক রাওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, জাবালা হযরত হাস্‌সান (রাঃ)-এর জন্যে মূল্যবান একটি পোশাক এবং কয়েকটি উন্নত জাতের উট প্রেরণ করেছিলেন। তিনি জাসামাকে বলেছিলেন, মদীনায় পৌঁছেই হাস্‌সান (রাঃ)-কে জীবিত পেলে তাকে এ পোশাক এবং উট আমার তরফ থেকে উপঢৌকন হিসেবে দেবেন। আর যদি তিনি ওফাত পান তাহলে পোশাকটি তাঁর বাড়ী পৌঁছে দেবেন এবং উটগুলো তাঁর কবরে নিয়ে জবেহ করবেন ( আল্লাহই এ ব্যাপারে ভালো জানেন )।

হযরত হাস্‌সান (রাঃ) বিন সাবিত হযরত আমির মাবিয়ার খিলাফত কালে ৫৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। এ সময় তাঁর বয়স ছিল প্রায় ১২০বছর। মৃত্যুকালে একমাত্র সন্তান পুত্র আবদুর রহমানকে রেখে যান। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে কতিপয় হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে হযরত বারা বিন আযিব, হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়িব (রাঃ), হযরত উরওয়াহ বিন যোবায়ের (রাঃ), হযরত আবু সালমাহ বিন আবদুর রহমান (রাঃ) এবং হযরত খারেজাহ বিন যায়েদ বিন সাবিত এর নামবিশেষভাবেউল্লেখযোগ্য।

হযরত হাস্‌সান বিন সাবিত (রাঃ) আরবের সমকালীন প্রখ্যাত কবিদের অন্যতম ছিলেন। কেউ কেউ তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তবে এ পরিচিতি ছাড়াও তাঁর আর একটি পরিচয় ছিল। আর এ পরিচিতিই তাঁকে চিরকালের জন্যে সমুজ্জ্বল করে রেখেছে। তাঁর সবচেয়ে বড় গৌরবের ব্যাপারটি হল যে তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) -এর কবি ( শায়েরুন্নবী ) ছিলেন।

www.amarboi.org

শৈশবকাল থেকেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ)–এর মর্যাদার চিত্র হযরত হাস্‌সান (রাঃ)–এর অন্তরে অংকিত হয়েছিল। তিনি নিজেই বলেছেনঃ

"আমার বয়স তখন সাত–আট বছর হবে। একদিন খুব প্রত্যুষে এক ইহুদী মদীনার সব ইহুদীকে ডেকে একত্রিত করলো। সবাই যখন এসে উপস্থিত হলো তখন সে বললোঃ সেই সিতারাহ উদিত হয়েছে। সেই তারার উদয় স্থানে আজ রাতেই মুহাম্মাদ (সাঃ)–এর জন্ম হবে। [ এরপর যখন তিনি রাসূল হিসেবে প্রেরিত হলেন এবং মদীনা তাশরীফ আনলেন তখন সেই ইহুদী জীবিত ও উপস্থিত ছিল। কিন্তু সেই হতভাগা ঈমান আনেনি।]

সে দিন থেকেই হযরত হাস্‌সান (রাঃ) সর্বশেষ নবী (সাঃ)–এর দিদারের আকাংখা পোষণ করতে থাকেন। প্রিয় নবী (সাঃ)–এর মদীনা শুভাগমন ঘটলেই তিনি অত্যন্ত উৎসাহ–উদ্দীপনাসহ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ এবং বাইয়াতের সৌভাগ্য অর্জন করেন। এরপর তিনি নিজে সমগ্র কাব্যিক যোগ্যতা রাসূল (সাঃ)–এর প্রশস্তি এবং তাঁর সুরক্ষার লক্ষ্যে ওয়াকফ করে দেন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাপূর্ণ আবেগ দিয়ে হুযুর (সাঃ)–এর প্রশংসার হক আদায় করেন। তাঁর মত অন্য কোন কবির পক্ষেই এত সুউচ্চ কল্পনা রাজ্যে বিচরণ করা সম্ভব হয়নি। এ প্রসঙ্গে তাঁর দু'টি কবিতাঃ

"[ ইয়া রাসূলুল্লাহ] আপনার চেয়ে সুন্দর আমার চক্ষু অবশ্যই দেখেনি এবং কোন নারীই আপনার চেয়ে সুন্দর শিশু জন্ম দেয়নি।

আপনাকে ত্রুটিমুক্তভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। [ অর্থাৎ মনে হয় স্রষ্টা আপনাকে আপনার ইচ্ছা ও মর্জি হিসেবেই সৃষ্টি করেছেন।]"

হযরত হাস্‌সান (রাঃ)–এর রাসূল (সাঃ) প্রশস্তিমূলক কাসিদাহ এবং না'তের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, তা শুধু কল্পনামূলকই ছিল না। বরং তাঁর প্রতিটি কবিতাই অন্তর রসে জারি ছিল।

প্রিয় নবী (সাঃ)–এর শানে তিনি হাজার কবিতা রচনা করেছেন। কিন্তু কোন কবিতাতেই অবাস্তব কিছু বলেননি। কতিপয় পংক্তি এখানে উল্লেখ করা গেলঃ

"তিনি আল্লাহর নবী। নিরাশা ও নবী সমূহের অতীত হওয়ার পর যখন বিশ্বে মূর্তির পূজা চলছিল তখন আমাদের নিকট তাঁর শুভাগমন ঘটেছে।

www.amarboi.org

তিনি আমাদের জন্য প্রোজ্জ্বল প্রদীপ এবং পথ প্রদর্শক হয়ে গেলেন। তিনি এমন দীপ্তিমান ও প্রজ্জ্বলভাবে আবির্ভূত হলেন যেমন শান দেয়া হিন্দী তরবারী চমক মারে।

তিনি আমাদেরকে জাহান্নামের আগুনের ভয় দেখিয়েছেন এবং বেহেশ্‌তের সুসংবাদ শুনিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে ইসলামের শিক্ষা দিয়েছেন। যে জন্য আমরা আল্লাহর শুকরিয়া জাপন করি।"

নবী (সাঃ)–এর হিজরত প্রসঙ্গে তিনি মক্কাবাসীদের দুর্ভাগ্য এবং মদীনাবাসীর সৌভাগ্য সম্পর্কে মনোভাব ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেনঃ

"নিঃসন্দেহে সে জাতি হতাশ হয়েছে যাদের কাছ থেকে তাদের নবী চলে গেছেন এবং তারা মর্যাদা লাভ করেছেন যাদের কাছে গিয়ে তিনি উপস্থিত হয়েছেন ও তারা শুভ সকাল লাভ করেছে।

যে জাতির কাছ থেকে তার পয়গাম্বর চলে গেছেন সে জাতির জ্ঞানও লুপ্ত হচ্ছে এবং যাদের কাছে উপস্থিত হয়ে অবস্থান নিয়েছেন তাদেরকে তিনি নিজের আলোয় আলোকিত করেছেন।

মদীনাবাসীর রব গুমরাহীর পর তাদেরকে হেদায়াতের সৌভাগ্য দান করেছেন এবং সরল পথ দেখিয়েছেন। যে হকের অনুসরণ করে সে হেদায়াত পায়।"

আলোচিত কয়েকটি কবিতার পঙ্‌ক্তির মাধ্যমেই হযরত হাস্‌সান (রাঃ)–এর রাসূল (সাঃ) প্রেমের গভীরতা সম্পর্কে অনুমান করা যায়। এ ধরনের হাজার হাজার পংক্তিমালা তাঁর দিওয়ানের স্থানে স্থানে হীরা–মানিক্যের মত জ্বলজ্বল করছে।

হযরত হাস্‌সান (রাঃ) বিন সাবিত রাসূল (সাঃ)–এর প্রশস্তিমূলক কবিতার সাথে সাথে কাফেরদের বিরুদ্ধে অসংখ্য ব্যঙ্গাত্মক কবিতাও রচনা করেছেন। তিনি অত্যন্ত উৎসাহ–উদ্দীপনার সাথে প্রিয় নবী (সাঃ) এবং তাঁর অনুসরণকারীদের বিরোধিতাকারীদেরকে একদিকে কবিতার মাধ্যমে বাধা দিয়েছেন। অন্যদিকে মুশরিকদের জবাব এমন শক্তিশালী ব্যঙ্গাত্মক কবিতার মাধ্যমে প্রদান করেছেন যাতে তারা নীরব হয়ে যেতে বাধ্য হয়। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)–এর দু'জন জীবন উৎসর্গকারী সাহাবী হযরত আবদুল্লা (রাঃ) বিন রাওয়াহা এবং হযরত কা'ব (রাঃ) বিন মালিক আনসারীও মুশরিক কবিদের বিদ্রূপের জবাব অত্যন্ত জোরালো ভাষাতেই প্রদান করেছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে হযরত হাস্‌সান (রাঃ)–এর ভূমিকা ছিল সবার উর্ধে। এক

www.amarboi.org

রাওয়ায়েতে আছে, কুরাইশ কবিদের বিদ্রূপের জবাব দানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে নবী করিম (সাঃ) হযরত কা'ব (রাঃ) বিন মালিককে এ কাজের জন্যে বলে পাঠালেন। তিনি নির্দেশ পালন করলেন। কিন্তু নবী করিম (সাঃ) তাঁর জবাবী বিদ্রূপ পসন্দ করলেন না। অতপর তিনি হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন রাওয়াহাকে এ কাজের নির্দেশ দিলেন। তিনিও তা করলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)–এর তাও পছন্দ হলো না। এরপর তিনি হযরত হাস্সান (রাঃ)–কে কুরাইশদের বিদ্রূপের জবাব দিতে বললেন। রাসূল (সাঃ)–এর নির্দেশ শুনে তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠলেনঃ

"সময় এসেছে সেই বাঘকে আহবান জানানোর যে লেজ নাড়ছে।"

অতপর তিনি দৃঢ় আস্থার সাথে বললেনঃ আমার ভাষা দিয়ে তাদেরকে ঠিক করে দেব ( অথবা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে ফেলবো )। প্রকৃতপক্ষে যা তিনি বলেছিলেন, তা তিনি দেখিয়েছেন। [ মুসনাদে আহমদ ]

হুযুর (সাঃ) মুশরিক কবি গোষ্ঠীর মোকাবিলা এবং সাহাবী (রাঃ)–দের সুরক্ষার কাজে হযরত হাস্সান (রাঃ)–কে নিয়োজিত করেছিলেন। এ প্রশ্নে তিনি হযরত আবু বকর (রাঃ)–এর সাথে তাঁকে পরামর্শ করে নেয়ারও হেদায়াত দিয়েছিলেন। কেননা হযরত আবু বকর (রাঃ) আরব জনগণ সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিফহাল ছিলেন। বস্তুত হযরত হাস্সান (রাঃ) প্রায়ই হযরত আবু বকর (রাঃ–এর খিদমতে উপস্থিত হতেন এবং নসবনামা সম্পর্কে তাঁর কাছ থেকে তথ্য লাভ করতেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁকে বলতেন, ব্যঙ্গ বা বিদ্রূপের সময় অমুক অমুক মহিলাকে ছেড়ে কথা বলবে। কেননা তারা রাসূল (সাঃ)–এর দাদী। হযরত হাস্সান (রাঃ) তাঁর নির্দেশ অনুযায়ীই কাজ করতেন। তিনি নিজের কবিতায় কুরাইশ মুশরিকদের ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানতেন। কিন্তু তাতে হুযুর (সাঃ) এবং কুরাইশ বংশের সাথে সম্পর্কযুক্ত সাহাবী (রাঃ)–দের গায়ে কোন আঁচড় লাগতোনা।

আবু লাহাব প্রিয় নবী (সাঃ)–এর চাচা। কিন্তু ইসলামের ঘোরতর শত্রু ছিল। হযরত হাস্সান (রাঃ) তার প্রতি এ ভাষায় ব্যঙ্গ করেছেনঃ

"আবু লাহাবকে জানিয়ে দাও, মুহাম্মাদ (সাঃ) নবুয়াতের দায়িত্ব আঞ্জাম দানের জন্যে অবশ্যই উঁচু মর্যাদায় আসীন হবেন। এ কথা তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গেলেও কিছু আসে যায় না।

বনি হাসিম সম্মান ও উঁচু মর্যাদায় আসীন হয়েছে। কিন্তু তোমাকে তিরস্কারের দুঃখ বেদনায় জর্জরিত করে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।"



www.amarboi.org

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)–এর চাচাত ভাই আবু সুফিয়ান বিন হারিছ ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ইসলামের একজন কট্টর দুশমন ছিলেন। তিনি হুযুর (সাঃ)–কে ব্যঙ্গ–বিদ্রূপ করতেও কসুর করেননি। হযরত হাস্‌সান (রাঃ) তাঁর শোধ এভাবে নিয়েছেনঃ

"তোমার জীবনের কসম। কুরাইশের সাথে তোমার আত্মীয়তা এমন যেমন উট শাবকের সম্পর্ক উটপাখীর বাচ্চার সাথে হয়ে থাকে।

যে কওমের তুমি নও তাদের নিয়ে গর্ব করো না। তুমিতো খবিস বনি হিসামের মতও নও।"

কুরাইশ সরদারদের মধ্যে ইসলাম বিরোধিতায় আবু জেহেল সকলের অগ্রগামী ছিল। বদরের যুদ্ধে মক্কার কাফেরদেরকে সেই টেনে এনেছিল। হযরত হাস্‌সান (রাঃ) তাকে এ ভাবে তিরস্কৃত করেনঃ

"অবশ্যই আল্লাহপাক সে দলের ওপর অভিসম্পাত বর্ষণ করেছেন যারা বাহাদুরীর মিথ্যা দাবীদার ছিল এবং মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে ডেকে এনেছিল।

সে খবিস এবং অভিশপ্ত। যে ব্যক্তি সত্যপথের হেদায়াত প্রাপ্ত হয় তাকে সব সময়ই বড় মনে করা হয়। অথচ সে তাকে ভৎর্সনা করে।

সে লোকদেরকে গুমরাহির দিকে উদ্বুদ্ধ করে। এমনকি তার চারপাশে মানুষ একত্রিত হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে তার নির্দেশ হেদায়াত না করে পথভ্রষ্ট করে।

আল্লাহপাক নবী করিম (সাঃ)–এর সাহায্যের জন্যে নিজের বাহিনী প্রেরণ করেছেন এবং সব যুদ্ধেই তিনি তাঁকে সাহায্য ও বিজয় দান করেছেন।

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আবদুল্লাহ বিন যিবা'রা কুরাইশের নেতৃস্থানীয় কবি ছিল। ঘটনাক্রমে মুসলমানদেরকে ওহোদের যুদ্ধে প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। ইবনে যিবা'রা একে মুশরিকদের বিজয় বলে অভিহিত করলো এবং কতিপয় অহমিকাপূর্ণ কবিতা বলে ফেললো। হযরত হাস্‌সান (রাঃ)–কে সম্বোধন করে হক পন্থীদেরকে তিরস্কার ও গালাগালি দিল তাতে। হযরত হাস্‌সান (রাঃ) এর দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিলেন। ওহোদ যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থা বিশ্লেষণ করলেন এবং সাথে সাথে বদরের যুদ্ধে কাফেরদের লজ্জাজনক পরাজয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ইবনে যিবা'রাকে তিরস্কার করলেনঃ

www.amarboi.org

"ইবনি যিবা'রা এ লড়াইয়ের [ওহোদ] অবস্থা খুব ভালভাবেই জানে। যদি সে ইনসাফ করে তাহলে ফযিলত আমাদের জন্যেই।

অবশ্যই তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে এবং আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে খুব প্রতিশোধ নিয়েছি। কখনো কখনো যুদ্ধে এ ধরনের উলট পালট হয়েই থাকে। যখন আমরা (বদরের যুদ্ধে) কঠিনভাবে হামলা করলাম, তখন আমরা তোমাদের পাহাড়ের নিম্নভূমিতে ঠেলে দিলাম।

একই স্থানে আমরা তোমাদের ৭০ জনকে লুটিয়ে ফেললাম। এ কথা বিন্দুমাত্রও মিথ্যা নয়।

তোমাদের অনেক লোককে আমরা কয়েদ করলাম এবং পরাজিত হয়ে জল কুক্কুটের মত পালিয়ে গেলে। আমরা তোমাদের প্রত্যেক সরদারকে কতল করলাম এবং প্রতিটি মর্যাদাবান বাহাদুরকে মেরে ফেললাম।

আমরা নই, তোমরাই লেজ গুটিয়ে পালিয়েছ। যুদ্ধ যখন তুঙ্গে আমরা তখন ময়দানে থাকি।"

উবাই বিন খালফ একজন কুচক্রী মুশরিক ছিল। একবার (হিজরতের পূর্বে) একটি পচা হাড়সহ রাসূল (সাঃ)-এর নিকট এলো এবং বলতে লাগলো, তুমি বল, আল্লাহ মৃতকে জীবিত করবে? বল, এ হাড় কে জীবিত করতে পারে? হযরত হাস্সান (রাঃ) এ ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে উবাই বিন খালফ, উতবাই বিন রবিয়াহ, শাইবা বিন রবিয়াহ এবং আবু জেহেলের তিরস্কার এভাবে করেছেনঃ

"অবশ্যই উবাই নিজের পিতার গুমরাহীর উয়ারিশ হয়েছে। যখন সে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর থেকে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করে। মুহাম্মাদকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্যে তুমি তার নিকট পচা হাড় সহ এসেছো? প্রকৃতপক্ষে তুমি নিজেই এর তাৎপর্য বুঝতে অক্ষম।

আবু জেহেলের আনুগত্য করে রবিয়ার পুত্রদ্বয় ধ্বংস হয়ে গেছে। তাদের মা তাদের জন্যে ক্রন্দন করে।"

একবার আরবের এক গোত্রের সরদার হারিছ বিন আওফ রাসূল (রাঃ)-এর দরবারে এসে হাজির হলো এবং নিবেদন করে বললো, কাউকে আমার সাথে দিন, যে আমার গোত্রকে দ্বীনের তা'লিম দেবে। আমি তার রক্ষার দায়িত্ব নিলাম। হুযুর (সাঃ)

www.amarboi.org

একজন আনসার সাহাবীকে তার সাথে দিলেন। তাকে সাথে নিয়ে হারিছ নিজের কওমের কাছে গেল। কিন্তু তার কওম বিশ্বাসঘাতকতা করলো এবং আনসার সাহাবী (রাঃ)–কে শহীদ করে ফেললো। কিছুদিন পর হারিছ বিন আওফ নিজের গোত্রের বিশ্বাসঘাতকতায় দুঃখ প্রকাশের জন্যে হুযুর (সাঃ)–এর খিদমতে হাজির হলো। এ হৃদয় বিদারক কাহিনী শুনে রাসূল (সাঃ) খুব ব্যথিত হলেন। তবে হারিছের সুমিষ্ট ক্ষমা প্রার্থনা দেখে ভদ্রতার খাতিরে চুপ করে থাকলেন। এ সময় হযরত হাস্সান (রাঃ) হারিছ ও তার গোত্রের বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কিত দু'টি কবিতা বলেন। কবিতা দু'টি শুনে হারিছ খুব পেরেশান এবং ভীত হয়ে রাসূল (সাঃ) নিকট আরজ করলেনঃ "হে মুহাম্মাদ (সাঃ)! আমি এ ব্যক্তির [হাস্সান] বিদ্রূপ থেকে বাঁচার জন্যে আপনার নিকট আশ্রয় চাই। তিনি সে ব্যক্তি, নিজের তিক্ত ভাষা যদি সমুদ্রে মিশিয়ে দেন তাহলে আল্লাহর কসম সমুদ্রের সমুদয় পানি তেতো হয়ে যাবে।"

সংক্ষেপে কথা হলো, হযরত হাস্সান (রাঃ) বিন সাবিত শক্তিশালী কবিতার মাধ্যমে হকের শত্রুদের মুখ বন্ধ করেছিলেন এবং হক পন্থীদেরকে করেছিলেন আনন্দিত। ফলে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেলেন।

-০-

www.amarboi.org

# হযরত আবু মাসউদ বদরী আনসারী (রাঃ)

রাসূল (সাঃ)–এর মাদানী যুগের একটি ঘটনা। একদিন এক সাহাবী (রাঃ) নিজের গোলামের আচরণে ক্রোধান্বিত হলেন এবং বেত দিয়ে পিটানো শুরু করলেন। ইত্যবসরে পিছনে অনেক দূর থেকে এক আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি সে কণ্ঠস্বর চিনতে পারলেন না। যখন সে আওয়াজ নিকটবর্তী হলো তখন দেখলেন যে, স্বয়ং রাসূলে করিম (সাঃ) আওয়াজ দিচ্ছেন। তিনি (সাঃ) তাঁকে সম্বোধন করে বললেনঃ "তুমি যেভাবে আল্লাহর অধীনস্ত তেমন এ গোলাম তোমার অধীনস্ত নয়। অথবা তিনি বলেছিলেন যে, যে আল্লাহ তোমাকে এ গোলামের ওপর শক্তিশালী করেছেন সেই আল্লাহ তাকেও তোমার ওপর শক্তিশালী করতে পারেন।"

রহমতে আলম (সাঃ)–এর ইরশাদ শ্রবণ করে সে সাহাবীর হাত থেকে বেত পড়ে গেল এবং তিনি লজ্জিত কণ্ঠে আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)। আমি ভবিষ্যতে কখনো কোন গোলামকে আর মারবো না। এবং এ গোলামকে আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য আজাদ করে দিচ্ছি।"

সৃষ্টির সেরা প্রিয় নবী (সাঃ)–এর প্রতি এ সাহাবীর কি ধরনের অগাধ ভক্তি ছিল তা এ ঘটনা থেকেই আন্দাজ করা যায়। কারণ রাসূল (সাঃ)–এর ভক্তি ইঙ্গিত পেতেই তিনি সারা জীবনের জন্য কোন গোলামের ওপর হাত ওঠানো থেকে তওবাহ করেছিলেন এবং যে গোলামের ওপর হাত তুলেছিলেন, তাকে তৎক্ষণাৎ আজাদ করে দিয়েছিলেন। আলোচ্য এ সাহাবীর নাম ছিল হযরত আবু মাসউদ বদরী আনসারী (রাঃ)।

হযরত আবু মাসউদ বদরী আনসারী (রাঃ) জালিলুল কদর সাহাবী (রাঃ)–এর মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। তার নাম ছিল উকবাহ। কিন্তু তিনি আবু মাসউদ কুনিয়তেই বেশী প্রসিদ্ধ ছিলেন। খাযরাজ গোত্রের বনু হারেছ বংশের সাথে তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন। বংশধারা নিম্নরূপ ঃ

www.amarboi.org

উকবাহ বিন আমর ছা'লাবাহ বিন আছির বিন আছিরাহ বিন আতিয়াহ বিন খাদারাহ বিন আওক বিন হারেছ বিন খাযরাজ।

কোন কোন মতে বদরী উপাধির কারণ হলো, তিনি বদরে অবস্থান করতেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, তিনি বদরী সাহাবী ছিলেন। আল্লাহ পাক হযরত আবু মাসউদ (রাঃ)-কে সুন্দর মজাব দান করেছিলেন। নবী (সাঃ)-এর হিজরতের দু'এক বছর পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। আবার নবুয়াত প্রাপ্তির ১৩ বছর পর তিনি মক্কা গিয়ে বাইয়াতে উকবায়ে কবিরাতে অংশ গ্রহণের মহান সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। এ সময় রাসূল (সাঃ)-এর হাতে বাইয়াতকারী সাহাবী (রাঃ)-দের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্ব কনিষ্ঠ।

হিজরতের পর যুদ্ধ সমূহ শুরু হলো। হযরত আবু মাসউদ (রাঃ) সর্ব প্রথম বদরের যুদ্ধে অংশ নেন। ইমাম ইবনে ইসহাক (রঃ), হাফিজ ইবনে আবদুল বার (রঃ) এবং অন্য কতিপয় চরিতকার ও যুদ্ধ ইতিহাস লিখকের মতে তিনি বদরের যুদ্ধে অংশ নেননি। কিন্তু ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) দৃঢ়মত প্রকাশ করে বলেছেন যে, তিনি বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। সহিহ বুখারীতে বর্ণিত অসংখ্য হাদীসের উদ্বৃতি দিয়ে ইমাম বুখারী প্রমাণ করেছেন যে, তিনি বদরের যুদ্ধে অংশ নেন। তিনি যদি বদরের যুদ্ধে অংশ না নিয়ে থাকেন তাহলেও তাঁর মর্যাদা খাটো হওয়ার কোন কারণ নেই। কেননা আকাবাহতে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের মর্যাদা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সেসব সাহাবীর চেয়ে বেশী যারা বাইয়াতে আকাবাহতে শরীক হননি।

ওহোদ এবং পরবর্তী সকল যুদ্ধে হযরত আবু মাসউদ (রাঃ)-এর অংশ গ্রহণ সম্পর্কে সকল চরিতকার এবং ঐতিহাসিক ঐকমত্য পোষণ করেন। সম্ভবতঃ তিনি সেসব সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত যাঁরা রাসূল (সাঃ)-এর যুগে সকল যুদ্ধে প্রিয় নবী (সাঃ)-এর সহগামী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর হযরত আবু মাসউদ (রাঃ) হযরত ওসমান জুনুরাইন (রাঃ)-এর খিলাফতের শেষ অবধি মদীনা মুনাওয়ারাতে অবস্থান করেছিলেন। অবশ্য এ সময় তিনি কিছুদিন বদরে কাটান। তৃতীয় খলিফা (রাঃ)-এর খিলাফতের শেষ দিকে তিনি কুফা চলে যান। এক বর্ণনা অনুযায়ী তিনি সেখানে বাড়ী তৈরী করেছিলেন।

www.amarboi.org

সহিহ বুখারীর এক বর্ণনায় জানা যায় যে, হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু খলিফার আসনে সমাসীন হলে উম্মুল মু'মিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) ওসমান (রাঃ)–এর খুনের বদলা নেয়ার জন্য সংশোধনের ঝাণ্ডা তুলে ধরার সময় হযরত আবু মাসউদ (রাঃ) কুফায় ছিলেন। উটের যুদ্ধের পূর্বে হযরত হাসান (রাঃ) এবং হযরত আম্মার বিন ইয়াছির (রাঃ) কুফা গমন করেন। সেখানকার লোকজন যাতে হযরত আলী (রাঃ)–কে সাহায্য করে এ জন্যেই তাঁরা গিয়েছিলেন। সেসময় হযরত আবু মূসা আশয়ারী কুফার গবর্ণর ছিলেন। হযরত আবু মাসউদ (রাঃ) তাঁকে সাথে নিয়ে হযরত আম্মার বিন ইয়াছিয়া (রাঃ)–এর নিকট গেলেন এবং বললেনঃ "হে আবুল ইয়াকজান! আপনার সঙ্গীদের এমন কেউ নেই, যাকে আমি ভালো মন্দ বলতে না পারি। কিন্তু আপনি তার ব্যতিক্রম। যখন থেকে আপনি রাসূল (সাঃ)–এর সাহচর্য গ্রহণ করেছেন তখন থেকে আমি আপনার মধ্যে দোষের কিছু দেখিনি। অবশ্য এ ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করা অর্থাৎ হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহ (রাঃ)–এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রস্তুতি গ্রহণ দোষণীয়।"

হযরত আম্মার (রাঃ) বিন ইয়াছির (রাঃ) জবাবে বললেনঃ "হে আবু মাসউদ! আমি ও আপনি এবং আপনার এ সাথীর (হযরত আবু মূসা আশয়ারী) মধ্যে রাসূল (সাঃ)–এর সাথীত্ব গ্রহণের পর দোষণীয় কিছু দেখিনি। অবশ্য এ ব্যাপারে দেরী করা অর্থাৎ হযরত আলী (রাঃ)–এর সাহায্যে দেরী করা দোষণীয় ব্যাপার।"

আলোচনা এখানেই শেষ করে হযরত আবু মাসউদ (রাঃ) হযরত আম্মার বিন ইয়াছির ও হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রাঃ)–কে জুময়ার নামায আদায়ের কথা বলে বিদায় করে দিলেন।

এ ঘটনার কিছু দিন পর দুঃখজনক উটের যুদ্ধ সংঘটিত হলো। হযরত আবু মাসউদ (রাঃ) কি এ যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন? ইতিহাস এবং চরিতগ্রন্থগুলো এ ব্যাপারে নীরব। কিয়াস হলো যে, তিনি এ যুদ্ধে অংশ নেননি। অবশ্য যখন হযরত আলী (রাঃ) এবং আমীর মাবিয়া (রাঃ)–এর মধ্যে বিরোধ তুঙ্গে উঠলো তখন আবু মাসউদ (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)–কে জোরেশোরে সমর্থন দিলেন। হযরত আলী (রাঃ) তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করতেন এবং বিশ্বস্ত মনে করতেন। সিফফিনের যুদ্ধে অংশ নেয়ার জন্য কুফা থেকে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে তিনি হযরত আবু মাসউদ (রাঃ)–কে স্থলাভিষিক্ত করে যান। হযরত আলী (রাঃ)–এর অনুপস্থিতিতে তিনি কুফার ইমামতের দায়িত্ব সুন্দরভাবে আঞ্জাম দেন। হযরত আলী (রাঃ)–এর প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল অত্যন্ত গভীর। এ কারণেই তিনি নিজের কন্যাকে সাইয়েদেনা হযরত হোসাইন (রাঃ) বিন আলী (রাঃ)–এর সাথে

www.amarboi.org

বিয়ে দিয়েছিলেন। হযরত হোসাইন (রাঃ)-এর এক পুত্র যায়েদ তাঁরই কন্যার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন।

সিফফিনের যুদ্ধের পর হযরত আবু মাসউদ (রাঃ)-এর অন্তরে মদীনার প্রতি আকর্ষণ এবং টান এত বৃদ্ধি পায় যে, তিনি কুফা ত্যাগ করে পুনরায় মদীনা মুনাওয়ারাহ গমন করেন এবং সেখানেই জীবনের বেশীর ভাগ সময় কাটান। অবশ্য মাঝে মধ্যে কুফা আসতেন।

হযরত আবু মাসউদ (রাঃ) আমীর মাবিয়াহ (রাঃ)-এর শাসনকালে ৪১ থেকে ৫০ হিজরীর মধ্যে কোন এক সময় ইন্তেকাল করেন। কতিপয় বর্ণনায় আছে যে, তিনি আমীর মাবিয়া (রাঃ)-এর শাসনকালের শেষ পর্যন্ত (৬০ হিজরী) জীবিত ছিলেন। তবে হযরত মুগিরাহ (রাঃ) বিন শু'বার কূফায় ইমামতকালে তিনি ওফাত পান। এ মতই শক্তিশালী মত বলে ধারণা করা হয়। কালটি ছিল ৪১ থেকে ৫০ হিজরীর মধ্যে।

হযরত আবু মাসউদ (রাঃ)-এর এক পুত্র এবং কন্যা ছিল বলে জানা যায়। কন্যা হযরত হোসাইন (রাঃ)-এর স্ত্রী ছিলেন। এ সম্পর্কের ভিত্তিতে হযরত হোসাইন (রাঃ) হযরত আবু মাসউদ (রাঃ)-এর জামাতা হন এবং হযরত আলী (রাঃ) হন বেয়াই। পুত্রের নাম ছিল বশির। তিনি রাসূল (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় অথবা তাঁর ওফাতের কিছু দিন পর জন্মগ্রহণ করেন।

জ্ঞান ও ফজিলতের দিক দিয়ে হযরত অবু মাসউদ (রাঃ) উঁচু মর্যাদায় সমাসীন ছিলেণ। তিনি হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী (রাঃ)-দের তৃতীয় পর্যায়ভূক্ত হিসেবে পরিগণিত। তিনি ১০২টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তিনি অত্যন্ত হক কথা বলতেন। একবার কূফার গবর্ণর হযরত মুগিরাহ (রাঃ) বিন শু'বা আছরের নামায দেরী করে ফেললেন। হযরত আবু মাসউদ (রাঃ) সে সময় কূফায় ছিলেন। তিনি তাঁকে প্রকাশ্যে সমালোচনা করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যেভাবে পড়তেন তেমনি সঠিক সময়ে নামায পড়া উচিত। জিবরাইল (আঃ) রাসূল (সাঃ)-কে যে সময়ে নামায পড়তে বলতেন সে সময়েই তিনি নামাযের সময় নির্ধারণ করেছিলেন।

www.amarboi.org

হযরত আবু মাসউদ (রাঃ) অত্যন্ত আন্তরিকতা এবং আগ্রহের সাথে রাসূল (সাঃ)–এর হাদীসসমূহ শোনাতেন এবং লোকদেরকে নবী (সাঃ)–এর সুন্নাতের ওপর আমল করার নির্দেশ দিতেন। একবার তিনি দেখলেন যে, লোকজন জামায়াতের সময় মিলেমিশে দাঁড়ানোর তেমন আর খেয়াল করছে না। এতে তিনি বললেন, যতদিন তোমরা হুযুর (সাঃ)–এর সুন্নাত অনুযায়ী মিলেমিশে দাঁড়াতে ততদিন তেমাদের মধ্যে ঐক্য ছিল। এখন সে সুন্নাত পালন ছেড়ে দিয়েছ বলে তোমাদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি হয়েছে।

একদিন লোকদেরকে বললেন, তোমরা কি জান রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কিভাবে নামায আদায় করতেন? অতপর নিজে নামায পড়িয়ে বলে দিলেন যে, এটি ছিল রাসূল (সাঃ)–এর নামায পড়ানোর পদ্ধতি।

কোন কাজে তড়িঘড়ি করা তিনি পছন্দ করতেন না এবং লোকদেরকেও এটা করা থেকে বিরত থাকতে বলতেন। মুসনাদে আবু দাউদে উল্লেখ আছে যে, একবার তিনি কিছু লোকজনসহ বসেছিলেন। এমন সময় দু'ব্যক্তি এসে বললো, এখানকার কোন ব্যক্তি কি আমাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিতে পারে? সেখানে বসা জনৈক ব্যক্তি বললো, "আমি সিদ্ধান্ত দিতে পারি।" এতে হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রাঃ) মুঠিভরে পাথর উঠিয়ে তার প্রতি নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন, "চুপ, তাড়াতাড়ি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা মাকরূহ।"

* * *

www.amarboi.org

# হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন উনাইস জুহানি

হিজরাতের পর বিশ্বনেতা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সাঃ) মদীনায় শুভ পদার্পণ করলেন। এতে শুধু মদীনাতেই নয়, বরং মদীনার উপকণ্ঠের এলাকাসমূহেও অত্যন্ত দ্রুততার সাথে ইসলামের বিস্তৃতি ঘটতে লাগলো। ইসলামের এ প্রসারে ইহুদী এবং মুশরিকদের বুকের ওপরে যেন সাপ দৌড়াতে লাগলো। তারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে নিত্যনতুন পরিকল্পনা তৈরী করলো। তারা শুধু লোকদেরকে হক দ্বীন কবুল থেকেই বিরত রাখতো না বরং হুযুর (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে নানা ধরনের কুৎসা রটনা করে বেড়াত। বনু হাযিলের খালিদ বিন নবিহ নামক এক ব্যক্তি এ ধরনের হকের দুশমন ছিল। সে ছিল বিশাল বপুর এক ভয়ংকর আকৃতির মানুষ। আর হকের বিরোধিতা করাই ছিল তার একমাত্র কাজ। প্রিয় নবী (সাঃ)-এর নিকট অব্যাহতভাবে তার অপকর্মের কথা পৌঁছতে লাগলো। একদিন তিনি সাহাবায়ে কিরামের (রাঃ)-এর একটি দলের সামনে বললেন ঃ "খালিদ বিন নবিহকে খতম করবে?"

সাথে সাথে একজন সাহাবী উঠে দাঁড়ালেন। আবিদ হওয়ার কারণে তাঁর চেহারায় আলোর বিচ্ছুরণ ঘটছিলো। তিনি দাঁড়িয়ে আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল। আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। এ কাজ আমার ওপর সোপর্দ করুন এবং সে ব্যক্তির কিছু চিহ্ন বলে দিন।"

প্রিয় নবী (সাঃ) বললেন ঃ "তার চিহ্ন হলো, তাকে যে দেখে সেই ভয় পায়।"

তিনি আরজ করলেন ঃ "হে আল্লার রাসূল ! আমি তো কখনো কাউকে ভয় করিনি।"

অতপর তিনি খালিদ বিন নবিহ'র বাসস্থানের দিকে রওয়ানা হলেন। তার বাসস্থান ছিল আরফাতে। সেখানে পৌঁছে খালিদকে তেমনি পেলেন যেভাবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বর্ণনা করেছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন সাহসী মানুষ। তার

www.amarboi.org

সাথে দু'চারটি কথা বলে তরবারী বের করে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং মুহূর্তের মধ্যে ধর থেকে মাথা খণ্ডিত করে ফেললেন। ফিরে এসে রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে আরজ করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি আল্লাহর সেই দুশমনকে যমালয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি।"

এ খবর শুনে রাসূল (সাঃ) খুব খুশী হলেন এবং তিনি তাঁকে নিজের লাঠি দান করে বললেনঃ "এ লাঠিতে হেলান দিও। যাতে তুমি কিয়ামতের দিন এ লাঠিসহ আমার সাথে সাক্ষাত করতে পার।"

রাসূল (সাঃ)-এর এ সাহবী যিনি নিজের জীবন বাজী রেখে হকের এক ভয়ংকর শত্রুকে জাহান্নামে পাঠিয়েছিলেন এবং এ সাহসিকতাপূর্ণ কাজের জন্য প্রিয় নবী (সাঃ) যাঁকে নিজের পবিত্র লাঠি প্রদান করেছিলন তিনি ছিলেন, হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন উনাইস জুহান্নি।

সাইয়েদেনা হযরত আবু ইয়াহিয়া আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন উনাইস মর্যাদাপূর্ণ সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি কাজায়া কবিলার সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। বংশনামা হলোঃ আবদুল্লাহ বিন উনাইস বিন আসয়াদ বিন হারাম বিন হাবিব বিন মালিক বিন গানাম বিন কা'ব বিন তাইম বিন নাফাছাহ বিন ইয়াস বিন ইয়ারবু বিন বারক বিন দুবরাহ।

বারক বিন দুবরাহ'র সন্তান-সন্ততি জাহিনাহ কবিলার সাথে সংযুক্ত হয়ে গিয়েছিল। লোকজন তাকে জুহান্নাম বলে অভিহিত করতো। হযরত আবদুল্লাহ বিন উনাইস (রাঃ)-এর বংশে খাযরাজের বনু সালমাইর মিত্র। এজন্য তাদেরকে আনসারীও বলা হয়।

বাইয়াতে আকাবায়ে কবিরার পূর্বেই হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন উনাইস ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। অতপর তিনি মদীনার ৭৪ জন হকপন্থীর সাথে মক্কা গমন করেন এবং প্রিয় নবী (সাঃ)-এর হাতে বাইয়াত করেন ও তাঁকে মদীনা গমনের দাওয়াত দেন। এভাবে তিনি আকাবার সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত হন। তাদের মর্যাদা আনসারী বদরী সাহাবীদের থেকেও বেশী।

www.amarboi.org

দ্বিতীয় আকাবার বাইয়াতের পর হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন উনাইস মক্কাতেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং পুনরায় মক্কী সাহাবীদের সাথে মদীনা হিযরত করেন। এ জন্য তাঁকে মুহাজিরী আনসারী বলা হয়। মদীনা পৌঁছে তাঁর ঈমানী আবেগ এ পর্যায়ে পৌঁছে যে, হযরত মায়াজ বিন জাবাল (রাঃ) এবং অন্যান্য যুবকের সাথে মিলে বনু সালমার প্রতিটি ঘরে যেতেন ও সেখানে অবস্থিত মূর্তি ভেঙ্গে বাইরে নিক্ষেপ করতেন। বনু সালমার এক নেতা আমর বিন জমুহ নিজের ঘরে রক্ষিত মূর্তিকে অত্যন্ত ভালবাসতো, আবেগে উদ্বেলিত এ সব যুবক রাতে তার অগোচরে মূর্তিটি নিয়ে আসে এবং আবর্জনার এক গর্তে নিক্ষেপ করে। সকালে নিদ্রা থেকে উঠে আমর মূর্তির অনুসন্ধানে বের হলো এবং তা আবর্জনার গর্তে উবু হয়ে পড়া অবস্থায় পেল। এতে খুব রাগান্বিত হলো এবং বলতে লাগলো, যে এ কাজ করছে তার খোঁজ পেলে একদম গিলে ফেলবো। যাহোক, মূর্তিটি উঠিয়ে সে ঘরে নিয়ে এলো এবং গোসল করিয়ে খুশবু লাগিয়ে যথাস্থানে রেখে দিল। কিন্তু এ মূর্তি ভাঙ্গা যুবকরা প্রত্যেকদিন মূর্তিটি নিয়ে আবর্জনার গর্তে নিক্ষেপ করতো। যখন কয়েকবার এ ঘটনা ঘটলো তখন আমর (রাঃ) বিন জমুহ মূর্তিটির ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে ঈমান গ্রহণ করলেন।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন উনাইস মদীনার বাইরে নিজের কবিলার সাথে এক নির্জন মরু বস্তিতে বাস করতেন। বিশ্ব নবী (সাঃ) হিজরতের পর মদীনা মুনাওয়ারাহ তাশরীফ আনলেন। তখন তিনি প্রায়ই রাসূল (সাঃ)–এর ফয়েজ লাভ করতেন। কতিপয় নেতৃস্থানীয় চরিতকার লিখেছেন যে, তিনি আসহাবে সুফফার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু সময় সময় নিজের গ্রামে চলে যেতেন।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন উনাইস বিরাট কলিজাওয়ালা এবং নির্ভীক মানুষ ছিলেন। রাসূল (সাঃ)–এর প্রতি তাঁর অগাধ ভক্তি ও ভালোবাসা ছিল। হুযুর (সাঃ)–এর প্রতিটি নির্দেশ পালনের জন্য এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং মদীনা এসে বেশীর ভাগ সময় নবী (সাঃ)–এর নিকট উপস্থিত থাকার চেষ্টা করতেন। হুযুর (সাঃ) প্রথমে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়তেন। দ্বিতীয় হিজরীর রজব মাসে যখন এ আয়াত নাযিল হলোঃ

"(হে নবী) আপনি আপনার মুখ মসজিদে হারামের দিকে ফিরিয়ে নিন এবং হে মুসলমানরা! তোমরা যেখানেই থাকোনা কেন সে দিকেই মুখ ফিরিয়ে নেবে। এ নির্দেশের সাথে হুযুর (সাঃ) নিজের মুখ তৎক্ষণাৎ কাবার দিকে ফিরিয়ে নিলেন। সাহাবায়ে

www.amarboi.org

কিরামও তাঁর অনুসরণ করলেন। এ সময় হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন উনাইসও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

যুদ্ধসমূহ শুরু হলে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন উনাইস সর্বপ্রথম ওহোদের যুদ্ধে শরীক হন এবং তারপর অন্যান্য সকল যুদ্ধেই রাসূল (সাঃ)–এর সহযাত্রী ছিলেন। মওলানা সাঈদ আনসারী মরহুম "সিয়রে আনসার" গ্রন্থে লিখেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন উনাইস বদরের যুদ্ধেও অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু ঐতিহাসিকরা বদরী সাহাবীর যে তালিকা প্রদান করেছেন তাতে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন উনাইসের নাম নেই।

বড় বড় যুদ্ধে অংশগ্রহণ ছাড়াও হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন উনাইস কয়েকটি বিশেষ অভিযানেও অংশ নিয়েছিলেন।

বনু হাযিলের ইসলামের শত্রু খালিদ বিন নবিহর হত্যার ঘটনা ওপরে বর্ণনা করা হয়েছে। ৬ষ্ঠ হিজরীতে প্রিয় নবী (সাঃ) খবর পেলেন যে, খায়বারের এক ইহুদী নেতা আবু রাফে সালাম বিন আবিল হুকাইক গাতাফান প্রভৃতি গোত্রকে তার বিরুদ্ধে উস্কানী দিয়ে একটি বড় বাহিনী একত্রিত করছে এবং তারা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। প্রিয় নবী (সাঃ) আবু রাফেকে উৎখাতের জন্য হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আতিকের নেতৃত্বে পাঁচজনের একটি দল খায়বার রওয়ানা করালেন। এ অভিযানে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন উনাইসও অংশ নিয়েছিলেন। এ পাঁচ মুজাহিদ মাথায় কাফন বেঁধে খায়বার গেলেন এবং আবু রাফেকে হত্যা করে মিশন সফল করে বিজয়ী বেশে ফিরে এলেন। এ অভিযানে অংশগ্রহণকারী অবশিষ্ট তিন সাহাবীর নাম হলোঃ হযরত আবু কাতাদাহ (রাঃ), হযরত মাসউদ (রাঃ) বিন সানান এবং হযরত খাযায়ী (রাঃ) ইবনুল আসওয়াদ।

একবার এক ইহুদী হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন উনাইসের মাথার ওপর বাঁকা কাঠ দিয়ে এমন জোরে আঘাত করলেন যে, তার মাথা ফেটে গেল। তিনি স্বয়ং বর্ণনা করেছেন যে, আমি সেই অবস্থায় রাসূল (সাঃ)–এর খিদমতে হাজির হলাম। তিনি ক্ষতের ওপর থেকে কাপড় সরিয়ে ফুঁ দিলেন। আমার ক্ষত সেরে গেল এবং আমার মাথায় আর কোনদিন কোন কষ্ট হয়নি। (তিবরানী)

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন উনাইস একজন বড় আবেদ ছিলেন। একবার পবিত্র রামাদান মাসে তিনি নির্জন মরুর বস্তিতে অবস্থান করছিলেন। সেখান থেকে প্রতিদিন

www.amarboi.org

মসজিদে নববীতে আসা সম্ভব ছিল না এবং তিনি লাইলাতুল কদরে জেগে থাকতে চাচ্ছিলেন। অথচ তার কোন তারিখ নির্দিষ্ট ছিল না। তিনি নবী (সাঃ)–এর দরবারে দরখাস্ত করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! আমার জন্য একটি তারিখ নির্দিষ্ট করে দিন। যাতে আমি সেদিন মসজিদে নববীতে উপস্থিত হয়ে শববিদারী বা রাত্রি জাগরণ করতে পারি।"

হুযুর (সাঃ) তাকে রামাদানের ২৩তম রাতে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দিলেন। বস্তুতঃ হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)–এর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সে রাত নির্দিষ্ট হয়েছিল। এজন্য লোকজন সে রাতের নাম দিয়েছিল "লাইলাতুল জুহনী"। এরপর প্রতিবছর এ রাতে মদীনাবাসী মসজিদে নববীতে একত্রিত হতেন এবং সকাল পর্যন্ত ইবাদাতে মশগুল থাকতেন।

বিশ্ব নবী (সাঃ)–এর ওফাতের কয়েক বছর পর হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন উনাইস মিসর সীমান্তের নিকট গাজার উপকন্ঠীয় শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। কতিপয় বর্ণনায় আছে যে, তিনি মিসর ও আফ্রিকাতেও গিয়েছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁর এ সফর জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর জন্য ছিল।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন উনাইস ৫৪ হিজরীতে ওফাত পান। হাফিজ আবু নয়িম ইসবাহানী (রঃ) মুহাম্মাদ বিন কা'ব (রঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মৃত্যুর পূর্বে তিনি রাসূল (সাঃ)–এর কাছ থেকে প্রাপ্ত লাঠিসহ দাফন করার জন্য ওসিয়ত করেছিলেন। বস্তুতঃ ইন্তিকালের পর সেই পবিত্র লাঠি কাফনের মধ্যে তার পেটের ওপর রেখে দেয়া হয়েছিল এবং লাঠিসহই তাঁকে দাফন করা হয়।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন উনাইস থেকে ১২৪ টি হাদীস বর্ণিত আছে। এ সকল হাদীস তিনি সরাসরি রাসূলে আকরাম (সাঃ) এবং হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁর হাদীস বর্ণনাকারীদর মধ্যে হযরত জাবের (রাঃ) বিন আবদুল্লাহ, হযরত আবু উমামাহ বাহেলী (রাঃ), আবদুল্লাহ বিন আবি উমাইয়াহ, আবদুর রহমান (রাঃ) ও হযরত কা'ব বিন মালিক (রাঃ)–এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হাদীস বর্ণনায় তাঁর মর্যাদা এ ঘটনা থেকে অনুমান করা যায় যে, একবার জালিলুল কদর সাহাবী হযরত জাবের (রাঃ) বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) আনসারী এক মাসের দূরত্ব অতিক্রম করে শুধুমাত্র একটি হাদীস শ্রবণের জন্য তাঁর নিকট খাজা হতে এসেছিলেন।

www.amarboi.org

আকিদাহ এবং নৈতিকতার দিক দিয়ে তাঁর একটি হাদীস অত্যন্ত মশহুর হয়ে আছে। এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলছেন, কবিরাহ গুনাহর মধ্যে সবচেয়ে বড় গুনাহ হলোঃ

০ আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা।

০ মাতা-পিতার নাফরমানী করা।

০ জেনে-শুনে মিথ্যা কসম খাওয়া এবং আদালতে কসমকারী যদি মাছির পাখনা সমান গরবড় করে তাহলে আল্লাহর তরফ থেকে তার অন্তরে কিয়ামত পর্যন্ত একটি চিহ্ন লাগিয়ে দেয়া হয়।

* * *

www.amarboi.org

# রাফায়াহ (রাঃ) বিন রাফে' (রাঃ) আনসারী

সাইয়্যেদেনা হযরত আবু মায়াজ রাফায়াহ (রাঃ) ছিলেন এক মহান মর্যাদা সম্পন পিতার সন্তান। তিনি শুধু অগ্রবর্তী পবিত্র আনসার দলের একজন খ্যাতনামা সদস্যই ছিলেন না বরং হকের পথে নিজের জীবন কুরবানী করার সুযোগও পেয়েছিলেন। অর্থাৎ হযরত রাফে (রাঃ) বিন মালিক যারকী রাসূল (সাঃ)-এর নবুয়াত প্রাপ্তির ১১ বছরে সর্বপ্রথম মক্কা গিয়ে রাসূলে (সাঃ)-এর দর্শন এবং বাইয়াতের সৌভাগ্য অর্জন করেন। অতপর নবুয়াতের ১২ বছরে ১১ জন সাথীসহ দ্বিতীয়বার মক্কা গমন করেন এবং হুযুর (সাঃ)-এর হাতে বাইয়াত হন। সে সময়ই তাঁর স্ত্রী উম্মে মালিক (রাঃ) এবং ভাগ্যবান পুত্র হযরত রাফায়াহ (রাঃ) ঈমান আনয়ন করেন। নবুয়াতের ১৩ বছরে হজ্বের মওসুমে হযরত রাফে' (রাঃ) মদীনার ৭৪ জন ঈমানদারের সাথে তৃতীয়বার মক্কা যান এবং "লাইলাতুল আকাবাহ'তে হুযুর (সাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ ও বাইয়াত গ্রহণ করেন। এ বাইয়াত ইতিহাসে মাইল ষ্টোন হিসেবে খ্যাত।

কতিপয় নেতৃস্থানীয় ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, হযরত রাফে' (রাঃ) নবুয়াতের ১৩ বছরে নিজের ভাগ্যবান পুত্র হযরত রাফায়াহ (রাঃ)-কেও সাথে এনেছিলেন। এভাবে যুবক রাফায়াহ (রাঃ)-ও বাইয়াতে আকাবাহ কাবিরাতে শরীক হওয়ার মহান সুযোগ লাভ করেছিলেন। খাযরাজ গোত্রের বনু যারিক শাখার সাথে তিনি সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। তাঁর বংশনামা হলোঃ রাফায়াহ (রাঃ) বিন রাফে' (রাঃ) বিন মালিক বিন আজলান বিন আমর বিন আমের বিন যারিক বিন আবদি হারেছাহ বিন গাজাব বিন জাশম বিন খাযরাজ।

হযরত রাফায়াহ (রাঃ)-এর মাতা হযরত উম্মে মালিক (রাঃ) বিনতে উবাই বনু হুবলা (খাযরাজ)-এর সরদার আবদুল্লাহ বিন উবাইর বোন ছিলেন। আল্লাহর কি কুদরাত যে, ইবনে উবাই ছিল মুনাফিকদের সরদার। আর তার বোন, ভগ্নিপতি এবং ভাগিনের রাসূল (সাঃ)-এর জান নিছার সাহাবীদের দলে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন।

www.amarboi.org

প্রিয় নবী (সাঃ)–এর হিজরতের পর যুদ্ধ সমূহ শুরু হলো। এ সময় হযরত রাফায়াহ (রাঃ) হক ও বাতিলের মধ্যেকার সর্বপ্রথম সংঘর্ষ বদরের যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করেন এবং বদরী সাহাবী হওয়ার স্থায়ী মর্যাদার সুযোগ লাভ করেন। এ যুদ্ধে তিনি ওয়াহাব বিন উমাইর জামহী নামক মুশরিককে গ্রেফতার করেন।

বদরের পর রাফায়াহ (রাঃ) সম্মানিত পিতা হযরত রাফে' (রাঃ) বিন মালিকের সাথে ওহোদের যুদ্ধে শরীক হন। পিতা–পুত্র উভয়েই অত্যন্ত বীরত্বের সাথে লড়াই করেন। যুদ্ধে হযরত রাফে' (রাঃ) শাহাদাত প্রাপ্ত হন। আর এমনিভাবে হযরত রাফায়াহ (রাঃ) জলিলুর কদর পিতার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হন।

ওহোদের যুদ্ধে পর হযরত রাফায়াহ (রাঃ) পরিখার যুদ্ধে অংশ নেন। ৬ষ্ঠ হিজরীর জিলকদ মাসে হযরত রাফায়াহ (রাঃ) বাইয়াতে রিদওয়ানের মহান সৌভাগ্য লাভ করেন। এমনিভাবে তিনি "আসহাবিশ্ শাজারাহ"তে শামিল হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের সার্টিফিকেটে ভূষিত হন। এরপর তিনি খায়বার, মক্কা বিজয় এবং অন্যান্য যুদ্ধে রাসূল (সাঃ)–এর সহগামী হন।

রহমতে আলম (সাঃ) –এর ওফাতের পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এবং হযরত ওসমান জন্নুরাইন (রাঃ)–এর খিলাফতকালে হযরত রাফায়াহ (রাঃ)–এর তৎপরতার বিস্তারিত কোন কিছু ইতিহাসে পাওয়া যায় না। অবশ্য হযরত আলী (রাঃ)–এর খিলাফতকালে তিনি হযরত আলী (রাঃ)–এর একজন শক্তিশালী সমর্থক ছিলেন। উম্মুল মু'মিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) হযরত উসমান (রাঃ) হত্যার কিসাসের দাবী নিয়ে দাঁড়ালেন এবং হযরত তালহা (রাঃ) ও হযরত যোবায়ের (রাঃ)–কে সাথে নিয়ে বসরা গেলেন। এতে হযরত আলী (রাঃ) খুবই দুঃখিত হলেন। তিনি নিজের সমর্থক এক দলের সামনে বললেনঃ

"রাসূলুল্লাহ (সাঃ)–এর ইন্তিকালের পর আহলে বাইত হওয়ার ভিত্তিতে আমরা রাসূল (সাঃ)–এর খিলাফতের সবচেয়ে বেশী হকদার হওয়ার কথা মনে করতাম। কিন্তু লোকেরা যখন অন্যদেরকে খলিফা বানালো তখন আমরা ধৈর্য ধারণ করলাম এবং ফিতনা ফাসাদ থেকে বিরত থাকলাম। এর ফল খুবই ভালো হলো। এরপর লোকেরা বিদ্রোহ করে ওসমান (রাঃ)–কে হত্যা করলো। তাঁর শাহাদাতের পর সাধারণ মানুষ স্বেচ্ছায় উৎসাহ উদ্দীপনায় সাথে আমার হাতে বাইয়াত করলো। আমি কারো ওপর শক্তি



www.amarboi.org

প্রয়োগ করিনি। বাইয়াতকারীদের মধ্যে তালহা (রাঃ) এবং যোবায়ের (রাঃ)–ও ছিলেন। কিন্তু একমাস অতিক্রান্ত না হতেই তারা আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছেন এবং সৈন্যসহ বসরা পৌঁছেন। আল্লাহ পাক এ ফিতনা–ফাসাদ দেখছেন।"

এখানে হযরত রাফায়াহ (রাঃ)–ও উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমিরুল মুমিনিন (রাঃ)–এর বক্তৃতা শুনে আরজ করলেনঃ

"আমিরুল মুমিনিন। নবী করিম (সাঃ)–এর ইন্তেকালের পর হক পথে কুরবানীর ভিত্তিতে আমরা আনসাররাই খিলাফতের সবচেয়ে বেশী যোগ্য বলে মনে করতাম। কিন্তু কুরাইশের মুহাজিররা রাসূল (সাঃ)–এর সাথে নিজেদের নিকটতম সম্পর্ক, ইসলাম গ্রহণে অগ্রবর্তী ভূমিকা এবং হিজরতের মত ফজিলত বর্ণনা করে নিজেরেদেরকে খিলাফতের যোগ্য বলে প্রমাণিত করলেন। আমরা মনে করলাম যে, কিতাব ও সুন্নাত কায়েম আছে এবং হকের ভিত্তিতেই কাজ হচ্ছে। অতএব, আমরা কুরাইশের খিলাফতের দাবী মেনে নিলাম এবং আমাদেরকে এটাই করা উচিত ছিল। এখন আপনার হাতে বাইয়াত গ্রহণের পর কতিপয় ব্যক্তি আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। আল্লাহর কসম! আমরা আপনাকেই তাদের ওপর অগ্রাধিকার দিয়ে থাকি। আপনি যে নির্দেশই দিন না কেন, আমরা তা পালন করবো।"

হযরত রাফায়াহ (রাঃ)–এর বক্তৃতার পর আরও কতিপয় বুজর্গ একই ধরনের আবেগময় ভাষণ দিলেন এবং হযরত আলী (রাঃ) নিজের সমর্থকদের নিয়ে বসরা রওয়ানা হয়ে গেলেন। সেখানে উষ্ট্রের যুদ্ধের দুঃখজনক ঘটনা সংঘটিত হলো। এ যুদ্ধে হযরত রাফায়াহ (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)–এর সাথে ছিলেন। এরপর তিনি সিফফিনের যুদ্ধেও হযরত আলী (রাঃ)–এর প্রতি পূর্ণ সমর্থন দান করেন।

৪০ হিজরীতে হযরত আলী (রাঃ) শহীদ হলেন। হযরত রাফায়াহ (রাঃ)–ও তারপর বেশীদিন জীবিত ছিলেন না। ভিন্ন মত অনুযায়ী তিনি ৪১ অথবা ৪২ হিজরীতে ওফাত পান। সন্তানদের মধ্যে মায়াজ (রাঃ) এবং ওবায়েদ (রঃ) নামক দু'পুত্রের নাম জানা যায়। হযরত রাফায়াহ (রাঃ) থেকে বেশ কিছু হাদীস বর্ণিত আছে।

* * *

www.amarboi.org

# হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) বিন জাবার আনসারী

নবুয়াতের ১২ বছর পর হযরত মাছয়াব (রাঃ) বিন উমায়ের ইসলামের প্রথম মুবাল্লিগ হিসেবে মদীনা মুনাওয়ারাহ গমন করেন। সেখানে তাবলিগের কাজ শুরু করার পর আওস গোত্র সরদার হযরত সায়াদ (রাঃ) বিন মায়াজ তাদের মহল্লায় গমনে তাঁকে বাধা দান করেন। কিন্তু হযরত মাছয়াব (রাঃ) যখন তাঁকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেলন তখন তাঁর সুন্দর কথা এবং ধৈর্যে খুব প্রভাবিত হয়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তিতে তার নিজের গোত্র বনু আবদুল আশহাল সেই দিনই মুসলমান হয়ে গেল। আওসের অন্যান্য পরিবারেও ইসলাম দ্রুততার সাথে বিস্তার লাভ করলো। সে যুগেই আওস গোত্রের শাখা বনু হারেছার এক সুন্দর স্বভাব সম্পন্ন ব্যক্তি আবদুল উজ্জাহ ইসলাম গ্রহণ করেন। বিশ্বনেতা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (সাঃ) হিজরাতের পর মদীনায় শুভ পদার্পন করলেন। এ সময় একদিন আবদুল উজ্জাহ রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) । এখানে আপনার আগমনের পূর্বেই আল্লাহ পাক আমাকে ইসলামের নিয়ামতে সমৃদ্ধ করেছেন।"

হুযুর (সাঃ) একথা শুনে খুশী প্রকাশ করলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নাম কি? " তিনি বললেন, "আবদুল উজ্জাহ।" প্রিয় নবী (সাঃ) বললেন, "না, আজ থেকে তোমার নাম হবে আবদুর রহমান।"

বনু হারেছার এ ব্যক্তি যাকে প্রিয় নবী (সাঃ) 'আবদুর রহমান ' নাম দিয়েছিলেন ইতিহাসে তিনি আবু আবাস কুনিয়াতে মশহুর হয়ে আছেন। তাঁর নসবনামা হলোঃ আবু আবাস আবদুর রহমান বিন জাবার বিন আমর বিন যায়েদ বিন হাশাম বিন মাজদায়াহ বিন হারেছাহ বিন হারেছ বিন খাযরাজ বিন আমর বিন মালিক বিন আওস।

হযরত আবু আবাছ (রাঃ) নবুয়াতের ১৩ পর হজ্বের মওসুমে মক্কা গিয়ে লাইলাতুল আকাবার অংশে নিতে পারেননি। তবে তাঁর একজন বন্ধু হযরত আবু বুরদাহ (রাঃ) বিন নিয়ার আসহাবে উকবার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। হযরত আবু বুরদাহ

www.amarboi.org

(রাঃ) মক্কা থেকে ফিরে এলেন এবং হযরত আবাছ (রাঃ)–কে মক্কায় সংঘটিত ঘটনাবলী সম্পর্কে অবহিত করলেন। খবরাদি শুনে তাঁর ঈমানী আবেগ উদ্বেলিত হয়ে ওঠলো। হাফিজ ইবনে হাজার (রঃ) "ইসাবাহ" তে লিখেছেন যে, হযরত আবু আবাছ (রাঃ) হযরত আবু বুরদাহ (রাঃ)–কে সাথে নিয়ে নিজের গোত্রের মূর্তি ভেঙ্গে ফেললেন। এ ঘটনার কিছুদিন পর প্রিয় নবী (সাঃ) মদীনা তাশরীফ আনলেন। এ সময় অন্য আনসার ভাইদের সাথে হযরত আবু আবাছ (রাঃ)–ও রাসূলুল্লাহ(সাঃ)–কে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করলেন এবং মুহাজির সাহাবীদেরকে অত্যন্ত সুপ্রসন্ন চিত্তে মেহমানদারী করলেন। হিজরতের পাঁচ মাস পর প্রিয় নবী (সাঃ) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে দ্বিনী ভ্রাতৃত্ব কায়েম করেন। হযরত আবু আবাছ (রাঃ)–এর ভ্রাতৃত্বে আসেন জলিলুল কদর মুহাজির সাহাবী হযরত খুনাইস (রাঃ) বিন হাজাফাহ।

হযরত আবু আবাছ (রাঃ) আনসারে আসুলে গোণা কয়েক ব্যক্তির অন্যতম ছিলেন যাঁরা জাহেলী যুগেও আরবী লিখা–পড়া জানতেন। আল্লামা ইবনে আছির (রাঃ) "উসুদুল গাববাহ" গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে লিখেছেনঃ "তিনি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আরবী লিখতেন।"

নবী (সাঃ)–এর হিজরতের পর হযরত আবু আবাছ (রাঃ) প্রায়ই তাঁর নিকট যেতেন এবং সামর্থ অনুযায়ী ফয়েজ লাভ করতেন। এভাবে তিনি কুরআন ও হাদীস শাস্ত্রে প্রভূত ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন।

যুদ্ধসমূহের মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং বদরী সাহাবী হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল প্রায় ৪৮ বছর।

প্রিয়নবী (সাঃ) মদীনা মুনাওয়ারাহ তাশরীফ আনার পর মদীনার ইহুদীদের সাথে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য চুক্তি ও সন্ধি করেছিলেন। ইহুদীরা মদীনা চুক্তি নামে খ্যাত এ চুক্তিতে দস্তখত করেছিলেন ঠিকই কিন্তু তারা গোপনে গোপনে হকপন্থীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে মেতে উঠলো। কা'ব বিন আশরাফ নামক তাদের এক সরদার এ ব্যাপারে বেশী অগ্রণী ছিল। সে একজন অনলবর্ষী বক্তা এবং শক্তিশালী কবি ছিল এবং মুসলমানদের কোনরকম তোয়াক্কাই করতো না। সে কবিতার মাধ্যমে রাসূল (সাঃ)–এর বিরুদ্ধে অব্যাহতভাবে বিষ প্রকাশ করতো।

হাফিজ ইবনে হাজার (রঃ) বর্ণনা করেছেন, সে হতভাগা একবার প্রিয় নবী (সাঃ)–কে শহীদ করার পরিকল্পনা এঁটেছিল। কিন্তু ব্যর্থ হয়। বদরের যুদ্ধে কুরাইশ মুশরিকদের পরাজয় হলো। কা'ব এ সময় নিহত কুরাইশদের স্মরণে মরসিয়া রচনা করলো এবং

www.amarboi.org

তাদের নিকট শোক প্রকাশের জন্য মক্কা গেল। সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করে তাদের নিহতদের বদলা নেয়ার জন্য উত্তেজিত করলো। মদীনা ফিরে এসে নিজের কওমের মুসলমানদের বিরুদ্ধে আগের চেয়ে বেশী উত্তেজনা ছড়াতে লাগলো এবং প্রিয়নবী (সাঃ)–এর বিরুদ্ধে নিত্য–নতুন কবিতা বাঁধতে লাগলো। তার এ তৎপরতা শুধুমাত্র মদীনা চুক্তির খেলাপই ছিল না বরং তা গাদ্দারীর সংজ্ঞায় পড়তো। হুযুর (সাঃ) বেশ কিছু দিন যাবৎ তার এ তৎপরতা উপেক্ষা করে আসছিলেন। কিন্তু যখন সে মদীনা মুনাওয়ারায় নতুন নগর রাষ্ট্রের জন্য বিপদজনক হয়ে উঠলো তখন একদিন তিনি সাহাবীদের সামনে কা'ব বিন আশরাফের অপতৎপরতায় অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করলেন এবং সাহাবীদেরকে এ ব্যাপারে তদারক করার উৎসাহ দিলেন। হুযুর (সাঃ)–এর ইরশাদ শুনে আনসারের পাঁচ ব্যক্তি ফিতনা উৎখাতের সংকল্প করলো। কিন্তু কা'ব বিন আশরাফের মূলোৎপাটন সহজ কাজ ছিল না। তার বাসস্থান অথবা মহল এক মজবুত দুর্গ সদৃশ ছিল এবং নিজের রক্ষার জন্য সে অনেক সশস্ত্র যুবক নিয়োগ করেছিল। এ সত্ত্বেও আনসারী জানবাজরা আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল (সাঃ)–এর খাতিরে নিজেদের জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করে একরাতে কা'বের দুর্গে প্রবেশ করে তার ভবলীলা সাঙ্গ করে ফেললো। ইসলামের এ সর্বনিকৃষ্ট দুশমন হত্যাকারী জানবাজ লোকদের অন্যতম ছিলেন হযরত আবু আবাছ আবদুর রহমান (রাঃ)।

এ ঘটনার পর হযরত আবু আবাছ (রাঃ) ওহোদের যুদ্ধ, পরিখার যুদ্ধ এবং রাসূল (সাঃ)–এর যুগে সংঘটিত বেশীর ভাগ অন্য যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। কতিপয় বর্ণনায় আছে যে, রিসালাত যুগের শেষ দিকে হযরত আবু আবাছ (রাঃ) অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। এ অবস্থায় তিনি একদিন হুযুর (সাঃ)–এর খিদমতে হাজির হলেন। তিনি রাস্তা চলার জন্য তাঁকে একটি লাঠি প্রদান করেছিলেন।

হযরত আবু আবাস আবদুর রহমান ৩৪ হিজরীতে কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। আমিরুল মু'মিনিন হযরত ওসমান (রাঃ) তাঁর পীড়ার খবর পেয়ে দেখতে এলেন। এ অসুখই তাঁর শেষ অসুখ ছিল এবং ইসলামের এ মহান সন্তান প্রায় ৮০ বছর বয়সে আল্লাহর সান্নিধ্যে পাড়ি জমালেন। আমিরুল মুমিনিন হযরত ওসমান জুন্নুরাইন (রাঃ) জানাজার নামায পড়ালেন বাকি গোরস্তানে দাফন করলেন। হযরত কাতাদাহ (রাঃ) বিন নুমান হযরত আবু বুরদাহ (রাঃ) বিন নিয়ার এবং হযরত মুহাম্মাদ (রাঃ) বিন মাসলামাহর মত মহান সাহাবী তাঁর লাশ কবরে নামিয়েছিলেন।

www.amarboi.org

হযরত আবু আবাহ (রাঃ) মুহাম্মাদ (রাঃ) এবং যায়েদ (রঃ) নামক দু'পুত্র রেখে যান। তিনি হাদীস বর্ণনায় অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। হাদীসের কিতাবসমূহে তাঁর থেকে বর্ণিত মাত্র পাঁচটি হাদীস পাওয়া যায়।

এক বর্ণনায় আছে যে, হযরত আবু আবাস (রাঃ) বৃদ্ধকালে চুলে মেহেদি লাগাতেন।

*    *

*

www.amarboi.org

# হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন ছাবিত আনসারী

বিশ্ব নেতা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সাঃ) মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা মুনাওয়ারাহ আগমন করলেন। তাঁর শুভাগমনে এ প্রাচীন শহর নব বসন্তে সজ্জিত হলো। মদীনার অলি-গলি রিসালাতের সুগন্ধিতে ভরপুর হয়ে গেল। একদিন কতিপয় আনসারী সাহাবী ১২ বছর বয়স্ক এক তরুণকে হুযুর (সাঃ)-এর পবিত্র খিদমতে সমপস্থিত করে আরজ করলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ তরুণ বনু নাজ্জারের আশার প্রদীপ। পবিত্র কুরআনের প্রতি তার আকর্ষণ এত বেশী যে, ইতিমধ্যেই ১৭টি সূরা মুখস্ত করে ফেলেছে।"

রহমতে আলম (সাঃ) একথা শুনে খুব খুশী হলেন এবং বনু নাজ্জারের সেই সৌভাগ্যবান সন্তানকে পবিত্র কুরআন পাঠের নির্দেশ দিলেন। তিনি নির্দেশ পালনার্থে তৎক্ষণাৎ ১৭টি সূরা পাঠ করলেন। প্রিয় নবী (সাঃ)-এর বিস্মিত চেহারায় আলোকচ্ছটা ঝলমলিয়ে উঠলো। তিনি ভাগ্যবান পুত্রের মাথায় স্নেহের হাত বুলালেন এবং তার কল্যাণের জন্য দোয়া করলেন। পবিত্র কুরআনের প্রতি এত অধিক আকর্ষণ পোষণকারী এ মাদানী তরুণের নাম ছিল হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন ছাবিত আনসারী।

সাইয়্যেদেনা হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন ছাবিত আনসারী ছিলেন মর্যাদাবান সাহাবীদের অন্যতম, দ্বিনী এবং ইলমী খিদমতের কারণে কতিপয় সাহাবীর মত তিনিও উম্মাহর স্তম্ভ হিসেবে পরিগণিত। তাঁর কুনিয়ত ছিল আবু সাঈদ এবং আবু খারেজাহ্। কেউ কেউ আবার আবু আবদুর রহমান নামের তৃতীয় কুনিয়তের কথাও উল্লেখ করেছেন। উম্মাহর জ্ঞানের সাগর, ওহির কাতিব, ক্বারী এবং ফরয সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞ এ সকল উপাধি ছিল তাঁর। খাযরাজের সম্ভ্রান্ততম শাখা বনু নাজ্জারের সাথে ছিল তাঁর সম্পর্ক। তার নসবনামা হলোঃ যায়েদ (রাঃ) বিন ছাবিত বিন জাহ্হাক বিন যায়েদ বিন লওজান বিন আমর বিন আবদি বিন আওফ বিন গানাম বিন মালিক বিন নাজ্জার।

হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর পিতা ছাবিত বিন জাহ্হাক নবী (সাঃ)-এর হিজরতের পাঁচ বছর পূর্বে বুয়াছের যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। সে সময় হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর বয়স মাত্র ৬ বছর ছিল। তিনি মাতা নাওয়ার বিনতে মালিকের স্নেহে লালিত পালিত হন।

www.amarboi.org

হিজরতের একবছর পূর্বে ইসলামের প্রথম মুবাল্লিগ হযরত মুছয়াব (রাঃ) বিন উমাইর মদীনা আগমন করেন। তাঁর তাবলিগী প্রচেষ্টায় আওস এবং খাযরাজ গোত্রের সকল পরিবারে ইসলামের চর্চার বিস্তার লাভ ঘটে। সে যুগে মদীনার যে সকল পুন্যাত্মা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন ছাবিতও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সে সময় তার বয়স ছিল ১১ বছর। আল্লাহ্ পাক তাঁকে অত্যন্ত পবিত্র স্বভাব দান করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণ করেই অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা লাভ শুরু করেন। এমনকি প্রিয় নবী (সাঃ)-এর মদীনা শুভাগমনের পূর্বেই ১৭টি সূরা হেফজ করে ফেলেছিলেন। কুরআনের প্রতি এ আকর্ষণের কারণে আনসারদের মধ্যে তাঁকে বিশেষ নজরে দেখা হতো। হিজরতের পর হযরত যায়েদ (রাঃ) বেশীর ভাগ সময় নবী (সাঃ)-এর ফয়েজ লাভের জন্যই কাটাতেন। অত্যন্ত মেধাসম্পন্ন হওয়ার কারণে খুব শীঘ্র জ্ঞানের মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি রাসূল (সাঃ)-এর বিশেষ সান্নিধ্য লাভ করেন। চরিতকাররা বলেছেন, হযরত যায়েদ (রাঃ) শুধু আরবী ভাষাই লিখতে পড়তে জানতেন না বরং হুযুর (সাঃ)-এর ইঙ্গিতে ইবরানী এবং সুরইয়ানী ভাষাও শিখেন এবং খুব কম সময়ে এ ভাষাদ্বয়ে লিখা-পড়ার অনুশীলনীও চালান। পরবর্তী পর্যায়ে আরো অগ্রসর হয়ে তিনি তাওরাত এবং ইঞ্জিলেরও আলেম হয়ে যান। আল্লামা মাসউদী (রঃ) "কিতাবুত তানবিহ ওয়াল আশরাফ" গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত যায়েদ (রাঃ) হাবশী, কিবতী, রোমক এবং ফারসী ভাষাও জানতেন। মদীনায় যারা এ সকল ভাষা জানতেন তাদের নিকট থেকে তিনি তা শিখেছিলেন।

হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর হস্তলিপি ছিল অত্যন্ত সুন্দর। তিনি একজন ভালো কারুশিল্পী ছিলেন। ইবনে সায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি একজন অংক বিশারদ ছিলেন এবং অংকের জটিলতম সমস্যাদি মুহূর্তের মধ্যে সমাধান করে দিতেন।

প্রিয় নবী (সাঃ) হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন ছাবিতের যোগ্যতার খুব কদর করতেন। তিনি তাঁকে কাতিবে ওহির পদে নিয়োগ করেছিলেন। রাসূল (সাঃ)-এর ইন্তেকাল পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি শুধু ওহিই লিখতেন না, বরং অন্যান্য দেশের রাজা-বাদশাহর যে সকল পত্রাবলী আসতো, রাসূল (সাঃ)-এর পক্ষ থেকে তার জবাবও লিখতেন।

মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে বর্ণিত আছে যে, হযরত যায়েদ (রাঃ) প্রিয় নবী (সাঃ)-এর অত্যন্ত সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। কোন কোন সময় তিনি হুযুর (সাঃ)-এর পাশে বসে যেতেন। প্রিয় নবী (সাঃ) স্নেহবশতঃ তাঁর রানের ওপর নিজের পবিত্র উরু রাখতেন। একদিন সেই অবস্থায়ই রাসূল (সাঃ)-এর ওপর ওহী নাযিল হলো। হযরত যায়েদ (রাঃ) বলেনঃ "সে সময় হুযুর (সাঃ)-এর পবিত্র উরু আমার নিকট এত ভারী

www.amarboi.org

মনে হল যে, আমার রান বুঝি ভেঙে চুরে যাবে।" কিন্তু নবী (সাঃ)-এর প্রতি এত আদব ছিল যে, তিনি মুখ দিয়ে উহ শব্দও উচ্চারণ করেন নি এবং অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে বসেছিলেন।

রাসূলে আকরাম (সাঃ) ওহী লিখার কাজ অন্যান্য সাহাবী (রাঃ) দিয়েও করিয়েছিলেন। এভাবে পত্র লিখনের কাজও অন্য সাহাবীরা করেছিলেন। কিন্তু তাদের মধ্যে হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর নাম এ জন্য প্রসিদ্ধ হয়ে আছে যে, তিনি নবী (সাঃ)-এর ইন্তেকাল পর্যন্ত এ দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছিলেন।

মুসনাদে আহমাদ (রঃ)-এ বর্ণিত আছে যে, যায়েদ (রাঃ) বিন ছাবিত দোয়াত-কলম হাড়ের টুকরো অথবা হাল্কা পাথর প্রভৃতিসহ রাসূল (সাঃ)-এর নিকট বসে যেতেন। যখন ওহী নাযিল হতো তখন হুযুর (সাঃ)-এর পবিত্র মুখে যা শুনতেন তা লিখে নিতেন। কোন কোন সময় প্রিয় নবী (সাঃ) ওহী লিখনের ব্যাপারে তাঁকে বিশেষ হেদায়েত দিলে তা তিনি অবিলম্বে পালন করতেন।

নবী (সাঃ)-এর হিজরতের পর তিনি বেশীরভাগ সময় ওহী লিখার কাজে ব্যয় করেছেন। যা কিছু লিখতেন তাই অন্তরে গেঁথে নিতেন। অন্যান্য সাহাবী ওহীর যে অংশ লিখতেন তাঁদের নিকট থেকেও তিনি তা শুনে মুখস্ত করে নিতেন। এ ভাবে রাসূল (সাঃ)-এর যুগেই তিনি সমগ্র কুরআন শরীফ মুখস্ত করে নিয়েছিলেন।

সহীহ বুখারীতে আছে যে, যায়েদ (রাঃ) বিন ছাবিত শুধুমাত্র পুরো কুরআনেরই হাফেজ ছিলেন না বরং তিনি হুযুর (সাঃ)-এর সম্মুখেই বিভিন্ন বস্তুর ওপর লিখিত কুরআনের সকল অংশ একত্রিতও করেছিলেন।

হক ও বাতিলের প্রথম সংঘর্ষ দ্বিতীয় হিজরীর রামাদান মাসে বদরের ময়দানে সংঘটিত হয়েছিল। সে সময় হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন ছাবিতের বয়স ছিল ১৩ বছর। যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য হুযুর (সাঃ) বয়স নির্ধারণ করেছিলেন কমপক্ষে ১৫ বছর। কিন্তু হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর ঈমানী উদ্দীপনা এত ছিল যে, কতিপয় যুবকের সাথে রাসূল (সাঃ)-এর নিকট হাজির হলেন এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। হুযুর (সাঃ) তাদের ঈমানী আবেগের প্রশংসা করলেন। কিন্তু যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি দিলেন না। এতে তিনি নিরুপায় হয়ে মদীনা ফিরে এলেন।

ওহোদের যুদ্ধেও (তৃতীয় হিজরী) হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর অংশগ্রহণ সম্পর্কে মতভেদ আছে। অবশ্য পরিখার যুদ্ধে (পঞ্চম হিজরী) তাঁর অংশগ্রহণ সম্পর্কে সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেন। এ সময় তাঁর বয়স প্রায় ১৬ বছর ছিল। ইবনে সায়াদ (রাঃ)

www.amarboi.org

বলেছেন, পরিখা খননে তিনি অত্যন্ত তৎপরতার সাথে অংশ নিয়েছিলেন। হুযুর (সাঃ) তাঁকে পরিখা থেকে মাটি বের করতে দেখে খুব খুশী হয়েছিলেন এবং বলেছিলেনঃ "কি ভালো ছেলে।" ঘটনাক্রমে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। হযরত আম্মারাহ (রাঃ) বিন হাযম আনসারীর দৃষ্টি তাঁর ওপর পড়লে মজাক করে তিনি তার অস্ত্র খুলে নিলেন। আত্মীয়তার দিক থেকে হযরত আম্মারাহ (রাঃ) হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর চাচা হতেন এবং বয়সে তার চেয়ে বেশ বড় ছিলেন। সম্ভবতঃ অস্ত্র খুলে নিয়ে তিনি তাঁকে সতর্ক করতে চেয়েছিলেন যে, এ অবস্থায় ঘুমানো ঠিক নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও হযরত যায়েদ (রাঃ) ক্লান্তির কারণে এত গভীর নিদ্রামগ্ন ছিলেন যে, অস্ত্র খুলে নেয়া টেরই পেলেন না। প্রিয় নবী (সাঃ) সেদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি কৌতুক করে বললেন, "হে ঘুমের পিতা ওঠো।" তিনি নিদ্রা থেকে জাগলে হুযুর (সাঃ) সাহাবীদেরকে সম্বোধন করে বললেন, "কারো সাথে এ ধরনের মজাক বা ঠাট্টা করো না।"

পরিখার যুদ্ধের পর হযরত যায়েদ (রাঃ) অন্যান্য যুদ্ধেও রাসূল (সাঃ)-এর সাথে অংশ নিয়েছিলেন। তাবুকের যুদ্ধেও তিনি অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে যোগদান করেন। এ যুদ্ধে তার গোত্র মালিক বিন নাজ্জারের ঝাণ্ডা হযরত আম্মারাহ (রাঃ) বিন হাজামের নিকট ছিল, হুযুর (সাঃ) এ ঝাণ্ডা তাঁর নিকট থেকে নিয়ে হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন ছাবিতের কাছে সমর্পন করলেন। হযরত আম্মারাহ (রাঃ) আরজ করলেনঃ "ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আমার কি অপরাধ হয়েছে।"

প্রিয় নবী (সাঃ) বললেনঃ "তেমন কিছু ঘটেনি। আমি যায়েদকে ঝাণ্ডা শুধু এ জন্য দিয়েছি যে, সে তোমার থেকে কুরআন বেশী পড়েছে।"

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর ছকিফায়ে বনু সায়েদাতে আনসারদের এক সমাবেশ হলো। হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন ছাবিতও তাতে যোগদান করেন। এ সমাবেশে কতিপয় বুজর্গ আনসার খাযরাজ গোত্রের নেতা হযরত সায়াদ (রাঃ) বিন উবাদাহকে খলিফা বানানোর প্রস্তাব পেশ করলো এবং আনসারদের খিলাফতের হকদার প্রমাণের জন্য জোরে শোরে বক্তৃতা করলেন। হযরত যায়েদ (রাঃ) এ সময় চুপ রলেন। ইত্যবসরে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ), হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এবং হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ) ইবনুল জাররাহও এ সমাবেশে উপস্থিত হলেন। তাঁরা কুরাইশ মুহাজিরদের খিলাফতের হকদার হওয়া সম্পর্কে আলোচনা শুরু করলেন এবং এ কথাও তারা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলেন যে, আরববাসী কুরাইশের নেতৃত্ব ব্যতীত অন্যের নেতৃত্ব মেনে নেবে না। এ সময় আনসারদের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত যায়েদ (সাঃ) বিন ছাবিতই তাদের সমর্থনে কথা বলেন। তিনি জানান, রাসলল্লাহ (সাঃ) মুহাজিরদের

www.amarboi.org

মধ্যে ছিলেন। এ জন্য ইমামও মুহাজিরদের মধ্য থেকে নির্বাচিত করা উচিত। আমরা যেভাবে রাসূল (সাঃ)-এর আনসার বা সাহায্যকারী ছিলাম তেমনি ইমামেরও সাহায্যকারী থাকবো।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) সাহসিকতাপূর্ণ বক্তৃতা দানের জন্য হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন ছাবিতকে মুবারকবাদ দিলেন এবং তার মঙ্গলের জন্য দোয়া করলেন। এরপর হযরত যায়েদ (রাঃ) অন্য কতিপয় আনসারসহ সর্বপ্রথম হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)-এর হাতে বাইয়াত হন।

হযরত সিদ্দিকে আকবর (রাঃ) নিজের খিলাফত কালে হযরত যায়েদ (রাঃ)-কে খিলাফতের পদে বহাল রাখেন এবং মজলিশে শূরার সদস্য নিয়োগ করেন। ধর্মত্যাগের ফিতনার শুরুতে হযরত যায়েদ (রাঃ) মদীনা মুনাওয়ারার প্রতিরক্ষায় রাসূল (সাঃ)-এর খলিফার সাহায্য করেন। অতপর তিনি মুসায়লামা কাজ্জাবের বিরুদ্ধে ইয়ামামার রক্তাক্ত যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। যুদ্ধ কালে তাঁর শরীরে একটি তীর বিদ্ধ হয়। কিন্তু আল্লাহ পাক তাঁকে রক্ষা করেন। এ যুদ্ধে অসংখ্য কুরআনের হাফিজ শহীদ হন। এতে পবিত্র কুরআনের কোন অংশ নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দেয়। সুতরাং হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর দৃষ্টি আকর্ষণের ফলে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) কুরআনে হাকিমের সকল লিখিত অংশ একত্রিত করে এক মুসহাফের আকৃতিতে সংকলন করার দায়িত্ব হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন ছাবিতের ওপর অর্পন করেন। প্রথমতঃ এ দায়িত্ব পালনে হযরত যায়েদ (রাঃ) খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কিন্তু তিনি সিদ্দিকে আকবর (রাঃ)-এর অনুপ্রেরণায় এ কাজে অগ্রসর হলেন। রাসূল (সাঃ)-এর খলিফা এ মহান কাজে তাঁকে সাহায্য করার জন্য ৭৫ জন সাহাবী (রাঃ)-এর একটি দল নিয়োগ করলেন।

যদিও রাসূল (সাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই হযরত যায়েদ (রাঃ) কুরআনে হাকিমের সকল অংশ একত্রিত করেছিলেন তবুও যে সকল অংশ তখনো মানুষের নিকট ছিল তাও তিনি নিয়ে একত্রিত করলেন এবং সমগ্র কুরআন পাক এক সাথে এক জিলদে লিখে নিলেন। কোন আয়াত সম্পর্কে মত বিরোধ দেখা দিলে দু'সাহাবীর সাক্ষ্য অনুযায়ী তা লিপিবদ্ধ করেন। সহীহ বুখারীতে আছে যে, কুরআনে হাকিমের এ নুসখা প্রথম হযরত আবু বকর সিদ্দিক এবং পরে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর নিকট ছিল। তাদের পরে উম্মুল মু'মিনিন হযরত হাফসা (রাঃ)-এর নিকট রাখা হয়।

হযরত ওসমান গণি (রাঃ)-এর খিলাফতকালে বিভিন্ন এলাকার লোকদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের কিরাত পাঠ শুরু হয়। এ সময় হযরত ওসমান (রাঃ) হযরত হাফসা (রাঃ)-এর নিকট থেকে এ মুসহাফ চেয়ে পাঠালেন এবং চার সাহাবী দিয়ে তার পাঁচটি অনুলিপি করালেন। অতপর তা বিভিন্ন ইসলামী প্রদেশে প্রেরণ করলেন। সহীহ বুখারী অনুযায়ী

www.amarboi.org

যেসব বুজর্গ ব্যক্তি অনুলিপির কাজ করেছিলেন তাদের মধ্যে হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন ছাবিতও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)–এর শাসনকাল এলো। এ সময় তিনি যায়েদ (রাঃ) বিন ছাবিতকে শুধুমাত্র লিখক এবং মজলিশে শূরার সদস্য পদেই বহাল রাখলেন না বরং কাজীর পদ সৃষ্টি করে তাকে মদীনা মুনাওয়ারার কাজী নিয়োগ করলেন এবং বেতনও ঠিক করে দিলেন, বস্তুতঃ সেসময় লিখনীর কাজ অনেক বেড়ে গিয়েছিল। এ জন্য হযরত মুয়াইকিব দাওসী (রাঃ)–কে তাঁর সহকারী নিয়োগ করেন। প্রথম প্রথম কাজীর জন্য কোন পৃথক ভবন নির্মাণ করা হয়নি। এ জন্য হযরত যায়েদ (রাঃ) কাজীর দায়িত্ব নিজের ঘরেই আঞ্জাম দেন। বিশেষ করে মদীনা শহর এর উপকণ্ঠ সমূহের মামলা তাঁর নিকট আসতো। একবার হযরত উবাই (রাঃ) বিন কায়াব এবং আমিরুল মু'মিনিন হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)–এর মধ্যে কোন ব্যাপারে ঝগড়া হয়ে গেল। হযরত উবাই (রাঃ) বিন কায়াব আমিরুল মু'মিনিনের বিরুদ্ধে হযরত যায়েদ (রাঃ)–এর আদালতে মামলা দায়ের করে দিলেন। উভয় পক্ষই হযরত যায়েদ (রাঃ)–এর আদালতে হাজির হলেন। হযরত যায়েদ (রাঃ) শ্রদ্ধা বশতঃ আমিরুল মু'মিনিনের জন্য নিজের আসন খালি করে দিলেন। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) সরকারী কর্মকর্তাদের ওপর কড়া দৃষ্টি রাখতেন। তিনি হযরত যায়েদ (রাঃ)–এর এ কাজ অপসন্দ করলেন এবং তাঁকে সম্বোধন করে বললেনঃ ''এটা ইনসাফ থেকে অনেক দূরে। আমাকে আমার প্রতিপক্ষের সাথে বসা উচিত।'' বস্তুতঃ তিনি হযরত উবাই (রাঃ)–এর সাথে বসে গেলেন। হযরত ওমর বিবাদী ছিলেন এবং তিনি বাদীর দাবী অস্বীকার করেছিলেন। এ জন্য শরীয়ত অনুযায়ী শপথ বা কসম করা তাঁর ওপর ওয়াজিব ছিল। হযরত যায়েদ (রাঃ) খিলাফতের সম্মানার্থে হযরত উবাই (রাঃ)–কে আমীরুল মু'মিনিন (রাঃ)–এর কসম মাফ করে দেয়ার কথা বললেন। কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ) এ অনুগ্রহ গ্রহণ করলেন না এবং হযরত যায়েদ (রাঃ)–কে আদালতে খলিফা এবং একজন সাধারণ মুসলমানকে একই পর্যায়ে রাখার নির্দেশ দিলেন। এ ঘটনার পর হযরত যায়েদ (রাঃ) সবসময় হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)–এর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতেন।

হযরত যায়েদ (রাঃ)–এর ওপর হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)–এর সীমাহীন আস্থা ছিল। তিনি ১৬ এবং ১৭ হিজরীতে হজ্বের জন্য মক্কা মুয়াজ্জমা গমন করেন। এ সময় হযরত যায়েদ (রাঃ)–কে তিনি নিজের স্থলাভিষিক্ত করে যান। সিরিয়া গমনের সময়ও তিনি তাকে দায়িত্ব দিয়ে মদীনা রেখে যান। সিরিয়া থেকে তাঁকে পত্র লিখলেন। এ সময় তিনি নিজের নামের পূর্বে তাঁর নাম লিখলেন (অর্থাৎ যায়েদ বিন ছাবিতের প্রতি ওমর বিন খাত্তাব থেকে) আমীরুল মু'মিনিনের অনুপস্থিতিতে হযরত যায়েদ (রাঃ) খিলাফতের দায়িত্ব অত্যন্ত সুন্দরভাবে আঞ্জাম দিতেন। আমিরুল মু'মিনিন ফিরে

www.amarboi.org

এসে তার কুশলতার প্রশংসা করতেন এবং সুন্দরভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য কিছু জায়গীর প্রদান করতেন।

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) বাইতুল মাকদাস গমনের সময় কতিপয় মুহাজির এবং আনসারকেও সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন। এক বর্ণনায় আছে যে, হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন ছাবিতও এ সফরে আমীরুল মু'মিনিনের সাথে ছিলেন।

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) রাষ্ট্রীয় বিচারালয় প্রতিষ্ঠা করলেন এবং চাকুরীজীবীদের মর্যাদা অনুযায়ী বৃত্তি নির্ধারণ করলেন। এ বৃত্তির পরিমাণ নির্বাচন এবং তার হকদার সকল মানুষের তালিকা হযরত যায়েদ (রাঃ)-ই প্রস্তুত করেছিলেন। ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) "কিতাবুল খিরাজে" লিখেছেন, হযরত ওমর (রাঃ) আনসারদের বৃত্তি বন্টনের দায়িত্ব বিশেষ করে হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর ওপর অর্পণ করেছিলেন। তিনি এ কাজ কুবা থেকে শুরু করেছিলেন। তার পর বনু আবদিল আশহালকে বৃত্তি দেন। অতপর আওসের অন্যান্য শাখা, তারপর খাযরাজ গোত্র এবং সর্বশেষে নিজের বৃত্তি নির্ধারণ করেন।

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর শাহাদাতের পর ২৪ হিজরতে হযরত ওসমান জুনুরাইন (রাঃ) খলিফার আসনে সমাসীন হলেন। এ সময় তিনিও হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর মর্যাদা ও পদ বহাল রাখলেন। ৩১ হিজরীতে তিনি হযরত যায়েদ (রাঃ)-কে মদীনা মুনাওয়ারার কেন্দ্রীয় বাইতুল মালের অফিসার নিয়োগ করলেন। তিনি এ পদে কয়েক বছর অধিষ্ঠিত ছিলেন। হজ্ব উপলক্ষে আমীরুল মু'মিনিন মক্কা গমনের সময় খিলাফতের কাজ-কারবার হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর হাতে ন্যস্ত করে যেতেন। হযরত ওসমান জুনুরাইন (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে ফিতনা-ফাসাদের আগুন প্রজ্বলিত হয়ে উঠলো। হযরত যায়েদ (রাঃ) এ সময় সামর্থ অনুযায়ী আমীরুল মু'মিনিনকে সমর্থন দিলেন এবং আনসারদেরকে তার সাহায্যের উদ্দেশ্যে অগ্রসর করার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু পরিস্থিতি এমন রূপ পরিগ্রহ করেছিল যে, তার কোন প্রচেষ্টা সফল হয়নি এবং আমিরুল মু'মিনিনকে বিদ্রোহীরা শহীদ করে ফেললো। কতিপয় বর্ণনায় আছে যে, হযরত যায়েদ (রাঃ) এবং শহীদ খলিফার মধ্যে এত গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল যে মানুষ তাকে ওসমানী বলতো।

হযরত ওসমান গনি (রাঃ)-এর শাহাদাতের পর হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু খিলাফতের দায়িত্ব প্রাপ্ত হলেন। তাঁর শাসনামলেই উষ্ট্র এবং সিফ্ফীনের দুঃখজনক যুদ্ধ সংঘটিত হলো। হযরত যায়েদ (রাঃ) এ সকল যুদ্ধে যদিও হযরত আলী (রাঃ)-এর সমর্থক ছিলেন না তথাপি তিনি তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন এবং তাঁর ফজিলত ও কামালিয়তের প্রকাশ্য স্বীকৃতি দিতেন।

www.amarboi.org

হযরত যায়েদ (রাঃ)–এর বয়স ৫৬ বছর হয়েছিল। ঠিক এমনি সময় প্রকৃত স্রষ্টার নিকট থেকে ডাক এলো এবং ৪৫ অথবা ৪৬ হিজরীতে তিনি আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেলেন। তাঁর ওফাতের খবর প্রচারিত হলে লোকজন শোকে শোকাভিভূত হয়ে পড়লো। সে সময় আমীর মাবিয়ার পক্ষ থেকে মারওয়ান ইবিনুল হাকাম মদীনার গবর্নর ছিল। সেই নামাযে জানাযা পড়ালো। রাসূল (সাঃ)–এর কবি হযরত হাস্‌সান বিন ছাবিত সে সময় জীবিত ছিলেন। তিনি হযরত যায়েদ (রাঃ)–এর ইন্তেকালে একটি মরছিয়া লিখে ফেললেন।

হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) তাঁর ওফাতের খবর শুনলেন এবং তাঁর মুখ দিয়ে নির্দ্বিধায় বেরিয়ে এলো "আজ জ্ঞানের সমূদ্র ওঠে গেল।"

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) জানাযা এবং দাফন কাজে শরীক ছিলেন। যখন হযরত যায়েদ (রাঃ)–কে দাফন করা হলো তখন তিনি শোকাভিভূত হয়ে বললেন, "দেখ, ইলম এ ভাবেই চলে যায়। আজ ইলমের একটি অংশ দাফন হয়ে গেল।"

হযরত যায়েদ (রাঃ) মৃত্যুকালে ১১টি পুত্র রেখে যান। ইলম ও ফজিলতের দিক দিয়ে তারা অত্যন্ত উঁচু মর্যাদায় সমাসীন ছিলেন। এক পুত্র খারেজা (রাঃ) "সাত ফকিহর অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকেন। পৌত্ররাও জ্ঞানের জগতে অত্যন্ত নামকরা ব্যক্তিত্ব ছিলেন। হযরত যায়েদ (রাঃ)–এর স্ত্রীর নাম ছিল জামিলা (রাঃ)। তাঁর কুনিয়ত ছিল উম্মুল অলা এবং উম্মে সায়াদ এবং তিনি ছিলেন মশহুর সাহাবী হযরত সায়াদ (রাঃ) বিন রবি আনসারীর (ওহোদের শহীদ) কন্যা।

হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন ছাবিত ছিলেন মহৎ জ্ঞানের অধিকারী। রাসূল (সাঃ)–এর একটি ইরশাদ থেকেই তাঁর মহৎ জ্ঞানের অনুমান করা যায়। প্রিয় নবী (সাঃ) বলেছিলেন, "আমার উম্মাতের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ফারায়েজ সম্পর্কিত জ্ঞানের অধিকারী হলো যায়েদ বিন ছাবিত (রাঃ)।"

ফারায়েযের ইলমে সবচেয়ে জটিল বিষয় হলো উত্তরাধিকার আইন। কুরআনে করিমে মিরাছ এবং ওদিয়তের বড় বড় মাসয়ালা সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু মানবীয় সমাজে এ ক্ষেত্রে আশ্চর্য এবং অভাবিতপূর্ব পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। এ সকল সমস্যা সমাধানের প্রশ্নে যেখানে কুরআনে হাকিমের নির্দেশাবলী মৌলিক মর্যাদা সম্পন্ন সেখানে রাসূলে আকরাম (সাঃ)–এর নির্দেশাবলী এবং বড় বড় সাহাবার সিদ্ধান্ত সমূহ ও ফতওয়াবলীও সামনে রাখা অত্যাবশ্যক। ইলমে ফারায়েয প্রকৃতপক্ষে ফিকাহরই একটি শাখা। হযরত যায়েদ (রাঃ)–এর কুরআন, হাদীস এবং ফিকাহতে এত গভীরতা

www.amarboi.org

ছিল যে, ইলমে ফারায়েযে তিনি বিশেষজ্ঞ বলে খ্যাত ছিলেন। এ ফজিলত বা মর্যাদার কারণেই তিনি রাসূল (সাঃ)-এর যুগেই মুফতির পদে আসীন হন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) ও হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর শাসনামলেও তিনি মদীনা মুনাওয়ারার মুফতী ছিলেন। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর নিকট তাঁর মর্যাদা এমন ছিল যে, তিনি হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর মদীনায় অবস্থানকে মদীনাবাসীদের জন্য আবশ্যিক মনে করতেন। তিনি বলতেন, "মদীনাবাসী যায়েদ (রাঃ)-এর জ্ঞানের মুখাপেক্ষী। কেননা তাঁর নিকট যে বস্তু রয়েছে তা অন্য কারো কাছে নেই।" এ কারণেই তিনি হযরত যায়েদ (রাঃ)-কে মদীনার বাইরে কখনো কোন পদে নিয়োগ করেননি। হযরত ওমর (রাঃ) সিরিয়া তাশরিফ নেয়ার পর জাবিয়া নামক স্থানে হাজার হাজার মানুষের সম্মুখে ভাষণ দেয়ার সময় বলেছিলেনঃ কারো যদি ফারায়েয সম্পর্কে কোন কিছু জানতে হয় অথবা প্রশ্ন করতে হয় তাহলে সে যেন যায়েদ (রাঃ) বিন ছাবিতের নিকট যায়।

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) স্বয়ং ইলম ও ফজিলতের দু'সমুদ্রের সম্মিলন স্থল ছিলেন। তিনিও হযরত যায়েদ (রাঃ) থেকে অনেক মাসায়ালার ফতওয়া জেনে নিতেন। তাবকাতে ইবনে সায়াদে তার এ বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে যে, যায়েদ ফারুকী খিলাফতের সমুদ্র ছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) সমগ্র মানুষকে বিভিন্ন ছোট ও বড় শহরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং ফতওয়া প্রদান থেকে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু যায়েদ (রাঃ) মদীনাতুন নবী (সাঃ)-তে বসে মদীনাবাসী এবং অন্যান্য লোকদেরকে ফতওয়া দিতেন।

তাবেয়ীন সরদার হযরত সাঈদ (রাঃ) বিন মুছাইয়িব যখনই কোন কঠিন মাসয়ালার সম্মুখীন হতেন তখনই তিনি তা হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর ইজতিহাদ এবং ফায়সালার আলোকে সমাধান করতেন। তিনি বলতেন, যায়েদ (রাঃ) বিন ছাবিত সিদ্ধান্তাবলী সম্পর্কে বেশী অবহিত ছিলেন এবং যেসকল মাসয়ালার ব্যাপারে রাসূল (সাঃ)-এর কোন ইরশাদ অথবা সিদ্ধান্ত নেই তা বর্ণনার সময় তিনি সবচেয়ে বেশী অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিতেন।

দারুল হিজরার ইমাম হযরত মালিক (রাঃ) বিন আনাছ বলতেন, হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর পর যায়েদ (রাঃ) বিন ছাবিত মদীনা মুনাওয়ারার ইমাম ছিলেন।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) ফারায়েজের সকল মাসয়ালায় হযরত যায়েদ (রাঃ)-এর অনুসরণ করতেন। কুরআনী বিদ্যায় হযরত যায়েদ (রাঃ) ফারায়েয ছাড়া কিরাতেও গভীরতা রাখতেন। ইমাম শা'বী (রঃ) বলেছেন, "যায়েদ (রাঃ) ফারায়েয ছাড়া কিরাতেও বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন" সাইয়েদুল কুররা হযরত উবাই (রাঃ) বিন কা'ব আনসারীর জীবদ্দশায় তাঁর পূর্ণ খ্যাতি লাভ হয়নি। কিন্তু তাঁর ইন্তিকালের পর যায়েদ (রাঃ)-এর কিরাত সর্বজনগ্রাহ্য হয়। বস্তুতঃ তাঁর কিরাত কুরাইশের কিরাতের অনুরূপ

www.amarboi.org

ছিল। এ জন্য তিনি সমগ্র ইসলামী জাহানে সুপ্রসিদ্ধি লাভ করেন। বর্তমানে ইসলামী দুনিয়াতে যে কিরাত প্রচলিত আছে তা হযরত যায়েদ (রাঃ)–এরই কিরাত। প্রিয় নবী (সাঃ)–এর যুগে হযরত যায়েদ (রাঃ) বেশীর ভাগ সময় নবী (সাঃ)–এর নিকটে কাটিয়েছেন। কিন্তু তিনি হাদীস বর্ণনায় অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। এ জন্য তাঁর নিকট থেকে শুধু ৯২ টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে ৫টি হাদীস ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) ঐকমত্য পোষণ করেন। তাঁর হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে হযরত উম্মে সা'দ (স্ত্রী) ব্যতীত হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ), হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ), হযরত আনাস (রাঃ) বিন মালিক, হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) এবং হযরত সাহাল (রাঃ) বিন সাদের মত মহান সাহাবী অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। তাবেয়ীদের মধ্যে হযরত সাঈদ (রাঃ) বিন মুসাইয়িব (রঃ), আবান বিন ওসমান (রাঃ), কাসেম (রঃ) বিন মুহাম্মাদ বিন আবুবকর (রাঃ), খারেজা (রঃ) বিন যায়েদ, আতা' (রঃ) বিন ইয়াসার, তাউস (রঃ), সাহাল (রঃ) বিন আবি হাছমা, বছর (রঃ) বিন সাঈদ এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তাফাক্কুহ ফিদ দীন অর্থাৎ দীনের সমঝের ব্যাপারেও হযরত যায়েদ (রাঃ) অত্যন্ত উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন ছিলেন এবং সাহাবাদের মধ্যকার মুজতাহিদ হিসেবে পরিগণিত হতেন। তিনি শুধুমাত্র রাসূল (সাঃ)–এর যুগেই ফতওয়া দানের সুযোগ লাভ করেননি, বরং হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ), হযরত ওমর ফারুক (রাঃ), হযরত ওসমান (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত আমীর মাবিয়া (রাঃ)–এর খিলাফত কালেও মদীনার মুফতী ছিলেন। চরিতকাররা বর্ণনা করেছেন যে, হযরত যায়েদ (রাঃ)–এর ফতওয়ার সংখ্যা এত বেশী যে, তা একত্রিত করলে বড় বড় কয়েক ভলিউম হতে পারে। হযরত সাঈদ (রাঃ) বিন মুসাইয়িব (রাঃ) বলতেন, হযরত যায়েদ (রাঃ)–এর প্রতিটি ফয়সালার ব্যাপারে সকলেই ঐকমত্য পোষণ করতেন। হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন ছাবিত সেই চার সাহাবীর একজন যাঁদের বিদ্যা সর্বজন গ্রাহ্য ছিল। এ ক্ষেত্রে অপর তিনজন সাহাবী হলেন হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন মাসউদ, হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)। কুরআন, হাদীস এবং ফিকাহ ছাড়াও হযরত যায়েদ (রাঃ) অংক বিদ্যাতেও পারদর্শী। প্রথম প্রথম আরবদের অংক শাস্ত্রে কোন দখল ছিল না। এমনকি তারা এক হাজারের ওপর গণনাও জানতো না। কিন্তু হযরত যায়েদ (রাঃ) নিজের ধীশক্তি এবং মেধার মাধ্যমে এ শাস্ত্রে আশ্চর্যজনক পারদর্শীতা লাভ করেন। ইবনে সায়াদ (রাঃ) বলেছেন, প্রিয় নবী (সাঃ) হুনাইনের যুদ্ধে গনিমাতের মাল হযরত যায়েদ (রাঃ)–এর পরামর্শ অনুযায়ী বন্টন করেছিলেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৯ বছর। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)–এর খিলাফতকালে ইয়ারমুকের যুদ্ধে গনিমাতের মাল মদীনায় পৌঁছলে তিনি তা বন্টনের দায়িত্ব হযরত যায়েদ (রাঃ)–এর ওপরই ন্যস্ত

www.amarboi.org

করেন। এ কাজ তিনি অত্যন্ত সুচারুরূপে সম্পাদন করেন। রমাদার দুর্ভিক্ষকালে হযরত আমর (রাঃ) ইবনুল আছ খাদ্য ভর্তি ২০টি জাহাজ মিশর থেকে প্রেরণ করেন। এ সময় হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) হযরত যায়েদ (রাঃ) এবং আরো কতিপয় সাহাবীকে সাথে নিয়ে তৎকালীন নিকটবর্তী জার নামক এক বন্দরে গমন করেন এবং খাদ্য গ্রহণ করে দু'টি গুদাম ভর্তি করান। অতপর দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত লোকদের একটি তালিকা তৈরীর জন্য তিনি হযরত যায়েদ (রাঃ)–কে নির্দেশ দিলেন, এ তালিকায় প্রত্যেক ব্যক্তির নাম এবং প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণের কথাও উল্লেখ করতে বলা হয়। হযরত যায়েদ (রাঃ) এক রেজিষ্টার তৈরী করেন। এ রেজিষ্টারে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত লোকদের অবস্থার বর্ণনা দেয়া হয় এবং প্রত্যেকের মধ্যে কাগজের চেক বন্টন করেন। এ চেকের নীচে আমীরুল মুমিনিনের সীলমোহর অংকিত ছিল। চেক দেখিয়ে তারা খাদ্য নিতে পারতো। ইসলাম প্রতিষ্ঠার পর এ প্রথম কাগজের চেক জারী করা হয়। আর এটা হতে পেরেছিল হযরত যায়েদ (রাঃ)–এর মেধার কারণেই।

ফজিলত এবং মর্যাদার কারণেই সকল সাহাবী (রাঃ) হযরত যায়েদ (রাঃ)–কে সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন। জ্ঞান সমুদ্র হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) তাঁকে এক মহান আলেম হিসেবে মনে করতেন। একবার যায়েদ (রাঃ) ঘোড়ায় সওয়ার হলেন। এ সময় হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ঘোড়ার লাগাম ধরলেন। হযরত যায়েদ (রাঃ) বললেন, এ্যাঁ, এ্যাঁ, আপনি এটা কি করছেন। আপনি হলেন রাসূল (সাঃ)–এর চাচার পুত্র এবং আমার শ্রদ্ধার পাত্র। তিনি বললেন, ওলামা এবং সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের শান হলো তাদের লাগাম ধরা।

আমীর মাবিয়া (রাঃ)–তাঁর নিকট থেকে যা কিছু শুনতেন তারই বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। এভাবে অন্য সাহাবীও তাঁর জ্ঞানের পূর্ণতার স্বীকৃতি দিতেন এবং প্রশংসা করতেন।

হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন ছাবিত অত্যন্ত পবিত্র এবং পসন্দনীয় চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তাঁর চরিত্রে ইসলামে অগ্রবর্তী হওয়া, জ্ঞান পিপাসা, রাসূল প্রেম, সুন্নাতের পায়রবী, হক কথন এবং বিনয় প্রভৃতি গুণাবলী স্থান পেয়েছিল ১১ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সাথে সাথে অত্যন্ত উৎসাহ–উদ্দীপনার সাথে জ্ঞান অর্জনে ব্যাপৃত হয়ে পড়েন। এমনকি জ্ঞানের মর্যাদার দিক থেকে বড় বড় সাহাবীর কাতারে শামিল হন এবং রাসূল (সাঃ)–এর সামনে ফতওয়া দানের যোগ্য বলে বিবেচিত হন। প্রিয় নবী (সাঃ)–এর প্রতি তাঁর ছিল অগাধ শ্রদ্ধা এবং গভীর ভালোবাসা। এ জন্য তিনি বেশীর ভাগ সময় নবী (সাঃ)–এর দরবারে কাটাতেন। অতি প্রত্যুষে ঘুম থেকে জেগে সোজা রাসূল (সাঃ)–এর পবিত্র খিদমতে পৌঁছে যেতেন। প্রত্যুষের এ কাজের জন্য তিনি বলতেন নবীজি (সাঃ)



www.amarboi.org

এর সাথে সেহরী খাওয়া এবং রোযা রাখার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। বিশ্বনবী (সাঃ)-ও তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। তাকে নিজের হুজরা মোবারকে ডেকে নিতেন এবং নামাযের জন্য নিজের সাথে মসজিদে নিয়ে যেতেন। কোন কোন সময় হুযুর (সাঃ) তাকে নিজের পাশে বসাতেন। ওহী নাযিল হওয়ার সাথে সাথে তাকে দিয়ে লিখাতেন। কখনো কখনো হুযুর (সাঃ) ইবরানী ভাষায় পত্র পেতেন। এ পত্র তিনি ইহুদীদের দিয়ে পড়িয়ে নিতেন। এ অবস্থা তাঁর নিকট খুব সন্তোষজনক ছিল না। কেননা ইহুদীরা পত্রের বিষয়াবলী জেনে মুসলমানদের জন্য ভয়ের কারণ হতে পারতো। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত যায়েদ (রাঃ)-কে বললেন, তুমি ইবরানী ভাষা শিখে নাও। তিনি রাসূল (সাঃ)-এর নির্দেশ পালনার্থে রাত দিন একাকার করে ফেললেন এবং ১৫ দিনের মধ্যে ইবরানী ও সুরিয়ানী ভাষায় এত দক্ষতা অর্জন করলেন যে, সে সব ভাষায় লিখিত পত্রাবলী খুব সহজে পড়ে নিতেন এবং তার জবাবও লিখে দিতেন।

হযরত যায়েদ (রাঃ) সুন্নাতের খুব অনুগত ছিলেন। নিজেও হুযুর (সাঃ)-এর নির্দেশাবলীর ওপর আমল করতেন এবং অন্যদেরকেও সেভাবে আমল করার নির্দেশ দিতেন। কাউকে সুন্নাত পরিপন্থী কোন কাজ করতে দেখলে চুপ থাকতে পারতেন না এবং তা নিষেধ করতেন। মুসনাদে আহমদ (রঃ)-এ আছে যে, একবার হযরত শুরাহবিল বিন সায়াদ (রাঃ)-কে মদীনা মুনাওয়ারার এক বাগানে জাল পাততে দেখে উচ্চৈস্বরে ডেকে বললেন, শুরাহবিল! এটা হারাম জমিন। এখানে শিকার করা নিষিদ্ধ। আরেকবার শুরাহ বিল (রাঃ)-কে বাজারে একটি পাখী ধরতে দেখলেন। এতে তিনি খুব ক্রোধান্বিত হলেন। শুরাহ বিল (রাঃ)-এর নিকট থেকে পাখী ছিনিয়ে নিয়ে উড়িয়ে দিলেন এবং তাঁকে থাপ্পড় মেরে বললেন, হে নিজের নফসের দুশমন। তোমার কি জানা নেই যে, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) মদীনা মুনাওয়ারাহকে হারাম ঘোষণা করেছেন।

মদীনার গবর্নর মারওয়ান ইবনুল হাকামের সাথে তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। কিন্তু এ সম্পর্ক তাঁর স্পষ্টবাদিতায় বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। একবার জালিলুল কদর সাহাবী হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) সাহাবীদের মর্যাদার ব্যাপারে মারওয়ানের সামনে একটি হাদীস বর্ণনা করলেন। মারওয়ান তা মানলো না এবং হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা বর্ণনার অভিযোগ আনলো। সে সময় হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন ছাবিত এবং হযরত রাফে বিন খুদাইজও মারওয়ানের পাশে বসে ছিলেন। তাঁরা উভয়ই তৎক্ষণাৎ হযরত আবু সাঈদ (রাঃ)-এর বক্তব্যের সত্যতা স্বীকার করলেন এবং মারওয়ানের মতকে ভুল বলে আখ্যায়িত করলেন।

সহীহ বুখারীতে আছে যে, মাগরিবের নামায পড়ানোর সময় ছোট ছোট সূরা পড়া মারওয়ান একটি নিয়ম বানিয়ে নিয়েছিল। হযরত যায়েদ (রাঃ) বাধা দিলেন এবং

www.amarboi.org

বললেন, তুমি কি নিয়ম বানিয়ে রেখেছ। রাসূলে করিম (সাঃ) মাগরিবের নামাযে লম্বা সূরা পাঠ করতেন।

একবার হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) এক সিরীয় ব্যবসায়ীর নিকট থেকে যাইতুনের তেল কিনলেন মাল সেখানে রাখা অবস্থাতেই অন্য একজন ক্রেতা সৃষ্টি হলো। সে ইবনে ওমর (রাঃ)-কে বললো, এত লাভ দেব, আমার নিকট বিক্রি করে দিন। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) তাতে রাজী হয়ে গেলেন। কে যেন পিছন দিক থেকে তাঁর হাত ধরে বললেন, আবু আবদুর রহমান! প্রিয় নবী (সাঃ) এ ধরনের করা থেকে নিষেধ করেছেন। প্রথমে মাল এখান থেকে সরাও। তারপর বিক্রি কর।

একবার উম্মুল মু'মিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) যোবায়ের (রাঃ)-এর পরিবারের নিকট জানান যে, একদিন হুযুর (সাঃ) তাঁর নিকট আছরের পর দু'রাকায়াত নামায পড়ে ছিলেন। তাঁরা এটাকে সুন্নাত মনে করে পড়া শুরু করলেন। হযরত যায়েদ (রাঃ) এ কথা জানতে পেরে বললেন, আল্লাহ পাক আয়েশা (রাঃ)-কে মাফ করুন। প্রকৃত ঘটনা এ ছিল যে, দ্বিপ্রহরের সময় কতিপয় গ্রামবাসী হুযুর (সাঃ)-এর নিকট এলেন তাঁরা তাঁর নিকট মাসয়ালা জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে জোহরের সময় হয়ে পড়লো। তিনি শুধুমাত্র জোহরের ফরয পড়ে গৃহে চলে গেলেন। সেখানে জোহরের পরিত্যক্ত দুই রাকায়াত সুন্নাতের কথা স্মরণ হলে তিনি তা আছরের পর পড়ে নিলেন। নচেৎ হুযুর (সাঃ) আছরের পর নামায পড়া নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন।

মহান মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবী হযরত রাফে (রাঃ) বিন খুদাইজ একবার লোকদের নিকট বর্ণনা করলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ক্ষেত ভাড়া প্রদান নিষেধ করেছেন। ফলে লোকদের মধ্যে ভুল ধারণা সৃষ্টি হতে লাগলো। হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন ছাবিত শুনে বললেন, আল্লাহ পাক রাফে'কে ক্ষমা করুন। আমি সে হাদীসটির তাৎপর্য তার চেয়ে বেশী জানি, ঘটনা এ ছিল যে, ক্ষেতের ভাড়া সম্পর্কিত ব্যাপার নিয়ে দু' ব্যক্তি বিবাদ করছিল। হুযুর (সাঃ) তাদেরকে ঝগড়া করতে দেখে বললেন, যদি অবস্থা এ হয় (অর্থাৎ ক্ষেত ভাড়া দান ঝগড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়) তাহলে ক্ষেত ভাড়া দান ঠিক নয়। রাফে' (রাঃ) হুযুর (সাঃ)-এর ইরশাদের শুধুমাত্র শেষ অংশ শুনে ছিলেন এবং তাই লোকদেরকে বলা শুরু করে দিয়েছিলেন।

প্রকৃতিগত ভাবে হযরত যায়েদ (রাঃ) নীরবতা পছন্দ করতেন এবং মজলিশে অত্যন্ত গাম্ভীর্যের সাথে বসতেন। তাবয়ীদের জন্য সমসাময়িক শাসকদের নিকটও গমন করতেন। একবার মারওয়ানের মহল থেকে বের হয়ে শিষ্যরা জিজ্ঞেস করলো হযরত মারওয়ানের নিকট কিভাবে গিয়েছিলেন? তিনি বললেন, সে কতিপয় হাদীস জিজ্ঞেস করেছিল। আমি তাকে বললাম, এমন তিনটি জিনিস রয়েছে যা মুসলমানের অন্তরকে

www.amarboi.org

জীবিত রাখে। প্রথম, প্রতিটি কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রতি দৃষ্টি রাখা। দ্বিতীয়, শাসক এবং আমীরদেরকে নসিহত করা এবং তৃতীয় হলো জামায়াতবদ্ধ হয়ে থাকা।

হযরত যায়েদ (রাঃ)–এর চরিত্রে বিনয় পুরোপুরিই বিদ্যমান ছিল। প্রত্যেকের সাথেই হাসি মুখে মিলিত হতেন এবং বিনয় ও বুদ্ধিমত্তার সাথে প্রশ্নের জবাব দিতেন। অবশ্য জ্ঞানের গভীরতার কারণে কোন কোন সময় নিজের বড়ত্ব প্রকাশ করে ফেলতেন। তিনি অত্যন্ত প্রভাবশালী বুযর্গ মানুষ ছিলেন। কিন্তু মুসলমানদের পারস্পারিক বিবাদে পক্ষাবলম্বন করা পসন্দ করতেন না। ফিতনা থেকে তিনি নিজেকে সব সময়ই বাঁচিয়ে রেখেছিলেন এবং মুসলমানদের পারস্পরিক বিবাদ ও বিরোধে কোন সম্পর্ক রাখতেন না।

—0—

www.amarboi.org

# হযরত ছারমাহ (রাঃ) বিন আবি আনাছ আনসারী

বিশ্ব নবী (সাঃ)-এর নবুয়াত প্রাপ্তির পূর্বে যদিও সকল আরববাসী সামগ্রিকভাবে কুফর, শিরক এবং নাফরমানীর অক্টোপাশে আবদ্ধ ছিল। তবুও তাদের মধ্যে কিছু এমন লোকও ছিল যারা তাওহীদপন্থী এবং ইবরাহীমের পথ অনুসরণকারী ছিলেন। আবার কতিপয় এমন লোকও ছিলেন যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদাত করতেন না। কিন্তু তারা আবার কোন শরীয়াতের অন্তর্ভুক্তও ছিলেন না। তারা তাওহীদ ও ইবাদাতে ইলাহীর আকাংখায় শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের অপেক্ষায় ছিলেন। ইতিহাসে এ ধরনের সাহাবীকে হুনাফা উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। এ ধরনের সৌভাগ্যবান সাহাবীর সংখ্যা আঙ্গুলে গোনা যায়। তবে তারা মক্কা ও আরবের অন্যান্য এলাকায় ছিলেন। এমনকি ইয়াছরাবেও তাদের অস্তিত্ব ছিল। ইয়াছরাবের হুনাফার মধ্যে আবু কায়েস ছারমাহ (রাঃ) বিন আবি আনাস অধিক বয়স ও পবিত্রতার জন্য বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। খাযরাজ গোত্রের সম্ভ্রান্ত শাখা বনু নাজ্জারের সাথে তিনি সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। তাঁর বংশনামা হলোঃ ছারমাহ (রাঃ) বিন আবি আনাস কায়েস বিন মালিক বিন আদী বিন আমর বিন গানাম বিন আদী বিন নাজ্জার।

আল্লাহতায়ালা হযরত ছারমাহ (রাঃ)-কে সৎ স্বভাব দান করেছিলেন। যৌবনকালেই তিনি মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করেছিলেন এবং দুনিয়াদারী ত্যাগ করে সন্ন্যাসীত্ব গ্রহণ করেন। সেই সময় তিনি ক্যানভাস বা চটের পোশাক পরিধান করতেন এবং নির্জনে বসে বসে ধ্যানে তন্ময় থাকতেন। কিছুদিন এ একাকীত্ব ও নির্জনে কাটানোর পর দুনিয়ার ধান্ধায় অংশগ্রহণ শুরু করেন। কিন্তু মূর্তিপূজা এবং অপকর্ম থেকে সবসময়ই বিরত থাকতেন। হকপন্থীদের মত সহবাসের পর দেহ শুদ্ধির জন্য গোসল করতেন এবং এমন ঘরে প্রবেশ করতেন না যে ঘরে হায়েজা মহিলা অথবা কোন অপবিত্র মানুষ উপস্থিত থাকতেন। একবার তিনি তৎকালীন সমাজে প্রচলিত ধর্মের মধ্য থেকে যে ধর্ম সঠিক অর্থে কল্যাণের দিকে পথ প্রদর্শন করে তা গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। বস্তুতঃ তিনি এ অবস্থায় খৃষ্টান ধর্মের প্রতি আকর্ষিত হয়েছিলেন। কিন্তু যখন তিনি দেখলেন যে, তৎকালীন খৃষ্টানরা নিজের নবীকে পরিবর্তন করে তাতে মূর্তিপূজা আমদানি করে নিয়েছে তখন তিনি খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ থেকে বিরত হলেন এবং দ্বীনে ইবরাহীমী গ্রহণ করলেন।

www.amarboi.org

যদিও পথ প্রদর্শক কেউ ছিল না কিন্তু তিনি নিজের প্রজ্ঞা দূরদর্শীতার ভিত্তিতে এক খোদার ইবাদাতে মশগুল হয়ে যান। এ উদ্দেশ্যে তিনি একটি ইবাদাতখানাও তৈরী করলেন। ইবাদাতখানাটিকে খুব পাক পবিত্র রাখতেন এবং গোসল ওয়াজিব হওয়া ব্যক্তিকে তাতে প্রবেশ করতে দিতেন না। হাফিজ ইবনে হাজার (রঃ) বলেছেন, তিনি নিজের ইবাদাতের ব্যাপারে বলেছেনঃ "আমি ইবরাহীম (আঃ)-এর রবের ইবাদাত করি।"

এভাবে জীবন কাটাতে কাটাতে হযরত ছারমাহ (রাঃ)-এর বয়স একশ বছরের বেশী হয়ে গিয়েছিল। পবিত্র চরিত্র এবং বার্ধক্যের কারণে তিনি মদীনাবাসীর অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র ছিলেন।

নবী (সাঃ)-এর হিজরাতের কিছুকাল পূর্বেই ইয়াছরাবে ইসলাম চর্চার বিস্তার লাভ ঘটে এবং লোকজন শেষ নবী (সাঃ)-এর কথা উল্লেখ করতে থাকে। ফলে হযরত ছারমাহ (রাঃ)-এর অন্তর সাক্ষ্য দিয়ে ফেলল যে, মক্কায় যে পবিত্র ব্যক্তিত্ব নবুয়াতের দাবী করেছেন তিনি আল্লার সত্য রাসূল এবং সত্য দ্বীনের তাবলীগ ও প্রসারের জন্যই প্রেরিত হয়েছেন। তিনি রাসূল (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ঈমান আনয়নের জন্য অস্থির হয়ে পড়লেন। কিন্তু বার্ধক্য ও ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে মক্কা মুয়াজমায় সফর করে যাওয়া তার পক্ষে কোন ক্রমেই সম্ভব ছিল না। তিনি হুযুর (সাঃ) কবে মদীনা আসবেন সে জন্য অস্থির চিত্তে পথপানে চেয়ে থাকতেন। তখন তাঁর জীবনের একমাত্র কামনা, বাসনা এবং আরাধ্য বস্তুই ছিল পয়গাম্বরে আখিরুজ্জামান (সাঃ)-কে নয়নভরে দেখে চোখ এবং অন্তরকে সুশীতল করা।

অবশেষে সেই শুভক্ষণ এলো। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ইয়াছরিবের মাটিতে শুভ পদার্পন করলেন। সে সময় ইয়াছরাব "মদীনাতুন নবী" রূপে আত্মপ্রকাশ করলো। প্রিয় নবী (সাঃ)-এর মদীনা শুভাগমনে হযরত ছারমাহ (রাঃ) যিন আবি আনাছ আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। অত্যন্ত আবেগ ভরা অন্তরে নবী করিম (সাঃ)-কে মোবারকবাদ জানালেন। ঈমান আনয়ন এবং বাইয়াত গ্রহণ করে নিজেকে ধন্য করলেন এবং এ স্থায়ী সম্পদ লাভে আল্লাহর দরবারে সিজদাহ জ্ঞাপন করলেন।

টীকা ১। ইসলাম গ্রহণের সময় হযরত ছারমাহ (রাঃ)-এর বয়স প্রায় ১০৮ বছর ছিল। বার্ধক্যের কারণে [illegible] ছিলেন। [illegible] বেশী [illegible] তিনি যুদ্ধে [illegible] ছিলেন।

আল্লাহপাক হযরত ছারমাহ (রাঃ)–কে কাব্য রচনার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। তিনি মগ্রোত্রের একজন নামকরা কবি ছিলেন। নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা তাঁর অনেক কবিতা নিজেদের গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। এ সকল কবিতা পড়ে মনে হয় যে, তিনি তৎকালীন যুগের শেখ সাদী ছিলেন। কেননা তাঁর অধিকাংশ কবিতাতেই খারপ কাজ থেকে পরিত্রাণ এবং ভাল কাজের প্রতি অগ্রবর্তী ভূমিকা পালনের নির্দেশ রয়েছে। আল্লাহর আজমত ও মহানত্ব বর্ণনার সাথে সাথে তিনি মূর্তিপূজা, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা, হারাম খাওয়া এবং ধোঁকাবাজী প্রভৃতি থেকে বেঁচে থাকা ও আত্মীয়দের সাথে ভালো ব্যবহার করা, ইয়াতিম–গরীবদের সাহায্যের ওপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন।

আল্লামা ইবনে আছির (রঃ) "উসুদুল গাব্বাহ" গ্রন্থে লিখেছেন, "ছারমাহ (রাঃ) বিন আবি আনাছের অধিকাংশ কবিতা হিকমত ও নসীহতে পূর্ণ।"

ঈমানের প্রস্রবণে অবগাহনের পর তিনি এক শক্তিশালী কাসিদাহ বলেন। তাতে তিনি মক্কার কুরাইশদের বঞ্চনাপূর্ণ ভাগ্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ এবং মদীনাবাসীদের সৌভাগ্যের গর্ব করলেন।

ইমাম হাকিম (রঃ) এবং ইবনে আসির (রঃ) বর্ণনা করেছেন, উম্মাহর জ্ঞানের সমুদ্র হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হযরত ছারমাহ (রাঃ) বিন আবি আনাছের নিকট যেতেন এবং তাঁর কবিতা শ্রবণ করতেন।

হযরত ছারমাহ (রাঃ) বিন আবি আনাছ শতায়ু হওয়া সত্ত্বেও পবিত্র রামাদানের রোযা ছাড়তেন না। বরং রোযা অবস্থায় মাঠে নিজের ক্ষেতে কাজ করতে চলে যেতেন। একদিন রোযা অবস্থায় সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে এলেন এবং ইফতারের জন্য খাবার চাইলেন। খাবার আসতে দেরী হওয়ায় তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। কেননা রোযা এবং সারা দিনের পরিশ্রমে তিনি অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। সে সময় নিয়ম ছিল যে, ইফতারের সময় যদি কেউ ঘুমিয়ে পড়ে তাহলে তাকে সেই রাত এবং পরের দিনও রোযা রাখতে হত। তাঁর স্ত্রী খাবার নিয়ে এসে তাঁকে নিদ্রামগ্ন দেখে বললেন, "তোমার ওপর আফসোস।" খুব ভোরে ঘুম থেকে জাগরিত হয়ে খুব দুর্বলতা অনুভব করতে লাগলেন। এমন কি বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। প্রিয় নবী (সাঃ) এ ঘটনার কথা শুনে এ আয়াত (অন্য মতে এ আয়াত নাযিল হয়) পাঠ করলেনঃ "এবং খাও ও পান কর এমনকি যতক্ষণ না রাতের কালো রেখা থেকে সুবহে সাদেকের সাদা রেখা পরিষ্কার রূপে দেখা দেয়।"

প্রিয় নবী (সাঃ)–এর পবিত্র মুখ থেকে এ আয়াত শুনে মানুষের মধ্যে খুশীর বন্যা বয়ে গেল। হাফিজ ইবনে হাজার (রঃ) বলেন, এ আয়াতের শানে নুযুলের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। বিশেষ করে এ আয়াত কোন সাহাবীকে উপলক্ষ করে নাযিল হয়েছে

www.amarboi.org

সে ব্যাপারে এ আয়াতের শাব্দিক অর্থ হলোঃ তোমরা সে সময় পর্যন্ত খানা পিনা কর যতক্ষণ পর্যন্ত সাদা সূতা এবং কালো সূতার মধ্যে পার্থক্য না করা যায়। এ আয়াত শুনে একজন সাহাবী নিজের পায়ের আঙুলে একটি কালো ও অপর আঙুলে একটি সাদা সূতা বেঁধে নিয়েছিলেন। অন্য এক রাওয়ায়েতে আছে যে, সাহাবীটি বিছানার মাথার দিকে একটি কালো ও একটি সাদা সূতা রেখে দিল এবং যতক্ষণ পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ঠিকভাবে হত না ততক্ষণ খানা-পিনা করতেন। এ সময় মিনাল ফাজরি শব্দ নাযিল হয়। এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সাদা এবং কালো সূতার অর্থ আলো ও অন্ধকারের দু'টি রেখা।

হযরত ছারযাহ (রাঃ) একশ বিশ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

০০০

www.amarboi.org

# হযরত সাহাল (রাঃ) বিন হুনাইফ আনসারী

ওহুদের যুদ্ধে এক আকস্মিক দুঃখপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেল। এ আকস্মিকতায় মুসলমানদের মধ্যে বিশৃংখলা দেখা দিল এবং হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) শুধুমাত্র কয়েকজন জানবাজ সাহাবীসহ ময়দানে রয়ে গেলেন। এ সকল সাহাবীর মধ্যে একজন সুদর্শন সাহাবী রাসূল্লাহ (সাঃ)–কে কোন ক্ষতি থেকে বাঁচানোর জন্য সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললেনঃ "ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার মাতা–পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আপনি আমার আড়ালে দাঁড়ান। আল্লার কসম, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার জীবন আছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনাকে রক্ষা করবো এবং এখান থেকে আমার পা পিছু হটাবোনা।"

মুশরিকদের তরফ থেকে হুজুর (সাঃ)–এর দিকে যে তীর আসতে থাকলো তাতে তিনি বাধা দিতে থাকলেন এবং জবাবে নিজেও মুশরিকদের ওপর তীর নিক্ষেপ করতে থাকলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর এ আত্মোৎসর্গের আবেগ খুব পছন্দ করলেন। তিনি বার বার অন্যান্য সাহাবীকে বললেন, "তাকে তীর দাও। সে সাহাল।"

এ সাহাবী—যিনি ওহোদের যুদ্ধে নিজের জীবন হাতে রেখে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রাসূল (সাঃ) কে রক্ষা করেছিলেন এবং তাঁর সুনজর কেড়েছিলেন—তিনি ছিলেন হযরত সাহাল (রাঃ) বিন হুনাইফ আনসারী।

হযরত আবু সায়াদ সাহাল (রাঃ) বিন হুনাইফ আনসারীর সম্পর্ক ছিল আওস গোত্রের সাথে। তাঁর নসবনামা হলোঃ সাহাল (রাঃ) বিন হুনাইফ বিন ওয়াহিব বিন আকিম বিন ছায়ালাবা বিন হারিছ বিন মাজদায়াহ বিন আমর বিন জাশম বিন আওফ বিন আমর বিন আওফ বিন মালিক বিন আওস।

হযরত সাহাল (রাঃ) ছোট সহোদর হযরত ওসমান (রাঃ) বিন হুনাইফের সাথে হিজরাতে নববীর আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এভাবে তিনি আনসারের অগ্রবর্তী দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হিজরাতের কয়েক মাস পর ছিল

www.amarboi.org

নবী (সাঃ) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন কায়েম করেন। ইবনে সায়াদ (রাঃ)-এর বর্ণনা অনুসারে এ সময়ে হযরত সাহাল (রাঃ)-কে হযরত আলী কারামাল্লাহু ওয়াজহাহুর ভাই বানিয়েছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ চরিতকারের মত হলো, হুযুর (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-কে নিজের ভাই বলে আখ্যায়িত করেছিলেন।

হক ও বাতিলের প্রথম যুদ্ধ বদরে হযরত সাহাল (রাঃ) বিন হুনাইফ অংশ গ্রহণ করে বদরী সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

ওহোদের যুদ্ধে তিনি প্রচণ্ড বাহাদুরী প্রদর্শন করেন। চরম বিশৃংখলার মধ্যেও তিনি অটল ছিলেন। হাফিজ ইবনে হাজার (রঃ) বর্ণনা করেছেন, যেদিন তিনি মৃত্যুর হাতে বাইয়াত হয়েছিলেন। যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত তিনি শত্রুর ওপর অব্যাহতভাবে তীর নিক্ষেপ করতে থাকেন এবং হুযুর (সাঃ) অন্যান্য সাহাবীকে বলতে থাকেন যে, তাঁকে তীর দিতে থাকো। সে সাহাল।

ওহোদের যুদ্ধের পর তিনি পরিখার যুদ্ধেও বাহাদুরী প্রদর্শন করেন। ৬ষ্ঠ হিজরীতে বাইয়াতে রেদওয়ানে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। এরপর খায়বর, মক্কা বিজয়, হুনাইন, তায়েফ এবং তাবুকের যুদ্ধসমূহে রাসূল (সাঃ)-এর সহচর ছিলেন। হযরত সাহাল (রাঃ) যুদ্ধ সমূহে অংশগ্রহণের সাথে সাথে নবী (সাঃ) এর স্নেহও লাভ করতেন। হুযুর (সাঃ)-ও তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। আল্লাহ তায়ালা সুন্দর স্বভাবের সাথে সাথে রূপও দান করেছিলেন। তিনি অত্যন্ত সুদর্শন ছিলেন। কোন এক যুদ্ধে হুযুর (সাঃ)-এর সাথে ছিলেন। নিকটেই একটি নালা ছিল। তাতে গোসল করতে লাগলেন। একজন আনসারী সাহাবী তাঁর সুন্দর শরীর দেখে বলে ওঠলেন, "বাঃ বাঃ কি সুন্দর দেহ! আমি এত সুন্দর দেহ আর কখনো দেখিনি।" তিনি এ কথা বলতেই হযরত সাহাল (রাঃ) বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন। তাঁর সাথী দৌড়ে গিয়ে প্রচণ্ড জ্বরে শরীর উত্তপ্ত দেখতে পেলেন। উঠিয়ে তিনি তাকে সৈন্যবাহিনীর মধ্যে নিয়ে এলেন। প্রিয় নবী (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, "কি ব্যাপার?" সাহাবীটি ঘটনা বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন, "আশ্চর্য মানুষ নিজের ভাইয়ের শরীর অথবা মাল দেখে বরকতের দোয়া করে না। এ জন্যই নজর লাগে।" আল্লাহর রহমতে হযরত সাহল (রাঃ) তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠলেন।

রাসূল (সাঃ)-এর ওফাতের পর হযরত ওসমান জুন্নুরাইনের শাসনকাল পর্যন্ত সাহাল (রাঃ)-এর তৎপরতার ব্যাপারে চরিতকাররা কিছুই বলেননি। হযরত আলী (রাঃ)-এর শাসনকালে তাঁর নাম জনসমক্ষে আবার প্রকাশ পায়। হযরত

www.amarboi.org

সাহাল (রাঃ)-কে তিনি মদীনার আমীর নিয়োগ করেছিলেন। তাও স্বল্পকালীন সময়ের জন্য। কিছুদিন পর তিনি তাঁকে কূফা ডেকে পাঠান এবং তিনি মদীনা থেকে কূফা চলে যান।

উটের যুদ্ধের পর হযরত আলী (রাঃ) বিভিন্ন প্রদেশে গবর্ণর নিয়োগ করেন। তখন হযরত সাহাল (রাঃ)-কে হযরত আমীর মাবিয়া (রাঃ)-এর স্থানে সিরিয়ার গবর্ণর নিয়োগ করা হয়। কিন্তু সিরিয়ার ওপর আমীর মাবিয়া (রাঃ)-এর থাবা মজবুত ছিল। হযরত সাহাল (রাঃ) সিরীয় সীমান্তে অবস্থিত তাবুক নামক স্থানে পৌঁছে আমীর মাবিয়া (রাঃ)-এর সওয়ার পেলেন এবং তাঁকে ফিরে যেতে বাধ্য করা হলো। তিনি ফিরে এসে হযরত আলী (রাঃ)-কে বললেন, আমীর মাবিয়া (রাঃ) আপনার বিরোধিতার পথ বেছে নিয়েছেন এবং সিরিয়াবাসী তাঁর বাইয়াত করে নিয়েছে। ঘটনার পর আলী (রাঃ) এবং হযরত মাবিয়া (রাঃ)-এর মধ্যে সিফ্‌ফিনের যুদ্ধ শুরু হয়। এসময় হযরত সাহাল হযরত আলী (রাঃ)-এর পক্ষ থেকে যুদ্ধে পুরোপুরি অংশগ্রহণ করেন।

আবু হানিফাহ দিনাওয়ারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, যুদ্ধে একবার তিনি হেজাজবাসীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সে সময় হযরত আলী (রাঃ) তাঁকে পারস্যের আমীর নিয়োগ করেন। কিন্তু ইমামতের দায়িত্ব গ্রহণ করতেই তিনি কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হন এবং শক্তি প্রয়োগ করে তাঁকে পারস্য থেকে বের করে দেয়া হয়।

হযরত সাহাল (রাঃ) যদিও একজন বড় বাহাদুর ছিলেন। তবুও সিফ্‌ফিনের যুদ্ধে তিনি এক দলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সন্ধি আলোচনার পক্ষে মত প্রদান করেন। ফলে তারা তাঁকে বুজদিল হিসেবে আখ্যায়িত করে। তিনি এ কথা শুনে বলেছিলেনঃ

"তাদের মত ঠিক নয়। আমি বুজদিল বা কাপুরুষ নই। আমি যে কাজের জন্য তরবারী উঠিয়েছি তা আসান বা সহজ করে নিয়েছি। হুদাইবিয়ার দিন যদি তরবারী দিয়ে কাজ করা রাসূল (সাঃ)-এর মরজী বিরোধী না হতো তাহলে সেদিন আমি মুশরিকদের সাথে লড়াই করতে প্রস্তুত ছিলাম।"

হযরত সাহাল (রাঃ) বিন হুনাইফ ৩৮ হিজরীতে কূফায় ইন্তেকাল করেন। আমীরুল মু'মিনিন হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু ৬ তাকবীরের সঙ্গে তার নামাযে জানাযা পড়ান এবং বলেন, "তিনি বদরী সাহাবী ছিলেন।" বদরী সাহাবীদের নামাযে জানাযার এ বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা হতো।

www.amarboi.org

মৃত্যুর সময় হযরত সাহাল (রাঃ) দু' পুত্র রেখে যান। তারা হলেন আবু উমামাহ আসয়াদ (রাঃ) ও আবদুল্লাহ (রঃ)। আবু উমামাহ আসয়াদ (রাঃ) রাসূল (সাঃ)–এর যুগে জন্মগ্রহণ করেন।

হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে হযরত সাহাল (রাঃ)–এর নাম চতুর্থ পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে। তাঁর থেকে ৪০টি হাদীস বর্ণিত আছে।

তিনি হুযুর (সাঃ) এবং হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন ছাবিত থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেসব তাবেয়ী তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন আবু আওয়ায়েল (রঃ), উবাইদুল্লাহ (রঃ) বিন আবদুল্লাহ (রঃ) ও আবদুর রহমান বিন আবি লায়লা (রঃ)।

www.amarboi.org

# হযরত নু'মান (রাঃ) বিন বশির (রাঃ) আনসারী

দ্বীনের প্রতি ভালোবাসাই আল্লাহর দ্বীন। মহিলা হোক অথবা পুরুষ, শিশু হোক অথবা বৃদ্ধ। স্রষ্টা যাকে ইচ্ছা তাকেই তা দান করেন। রাসূল (সাঃ)-এর জীবনের শেষ দিকে মদীনাবাসী এক অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুর দ্বীনের প্রতি ভালোবাসা এবং রাসূল প্রেমের এক আশ্চর্য ধরনের অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন। এ শিশু প্রায়ই নবী (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত থাকতো এবং অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে তাঁর কাছ থেকে দ্বীনের কথা শিখতো। হুযুর (সাঃ) ওয়াজের জন্য মিম্বরের ওপর দাঁড়াতেন, তখন এ শিশু মিম্বরের নিকট বসে যেত। তন্ময় হয়ে সে রাসূল (সাঃ)-এর কথা শুনতো এবং তা স্মরণ রাখার চেষ্টা করতো। সে হুযুর (সাঃ)-এর পিছনে নামায পড়তো এবং পবিত্র রামাদান মাসের রাতে জেগে ইবাদাত করতো। প্রিয় নবী (সাঃ)-ও সে শিশুকে খুব ভালবাসতেন এবং স্নেহ করতেন। একবার হুযুর (সাঃ)-এর নিকট তায়েফ থেকে আঙ্গুর এলো। শিশুটিও তখন রাসুল (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত ছিল। তিনি তাকে দু'ছড়া আঙ্গুর দিয়ে বললেন, "পুত্র, একছড়া তোমার এবং আরেক ছড়া তোমার মাতার। বাড়ী গিয়ে তাঁকে দিয়ে দিও।" সেতো শিশু ছিল। পথে নিজের ছড়া খেয়ে খুব মজা পেল। দ্বিতীয় ছড়াও খেয়ে ফেললো এবং মাকে এ কথা কখনো বললোও না। কিছুদিন পর হুযুর (সাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "পুত্র, মাকে কি আঙ্গুরের ছড়া দিয়েছিলে?" রাসূল (সাঃ)-এর সাহচর্যের গুণে সে-ও সত্যবাদী হয়েছিল। আরজ করলো, "হে আল্লাহর রাসূল—না! দু'ছড়াই আমি খেয়ে ফেলেছিলাম।" তার জবাব শুনে হুযুর (সাঃ) মুচকি হাসলেন এবং তার কান ধরে বললেন, "খুব ধূর্ত হয়ে গেছ দেখি।"

শিশুটি নবী শ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মাদ(সাঃ)-এর প্রচুর স্নেহ ও ভালোবাসা পেয়েছিল এবং আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি তারও ছিল অগাধ ভক্তি শ্রদ্ধা। আর সেই শিশু ছিলো হযরত নু'মান (রাঃ) বিন বশির আনসারী।

হযরত আবু আবদুল্লাহ নু'মান বিন বশির (রাঃ)-এর সম্পর্ক ছিল খাযরাজ বংশের বনু হারেছের সঙ্গে। নসবনামা হলোঃ নু'মান (রাঃ) বিন বশির (রাঃ) বিন সায়াদ বিন

www.amarboi.org

ছায়ালাবা বিন খালাছ বিন যায়েদ বিন মালিক আগার বিন ছায়ালাবা বিন কায়াব বিন খাযরাজ বিন হারিছ বিন খাযরাজুল আকযার।

হযরত নু'মান (রাঃ) দ্বিতীয় হিজরীতে বদরের যুদ্ধের তিন চার মাস পূর্বে জন্ম গ্রহণ করেন। জ্ঞান হলে নিজের বাড়ীতে ইসলামের সুগন্ধি মোহিত হতে দেখেছিলেন। তাঁর পিতা হযরত বশির (রাঃ) বিন সায়াদ আনসারের অগ্রবর্তী দলভূক্ত ছিলেন এবং প্রিয় নবী (সাঃ)-এর প্রতি ছিলো অগাধ শ্রদ্ধা। তিনি বাইয়াতে উকাবায়ে কবিরাতে অংশ নিয়েছিলেন এবং বদর, ওহোদ, খন্দক ও অন্যান্য সকল যুদ্ধে রাসূল (সাঃ)-এর সহগামী ছিলেন। হুযুর(সাঃ)-এর ওফাতের পর আনসারের এক বড় শ্রেণীর ধারণা ছিলো যে, খাযরাজের সরদার হযরত সায়াদ (রাঃ) বিন উবাদাহ সায়েদী আনসারীকে খিলাফতের আসনে আরোহণ করা উচিত। কিন্তু হযরত বশির (রাঃ) বিন সায়াদ মুহাজিরদের খিলাফতের পক্ষে জোরেশোরে সমর্থন জ্ঞাপন করলেন এবং আনসারদের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)-এর বাইয়াত করলেন। হযরত নু'মানের মাতা হযরত উমরাহ (রাঃ) বিনতে রাওয়াহা জালিলুল কদর সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন রাওয়াহার সহোদরা এবং অত্যন্ত মুখলিস সাহাবিয়াহ ছিলেন। পুত্র নু'মান (রাঃ)-এর প্রতি ছিল অসাধারণ ভালোবাসা। একবার তিনি একটি বিশেষ সম্পদ হযরত নুমান (রাঃ)-এর নামে হেবাহ করতে চাইলেন এবং স্বামী হযরত বশীর (রাঃ) বিন সাদেককেও রাজী করিয়ে নিলেন। অতপর তিনি হযরত বশীর (রাঃ)-কে বললেন, এ কাজে রাসূল (সাঃ)-কে সাথী বানিয়ে নিন। হযরত বশীর শিশু নুমান (রাঃ)-কে সাথে নিয়ে রাসূলে (সাঃ)-এর নিকট হাজির হলেন এবং আরজ করলেন ঃ " হে আল্লাহর রাসূল ! আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমি আমার অমুক সম্পদ এ পুত্রকে প্রদান করছি।"

হুযুর (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, " এ সম্পদ থেকে তুমি কি তার অন্যান্য ভাইদেরকেও অংশ দিয়েছ?"

হযরত বশির (রাঃ) আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল, না।"

হুযুর (সাঃ) বললেন, "তাহলে আমি জুলুমের সাক্ষী হতে পারি না।" অন্য অপর এক রাওয়াতে তাঁর সঙ্গে এ শব্দাবলী সংশ্লিষ্ট আছে,ঃ "আল্লাহকে ভয় কর এবং সন্তানদের মধ্যে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা কর।"

এরপর হযরত বশির (রাঃ) চুপ-চাপ ঘরে ফিরে গেলেন এবং হযরত উমরাহ (রাঃ)-ও প্রিয় নবী (সাঃ)-এর নির্দেশের সামনে মাথা নত করে দিলেন।

www.amarboi.org

যে সম্পদ মাতা-পিতা হযরত নু'মান (রাঃ)-কে বিশেষভাবে দিতে চেয়েছিলেন তা কি ছিল? এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কতিপয় রাওয়াতে আছে এটা জমি ছিল। আবার কতিপয় রাওয়াতে আছে যে তা একটি গোলাম ছিল।

বলা হয়ে থাকে যে, নবী (সাঃ)-এর হিজরতের পর কোন আনসারীর গৃহে হযরত নু'মানই প্রথম জন্ম গ্রহণ করেন। মাতা-পিতা তাঁকে অসাধারণভাবে ভালবাসতেন এবং প্রায় সময়ই হুযুর(সাঃ)-এর পবিত্র খিদমতে নিয়ে যেতেন। তার জন্য দোয়া করতেন। এ কারণেই শিশু নু'মানের অন্তরে রহমতে আলম (সাঃ)-এর প্রতি সীমাহীন ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা জন্মেছিল। ১১ হিজরীর রবিউল আওয়াল মাসে প্রিয় নবী (সাঃ)-এর ইন্তেকালের সময় হযরত নুমান (রাঃ)-এর বয়স আট বছর ৭ মাস ছিল। বয়স এত কম হওয়া সত্ত্বেও তিনি হুযুর (সাঃ)-এর এক বিরাট সংখ্যক ইরশাদ মুখস্ত করে নিয়েছিলেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ), হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এবং হযরত ওসমান জুন্নুরাইন (রাঃ)-এর খিলাফতকালে হযরত নুমান (রাঃ) বিন বশির (রাঃ)-এর তৎপরতার কোন হদিস পাওয়া যায় না। অবশ্য কতিপয় রাওয়েত থেকে জানা যায় যে, তিনি হযরত ওসমান (রাঃ)-এর শাহাদাতে খুব ব্যাথিত হয়েছিলেন এবং তার রক্তাক্ত কুরতাহ ও স্ত্রী নায়েলা (রাঃ)-এর কর্তিত আঙ্গুল হযরত মাবিয়া (রাঃ)-এর নিকট দামেস্ক নিয়ে গিয়েছিলেন। হযরত আলী (রাঃ) খিলাফতের শুরুতেই যখন আমীর মাবিয়া (রাঃ)-এর সাথে তাঁর মত বিরোধ শুরু হলো তখন হযরত নু'মান (রাঃ) আমীর মাবিয়া (রাঃ)-কে সমর্থন দান করেন। আমীর মাবিয়া (রাঃ) হযরত নু'মানকে খুব শ্রদ্ধা করতেন এবং নিজের শাসনকালে তাঁকে কয়েকটি উচ্চপদে সমাসীন করেন। ঐতিহাসিক ইয়াকুবী বর্ণনা করেছেন, আমীর মাবিয়ার নির্দেশে হযরত নু'মান (রাঃ) দু'হাজার সৈন্যের বাহিনীসহ আইনুত তামারের ওপর হামলা করেন। সে সময় সেখানে হযরত আলী (রাঃ)-এর পক্ষ থেকে মালিক বিন কাব গবর্নর ছিলেন। তিনি হামলাকারী বাহিনীকে হটিয়ে দিয়েছিলেন। স্বয়ং হযরত নু'মান এ বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন না তিনি কোন দ্বিতীয় ব্যক্তিকেই এ অভিযানে প্রেরণ করেছিলেন সে ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

দামেস্কের কাজী হযরত ফুজালাহ (রাঃ) বিন উবায়েদ আনসারী ৫৩ হিজরীতে ওফাত পেলেন। এ সময় হযরত আমীর মাবিয়া (রাঃ) হযরত নু'মান (রাঃ)-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন। তার কিছুদিন পর তিনি হযরত নু'মান (রাঃ)-কে ইয়েমেনের আমীর নিয়োগ করেন। নিজের মৃত্যুর কিছু দিন পূর্বে ৫৯

www.amarboi.org

হিজরীতে আমীর মাবিয়া (রাঃ) হযরত নুমান (রাঃ)–কে কুফার মত গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশের গবর্নর বানান। তিনি এ পদে বহাল থাকা অবস্থায় ৬০ হিজরীতে আমীর মাবিয়া (রাঃ) ওফাত পান এবং প্রথম ইয়াযিদ শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। কূফাবাসী এ ঘটনার খবর পেল। তারা বনু উমাইয়ার বিরোধী হযরত সুলায়মান (রাঃ) বিন ছুরাদুল খাজায়ীর গৃহে একত্রিত হয়ে হযরত হুসাইন (রাঃ) বিন আলী (রাঃ)–এর খিদমতে পত্র প্রেরণ করে তাঁকে কূফা তাশরীফ আনার অনুরোধের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পত্রে তারা তাঁর বাইয়াত করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে বলেও উল্লেখ করা হয়। এ পত্র প্রেরণের পর কূফাবাসী একের পর এক এ বিষয়বস্তুর পত্র প্রেরণ অব্যাহত রাখলো। হযরত হোসাইন (রাঃ) পর পর তাদের পত্র পেলেন। তিনি আপন চাচাতো ভাই মুসলিম বিন আকিল (রাঃ) কে পরিস্থিতি অবগত হওয়ার জন্য কূফা প্রেরণ করলেন। মুসলিম বিন আকিল (রাঃ) কূফা পৌঁছলে ১২ অথবা ১৮ হাজার মানুষ তাঁর হাতে বাইয়াত নিলেন। হযরত নু'মান বিন বশির (রাঃ) এ পরিস্থিতির খবর পেয়ে দেখেও না দেখার ভূমিকা নিলেন। কিন্তু যখন শাসক বিরোধী তৎপরতা বৃদ্ধি পেতে লাগলো তখন হযরত নু'মান (রাঃ) মিম্বরে চড়ে লোকদের সামনে এক শক্তিশালী ভাষণ দিলেন। ভাষণে তিনি বললেন, "হে মানুষেরা! আল্লাহকে ভয় কর এবং ফিতনা সৃষ্টি করো না। কেননা তাতে জীবন হানি হয়। রক্ত প্রবাহিত ও সম্পদ লুটপাট হয়। যে আমার সাথে লড়াই করবে না আমি তার সাথে লড়াই করবো না। যে আমার ওপর হামলা করবে না আমি তার ওপর হামলা করবো না। ধারণার বশবর্তী হয়ে কাউকে আটক করবো না। যার অপরাধ প্রকাশ হয়ে গেছে এবং জানা গেছে যে বাইয়াত ছিন্ন করেছে তাহলে আমার হাতে যতদিন তরবারী থাকবে ততদিন তার ওপর আঘাত হানতে থাকবো। আমি যদি একাও হই তাহলেও আমি এ কাজ চালিয়ে যাব।"

এ সমাবেশে বনু উমাইয়ার এক শক্তিশালী সমর্থক আব্দুল্লাহ বিন মুসলিমও উপস্থিত ছিল। হযরত নু'মান (রাঃ)–এর নরমপন্থা তার পছন্দ হলো না। সে উঠে বললো, "হে আমীর! আপনার গৃহীত কর্মপদ্ধতি দুর্বল। এখন নরম নয় কঠোর হওয়ার সময়।"

হযরত নু'মান (রাঃ) বললেন, "আমি আল্লাহর নাফরমানীতে শক্তিশালী হওয়া এবং আনুগত্যের প্রতি দুর্বল হওয়াকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকি এবং আল্লাহ যদি কারোর ওপর আবরণ দিয়ে থাকেন, আমি তা ছিন্ন করতে চাই না।"

www.amarboi.org

আবদুল্লাহ বিন মুসলিম সেখান থেকে উঠে গৃহে এলো এবং ইয়াযিদকে কূফায় কোন শক্তিশালী ব্যক্তি প্রেরণের কথা লিখে একটি পত্র দিল। সে পত্রে উল্লেখ করলো যে, "নু'মান (রাঃ) অত্যন্ত দুর্বলতা প্রদর্শন করছে।"

ইয়াযিদ এ পত্র পেয়ে উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদকে কূফার গবর্নর নিয়োগ করলো। হযরত নু'মান (রাঃ) শাসন ক্ষমতা তার হাতে সোপর্দ করে সিরিয়া চলে গেলেন। এটা ৬০ হিজরীর ঘটনা। কিছুদিন পর ইয়াযিদ তাকে হেমসের গবর্নর নিয়োগ করলেন এবং তাঁর ওফাত পর্যন্ত এ পদেই বহাল ছিলেন।

হযরত নু'মান (রাঃ) কূফা থেকে প্রত্যাবর্তনের কিছুদিন পর কারবালার হৃদয়বিদারক ঘটনা সংঘটিত হলো। এ ঘটনায় সাইয়েদেনা হযরত হোসাইন (রাঃ) তার বেশ কিছু সংখ্যক আত্মীয় স্বজন এবং সাথী শাহাদত বরণ করলেন। হযরত হোসাইন (রাঃ)-এর উত্তরাধিকারদেরকে দামেস্ক নিয়ে যাওয়া হলো, তারা যখন দামেস্কে কিছুদিন অবস্থান করলেন, তখন ইয়াযিদ তাদেরকে হযরত নু'মান বিন বশির(রাঃ)-এর তত্ত্বাবধানে মদীনা মুনাওয়ারাহ প্রেরণ করলো।

হযরত নু'মান (রাঃ) যথাসাধ্য মুসিবাত যাদাহ মুসাফিরদেরকে সাহায্য করলেন এবং রাস্তায় তাঁদের কোন কষ্ট হতে দিলেন না। কোন মনযিলে এ কাফেলা যাত্রা বিরতি করলে হযরত নুমান (রাঃ) এবং তাঁর সাথীরা পর্দার খেয়ালে পৃথক হয়ে যেতেন। কাফেলাটি মদীনা মুনাওয়ারাহ পৌঁছলে হযরত যয়নব (রাঃ) হযরত ফাতিমা (রাঃ) সুন্দর ব্যবহারের জন্য হযরত নুমান (রাঃ)-কে চুরি ও বাজু বন্ধ খুলে প্রদান করলেন। সাথে সাথে তাদের নিকট অন্য কোন জিনিস না থাকার কারণে দিতে পারলেন না বলে ক্ষমা চাইলেন।

হযরত নু'মান অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বললেন, "হে রাসূল (সাঃ)-এর বেটিরা! আল্লাহর কসম আমি যা কিছু করেছি তা আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং রাসূল (সাঃ)-এর আপনাদের আত্মীয়তার থাকার কারণে করেছি। দুনিয়ার কোন স্বার্থের জন্য করিনি। এ অলংকার নিয়ে আমি আমার ছওয়াব নষ্ট করবো না। আল্লার কসম! এ সব আপনাদের নিকটেই রাখুন।"

হযরত হোসাইন (রাঃ) ছাড়া ইয়াযিদ হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ)-কেও ভয় করতেন। তিনি মক্কায় অবস্থান করছিলেন এবং ইয়াযিদের বাইয়াতের আগ্রহী ছিলেন



www.amarboi.org

না। কারবালার বিয়োগান্তক ঘটনার পর সে কতিপয় লোককে ইবনে যোবায়ের (রাঃ)–এর বাইয়াত নেয়ার জন্য মক্কা প্রেরণ করেছিল। ইবনে যোবায়ের (রাঃ) তাদেরকে এ জবাব দিয়েছিলেন যে, "আমি ইয়াযিদের কোন কথার জবাব দেব না। আমি বিদ্রোহী নই। তবে, নিজেকে অন্য কারোর কবজায় কখনো ন্যস্ত করবো না।"

তারা ফিরে গিয়ে ইয়াযিদকে হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ)–এর জবাব সম্পর্কে অবহিত করলো। তাতে সে আরো বেশী ক্রোধান্বিত হলো এবং সিরিয়ার সম্ভ্রান্ত লোকদের একটি প্রতিনিধি দল ইবনে যোবায়ের (রাঃ)–এর নিকট প্রেরণ করলো । এ দলে হযরত নু'মান বিন বশীর (রাঃ)–ও ছিলেন। তারা মসজিদে হারামে গিয়ে হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ)–এর সাথে সাক্ষাত করলেন এবং তাঁকে ইয়াযিদের বাইয়াত গ্রহণে সম্মত করাতে চাইলেন। এতে ইবনে যোবায়ের (রাঃ)–এর প্রতিনিধি দলের এক সদস্য আবদুল্লাহ বিন উজাত আশয়ারীকে সম্বোধন করে বললেনঃ

"এ হেরেমে আমার সাথে লড়াই করা কি হালাল হবে?" ইবনে উজাত জবাবে বললেন, "হাঁ, আপনি আমীরুল মুমিনিনের আনুগত্য না করলে তা হালাল হবে।"

ইবনে যোবায়ের (রাঃ) হেরেমের একটি কবুতরের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, "এ কবুতর মারা কি হালাল?" ইবনে উজাত বললেন, "হাঁ, যদি জানা যায় যে, সে আমীরুল মুমিনের অবাধ্য।" ইবনে উজাতের সাথে আলোচনার পর হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ) হযরত নু'মান বিন বশির(রাঃ)–কে নির্জনে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, "আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি যে, তোমার নিকট আমিই আফজাল না ইয়াযিদ?"

হযরত নুমান (রাঃ)ঃ "আপনি"

হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ) "আমার পিতা আফজাল না ইয়াযিদের পিতা?" হযরত নু'মান (রাঃ) "আপনার পিতা" হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ), "আমার মাতা আফজাল না ইয়াযিদের মাতা।" হযরত নু'মান (রাঃ), "আপনার মাতা।" হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ), "আমার খালা আফজাল, না ইয়াযিদের খালা আফজাল?" হযরত নুমান (রাঃ), "আপনার খালা।" হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ), "আমার ফুফু আফজাল না ইয়াযিদের ফুফু?" হযরত নুমান (রাঃ) আপনার—আপনার পিতা যোবায়ের (রাঃ),

www.amarboi.org

মাতা আসমা (রাঃ) বিনতে আবি বকর (রাঃ) — খালা উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহ (রাঃ) এবং ফুফু উম্মুল মুমিনিন হযরত খোদায়জাহ (রাঃ) বিনতে খুয়ায়লেদ।"

হযরত ইবনে যোবায়ের (রাঃ) বললেন, "এরপরও তুমি কি পরামর্শ দাও যে, আমি ইয়াযিদের বাইয়াত করি।"

হযরত নু'মান (রাঃ) বিন বশির (রাঃ) বললেন, "আপনি যদি আমার পরামর্শ চান তাহলে আমি আপনাকে এ মত দেব না এবং ভবিষ্যতে আপনার নিকট আসবোও না।" এরপর প্রতিনিধি দলটি ইয়াযিদের নিকট ফিরে গেল।

ইয়াযিদের মৃত্যু এবং মাবিয়া (রাঃ) বিন ইয়াযিদের ক্ষমতা থেকে পদত্যাগের পর ৬৪ হিজরীতে হযরত নু'মান (রাঃ) বিন বশির হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ)-এর বাইয়াত করেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ) তাঁকে হেমসের শাসনকর্তা এবং সিরিয়ার কতিপয় জেলার শাসক হিসেবে জাহহাক বিন কায়েসকে নিয়োগ করেন। নতুন উমাইয়া খলিফা মারওয়ান ইবনুল হাকাম জাহহাক বিন কায়েসকে অনুগত করার জন্য একটি শক্তিশালী বাহিনী প্রেরণ করলেন। হযরত নু'মান (রাঃ) এ খবর পেয়ে শুরাহ বিল বিন জুল কালার নেতৃত্বে কিছু সৈন্য জাহহাক বিন কায়েসের সহায্যার্থে প্রেরণ করলেন। মারজে রাহাত নামক স্থানে উভয় বাহিনীর মধ্যে রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হলো। যুদ্ধে জাহহাক বিন কায়েস পরাজিত হলেন। হযরত নু'মান (রাঃ) পরাজয়ের খবর পেয়ে রাতে হেমস থেকে বেরিয়ে গেলেন। মারওয়ান খালিদ বিন আদিল কিলায়ীর নেতৃত্বে একটি বাহিনী দিয়ে তার পিছু ধাওয়া করালেন। খালিদ বিন আদি তাঁকে হেমসের উপকণ্ঠে বিরান নামক একটি গ্রামে গিয়ে ঘিরে নিল এবং শহীদ করে মাথা কেটে নিল। অতপর সে হযরত নুমানের পরিবার-পরিজনকে গ্রেফতার করলো এবং তাদেরকে হযরত নু'মান (রাঃ)-এর মাথাসহ মারওয়ানের নিকট পেশ করলো। মারওয়ান হযরত নুমান (রাঃ)-এর মাথা তাঁর স্ত্রীর কোলের ওপর নিক্ষেপ করলো। এক বর্ণনায় আছে, তার স্ত্রী মাথাটি তাকে প্রদানের জন্য স্বয়ং দরখাস্ত করেছিলেন। যাহোক এটা ছিল এক শিক্ষণীয় ঘটনা। ইসলামের উন্নত নৈতিক মানদণ্ডের সঙ্গে এর কোন সামঞ্জস্য ছিল না। কারণ, ইসলাম লাশ অবমাননা করার অনুমতি দেয় না। অন্যদিকে হযরত নু'মান বিন বশির (রাঃ) বিশ বছরেরও বেশী সময় ধরে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে বনু উমাইয়ার খিদমত করেন। কিন্তু অবশেষে একজন উমাইয়া শাসকের হাতেই তাঁকে শাহাদাত প্রাপ্ত হতে হয়।

www.amarboi.org

হযরত নু'মান (রাঃ)–এর শাহাদতের ঘটনা ৬৫ হিজরীতে ঘটে। সে সময় তাঁর বয়স ছিল প্রায় ৬৪ বছর। তাঁর তিনটি ছেলের নাম জানা যায়। তাঁরা হলেন ঃ মুহাম্মাদ, বশির এবং ইয়াযিদ।

হযরত নু'মান (রাঃ) বিন বশির (রাঃ) অত্যন্ত উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। চরিতকাররা তাঁর ধৈর্য, রহমদিল হওয়া, নরম মেজাজ এবং বদান্যতার খুব প্রশংসা করেছেন। তাঁর জীবনের একটি বিরাট অংশ ঘনঘোর দুর্যোগপূর্ণ অবস্থায় কেটেছিল। তবুও রক্তারক্তি থেকে বিরত থাকার জন্য তিনি সাধ্যমত চেষ্টা করেছিলেন এবং নাজুক থেকে নাজুকতম পরিস্থিতিতে নিজেকে আয়ত্বে রেখেছিলেন। ইবনে জরির, তাবারি (রঃ) তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, "তিনি ধৈর্যশীল, ইবাদাতগুজার এবং ক্ষমাশীল ছিলেন।"

হাফিজ ইবনে আবদুল বার (রঃ) "আল ইসতিয়াবে" তাঁর দানশীলতার এক হৃদয়গ্রাহী ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, হযরত নুমান (রাঃ) যখন হেমসের গভর্ণর ছিলেন (ইয়াযিদের শাসনকালে) তখন প্রখ্যাত কবি আ'শা হামদানি তাঁর নিকট এসে আরজ করলো, আমি ইয়াযিদের কাছে গিয়ে সাহায্যের আবেদন করেছিলাম। কিন্তু সে আমার আবেদনের প্রতি ভ্রুক্ষেপই করেনি। এখন আপনার নিকট এসেছি। আত্মীয়তার হক আদায় করুন এবং আমার ঋণ পরিশোধ করে দিন। হযরত নু'মান সে সময় শূন্য হস্ত ছিলেন এবং কসম খেয়ে বললেন তার কাছে কিছুই নেই। আশা হামদানী তাঁর জবাব শুনে অত্যন্ত নিরাশ হলো। নু'মান (রাঃ) তাঁর ওপর খুব রহম হলো। কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, ঠিক আছে। অতপর মানুষজন একত্রিত করে ২০ হাজার লোকের সামনে মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ "হে মানুষেরা! আশা হামদানি তোমাদের নিকট এসেছেন। সে তোমাদের চাচার পুত্র। একজন মুসলমান এবং সম্ভ্রান্ত বংশীয়। কালের বিড়ম্বনায় সে আজ অর্থের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে। এখন তোমার মত কি।"

উপস্থিত সকলেই এক বাক্যে বললো, "আপনি যে নির্দেশ দেবেন তাই পালন করবো।"

হযরত নু'মান (রাঃ) বললেন, " না, আমি এ ব্যাপারে তোমাদের কোন নির্দেশ দেব না। তোমরা নিজেরাই তার সাহায্যের একটি পথ বের কর।"

www.amarboi.org

জনতা বললো, " আপনি মাথা পিছু এক দিনার ঠিক করে দিন" তিনি বললেন, "না, দু'জন মিলে এক দিনার দাও।" সকলেই তাতে রাজী হয়ে গেল।

এরপর তিনি বললেন, আমি এখন আশা'কে সরকারী তহবিল থেকে অর্থ দিচ্ছি। যখন তেমাদের প্রদত্ত অর্থ জমা হবে তখন হিসেব করে তা সরকারী তহবিলে জমা দেয়া হবে। বস্তুত তিনি আশাকে ১০ হাজার দিনার দিলেন। তিনি তাতে আপাদমস্তক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন এবং এ প্রসঙ্গে একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন।

জ্ঞান ও ফজিলতের দিক থেকে হযরত নু'মান বিন বশির (রাঃ) অত্যন্ত উচুঁ মর্যাদা সম্পন্ন ছিলেন। যদিও তিনি রাসূল (সাঃ)-এর যুগে কম বয়স্ক ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাঁর তকদিরে জ্ঞান অন্বেষণের স্পৃহা আমানত রেখেছিলেন এবং সাথে সাথে প্রবল মুখস্ত শক্তির নেয়ামত দান করেছিলেন। তিনি রাসূল (সাঃ)-এর জবানীতে যা কিছু শুনতেন তাই মুখস্ত করে নিতেন। রাসূল (সাঃ)-এর ওফাতের পর তিনি উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা (রাঃ) এবং হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এরনিকট থেকে ফয়েজ হাসিল করেন। এক বর্ণনায় আছে যে, তিনি নিজের মামা হযরত আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (মুতা যুদ্ধের শহীদ) থেকেও হাদীস শুনেছেন।

হাদীস বর্ণনায় হযরত নু'মান (রাঃ) অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। এরপরও তিনি ১২৪টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর হাদিস বর্ণনাকারী এবং শিষ্যদের মধ্যে ইমাম শাবী (রঃ), সামমাক বিন হারব (রঃ) আবু ইসহাক সাবিয়ী, সালিম বিন আবিল জায়াদ (রঃ), উরওয়াহ (রঃ) বিন যোবায়ের (রঃ), আবু কালাবাল জারামী (রঃ), উবাইদুল্লাহ (রঃ) বিন আবদুল্লাহ বিন উতবাহ হাবিব বিন সালেম (রঃ) এবং আবদুল মূলক বিন উমায়ের(রঃ)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হযরত নু'মান (রাঃ) বিভিন্ন প্রদেশের গবর্ণর ছিলেন। এ কারণে তাকে হাজার হাজার মামলার ফায়সালা করতে হয়। চরিতকাররা বলেছেন, ফায়সালা করার সময় তিনি প্রিয় নবী (সাঃ)-এর নির্দেশাবলী এবং আদর্শকে সামনে রাখতেন ও হাদীসের হাওয়ালাহও দিতেন। বক্তৃতাতেও তিনি খুব পারদর্শী ছিলেন। অত্যন্ত সুন্দর ও সুললিত বক্তৃতা দিতেন। বক্তৃতায় রাজনৈতিক বিষয়াবলীর ইঙ্গিত দিতেন, হাদীস বর্ণনা করতেন এবং মাসয়ালাও বলতেন। তাঁর এক শিষ্য আমমাক বিন হারব তাবেয়ী (রঃ) বলেছেন, তিনি যত লোকের

www.amarboi.org

বক্তৃতা শুনেছেন তাদের মধ্যে হযরত নু'মান (রাঃ)-ই ছিলেন সবচেয়ে বড় বক্তা।

কখনো কখনো হাদীস বর্ণনার সময় আঙ্গুল দিয়ে কানের দিকে ইশারাহ করে বুঝাতে চাইতেন যে, তিনি স্বয়ং এ কান দিয়ে রাসূল (সাঃ) এভাবে বলতে শুনেছেন। তাঁর লেখনী বুদ্ধিমত্তায় পূর্ণ থাকতো। কবিতাতেও তাঁর আকর্ষণ ছিল। কতিপয় চরিতকার তার কিছু কবিতা উপস্থাপন করেছেন।

www.amarboi.org

# হযরত ইয়ামিন (রাঃ) বিন উমায়ের

মদীনার ইহুদীরা আওস এবং খাজরাজ গোত্রের লোকদেরকে প্রায়ই শেষ নবী (সাঃ)-এর আত্ম প্রকাশের খবর দিতো। কিন্তু তাদের দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো যে, যখন শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সাঃ) মদীনায় শুভ পদার্পন করলেন তখন তারা তাঁর ওপর ঈমান আনতে স্পষ্টভাবে শুধু অস্বীকারই করলোনা বরং তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্নমুখী ষড়যন্ত্র আটলো। কিন্তু এ সকল বাঁকা স্বভাবের লোকদের মধ্যেও কিছু সৎস্বভাবের লোক ছিলেন। নিজের কওমের এ ভূমিকা তাদের পছন্দ হলোনা। তাঁরা জান-প্রান দিয়ে নিজেদের ভাগ্য ইসলামের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে নিল। এ ধরনের সৎস্বভাবের লোকদের মধ্যে ইয়ামিন (রাঃ) বিন উমায়েরও ছিলেন। ইহুদী গোত্র বনি নজিরের সাথে তিনি সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। বংশে নামা হলোঃ ইয়ামিন (রাঃ) বিন উমায়ের বিন কা'ব বিন আমর বিন হাজ্জাশ। কতিপয় বর্ণনায় তাঁর পিতার নামও ইয়ামিন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাঁর নাম ইবনে ইয়ামিন বলা হয়েছে।

বনু নজির গোত্রের লোকেরা হযরত ইয়ামিন (রাঃ)-কে সঠিক পথ থেকে বিভ্রান্ত করার জন্য লোভ-লালসা এবং ভয়-ভীতির সকল অস্ত্রই প্রয়োগ করেছিল। কিন্তু তাঁর অটলতা এবং স্থির চিত্তে কোন পরিবর্তন আসেনি। দিন দিন রাসূল (সাঃ)-এর সাথে তাঁর ভালোবাসা বৃদ্ধিই পেয়েছিল।

একবার বনু নজিরের এক অসৎ লোক আমর বিন হাজ্জাশ প্রিয় নবী (সাঃ)-কে এক ঘরে ডেকে নিয়ে ওপর থেকে ভারী বস্তু ফেলে দিয়ে শহীদ করার পরিকল্পনা করেছিল। হুযুর (সাঃ) এ পরিকল্পনার কথা জানতে পেলেন। আর এ ভাবেই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে গেল। এসত্বেও তাঁর মনে আমর বিন হাজ্জাশের সেই অপবিত্র তৎপরতার কথা দাগ কেটে রাখলো। এ ব্যক্তি হযরত ইয়ামিন (রাঃ) বিন উমায়েরের চাচাতো ভাই ছিল। হযরত ইয়ামিন (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পর একদিন হুযুর (সাঃ) তাঁকে বললেনঃ "ইয়ামিন, তুমি কি তোমার ভাইয়ের তৎপরতা দেখেছ? সে আমাকে ধোকা দিয়ে ডেকে হত্যা করতে চেয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা হযরত জিবরাইল আমীনের মাধ্যমে আমাকে তার অসৎ উদ্দেশ্যের কথা জানিয়ে দেন।"

হযরত ইয়মিন (রাঃ) হুযুর (সাঃ)-এর এরশাদ শুনে ক্রোধে অস্থির হয়ে পড়লেন সেই সময়ই তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং আমর বিন হাজ্জাশের তাকে রইলেন। একদিন সুযোগ পেয়ে তার ভবলীলা সাঙ্গ করে দিলেন এবং শান্তির নিশ্বাস ফেললেন।

www.amarboi.org

নবম হিজরীতে তাবুকের যুদ্ধ সংঘটিত হলো। বছরটি ছিল প্রচণ্ড খরার। এজন্য অনেক মুসলমানকে যুদ্ধ সরঞ্জাম ও সফরের সুযোগ-সুবিধা প্রদানে খুব বেগ পেতে হচ্ছিল। কতিপয় সাহাবী (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর দরবারে হাজির হয়ে সরকারের সামান প্রদানের দরখাস্ত করলেন। সে সময় দেওয়ার মত কোন বস্তুই ছিলনা। এজন্য প্রিয় নবী (সাঃ) অক্ষমতা প্রকাশ করলেন। তারা অত্যন্ত পাক্কা এবং মুখলিস মুসলমান এবং যেকোন মূল্যে রাসূল (সাঃ)-এর সহগামী হয়ে জিহাদে শরীক হতে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু সফর ছিল সুদীর্ঘ এবং কষ্টকর। তাছাড়া সওয়ারী এবং সামান ছাড়া তা অতিক্রম করাও সম্ভব ছিলনা। যখন এ সকল বস্তু প্রাপ্তির কোন পথ বেরুলোনা তখন নিরাশ হয়ে তারা রোদন করতে লাগলেন। কুরআনে হাকিমে তাদের নৈরাশ্য এবং দুশ্চিন্তার চিত্র এ ভাবে অংকিত করা হয়েছেঃ

"এবং না আছে কোন অভিযোগ সেই সকল লোকের ওপর যারা তোমার নিকট সওয়ারী চাইতে এসেছিল। এবং তুমি বললে, আমার নিকট এমন কোন জিনিস নেই যার ওপর তোমাদের সওয়ার করাবো। ফলে তারা ঐ দুশ্চিন্তায় ফিরে গেল যে তাদের নিকট রাহা খরচ ছিলনা। তাদের চক্ষু দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল।"

এ সকল অক্ষম সাহাবীর মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বিন মুখাফফাল মুযনি এবং হযরত আব্দুর রহমান (রাঃ) বিন রগবও ছিলেন। ঘটনাক্রমে হযরত ইয়ামিন (রাঃ) বিন উমাইর তাঁদেরকে ক্রন্দন অবস্থায় দেখে ফেললেন। ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বললেন, রাসূলের নিকট সফরের সামান চেয়েছিলাম কিন্তু পাওয়া যায়নি এবং আমাদের এমন সামর্থও নেই যে সামান সরবরাহ করতে পারি। হযরত ইয়ামিন (রাঃ) তাদেরকে সান্ত্বনা দিলেন এবং দুই সওয়ারী ও কিছু রাস্তার খরচ পেশ করলেন। এ কথা হাফিজ ইবনে হাজার (রঃ) বর্ণনা করেছেন। ইবনে হিশামের রাওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত ইয়ামিন (রাঃ) তাদেরকে একটি উট এবং কিছু খেজুর দিয়েছিলেন। এ সামান্য সামানসহ সেই দুজন তাবুকের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন।

হযরত ইয়ামিন (রাঃ) বিন উমাইয়ের বিস্তারিত তথ্য চরিত গ্রন্থে পাওয়া যায়না। এমনকি তাঁর মৃত্যুর সাল পর্যন্তও পাওয়া যায়নি।

হাফিজ ইবনে আব্দুল বার (রঃ) "আল-ইসতিয়াব" গ্রন্থে হযরত ইয়ামিন (রাঃ) বিন উমায়ের সম্পর্কে লিখেছেনঃ "তিনি মহান সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত।"

–ঃ সমাপ্ত ঃ–

www.amarboi.org

# গ্রন্থপঞ্জী

১। পবিত্র কুরআন শরীফ
২। সহিহ বুখারী
৩। সহিহ মুসলিম
৪। মুসনাদে আবু দাউদ
৫। মুসনাদে আহম্মদ বিন হাম্বল
৬। জামে' তিরমিজী
৭। মুসতাদরাকে হাকিম
৮। মিশকাত শরীফ
৯। তাবকাতে ইবনে সায়াদ (রঃ)
১০। তারিখুল উমাম ওয়াল মুলুক—ইবনে জারীর তাবারী (রঃ)
১১। আল-ইসাবাহ ফি তামাইয়িজুস সাহাবাহ—হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (রঃ)
১২। তাহজিবুত তাহজিব—হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (রঃ)
১৩। আল-ইসতিয়াব মারিফাতুল আসহাব—হাফিজ ইবনে আব্দুল বার (রঃ) উন্দুলুসী
১৪। আস-সিরাতুন নবুবিয়াত—ইবনে হিশাম (রঃ)
১৫। যাদুল মিয়াদ—হাফিজ ইবনে কাইয়েম (রঃ)
১৬। উসুদুল গাবাহ—ইবনে আছির (রঃ)
১৭। আল-কামিল ফিত তারিখ—ইবনে আছির (রঃ)
১৮। আল-বিদায়া ওয়াল নিহায়া—হাফিজ ইবনে কাছির (রঃ)
১৯। ফতুহুল বুলদান—বালাজুরী (রঃ)
২০। আল-আনবারুত তাওয়াল—আবু হানিফাহ দিনাওয়ারী
২১। তরজুমানুস সুন্নাহ—মওলানা বদরে আলম মিরাটি (রঃ)
২২। মায়ারিফুল হাদীস—মওলানা মুহাম্মদ মনজুর নুমানী
২৩। খালিদ সাইফুল্লাহ—আবু যায়েদ শালবী
২৪। আল-ফারুক—শিবলী নুমানী (রঃ)
২৫। তারিখে ইসলাম—শাহ মুয়ীন উদ্দীন আহমদ নদবী মরহুম
২৬। তারিখে ইসলাম—আকবর শাহ খান নজিব আবাদী মরহুম
২৭। মিয়ারুস সাহাবাহ (রাঃ)—শাহ মুয়ীনুদ্দীন আহমদ নদবী মরহুম
২৮। সিয়ারে আনসার (রাঃ)—মওলভী সাঈদ আনসারী মরহুম
২৯। সিয়ারুস সাহাবাহ (রাঃ)—প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড—মওলভী সাঈদ আনসারী মরহুম

www.amarboi.org

৩০। আহলি কিতাবে সাহাবাহ ওয়া তাবেয়ীন—হাফিজ মুজিবুল্লাহ নদবী
৩১। তারিখে মিল্লাত—কাজী যয়নুল আবেদীন মীরাঠি
৩২। হজরত ওমরের (রাঃ) সরকারী পত্রাবলী—খুরশীদ আহমদ ফারুক
৩৩। আল-মাশাহেদ—হাকিম রহমান আলী খান মরহুম
৩৪। দায়েরায়ে মায়ারেফে ইসলামিয়া (ইনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম) পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়-বিভিন্ন খণ্ড
৩৫। হায়াতুস সাহাবাহ (রাঃ)—মওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ কানধুলুবী (রঃ)

www.amarboi.org

## আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

- তাফহীমুল কুরআন (১-১৯ খণ্ড)
  –সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
- তরজমায়ে কুরআন মজীদ (এক খণ্ডে)
  –সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
- তাদাব্বুরে কুরআন (১-২ খণ্ড)
  –মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী
- শব্দে শব্দে আল কুরআন (১-১৪খণ্ড)
  –মাওলানা মুহাম্মাদ হাবিবুর রহমান
- সহীহ আল বুখারী (১-৬ খণ্ড)
  –আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী র.
- সুনান ইবনে মাজা (১-৪ খণ্ড)
  –আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা র.
- শারহু মাআনিল আছার (তাহাবী শরীফ) (১-২ খণ্ড)
  –ইমাম আবু জাফর আহমাদ আত-তাহাবী র.
- সীরাতে সরওয়ারে আলম (১-২ খণ্ড)
  –সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
- মহানবীর সীরাত কোষ
  –খান মোসলেহ উদ্দীন আহমদ
- বিশ্বনবীর মোযেজা
  –ওয়ালিদ আল আযমী
- হযরত আবু বকর রা.
  –মুহাম্মদ হুসাইন হাইকল
- শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ দা'য়ী ইলাল্লাহ
  –মুহাম্মদ নূরুজ্জমান
- মাওলানা মওদূদীকে যেমন দেখেছি
  –অধ্যাপক গোলাম আযম
- মুনশী মেহেরউল্লা : জীবন ও কর্ম
  –নাসির হেলাল